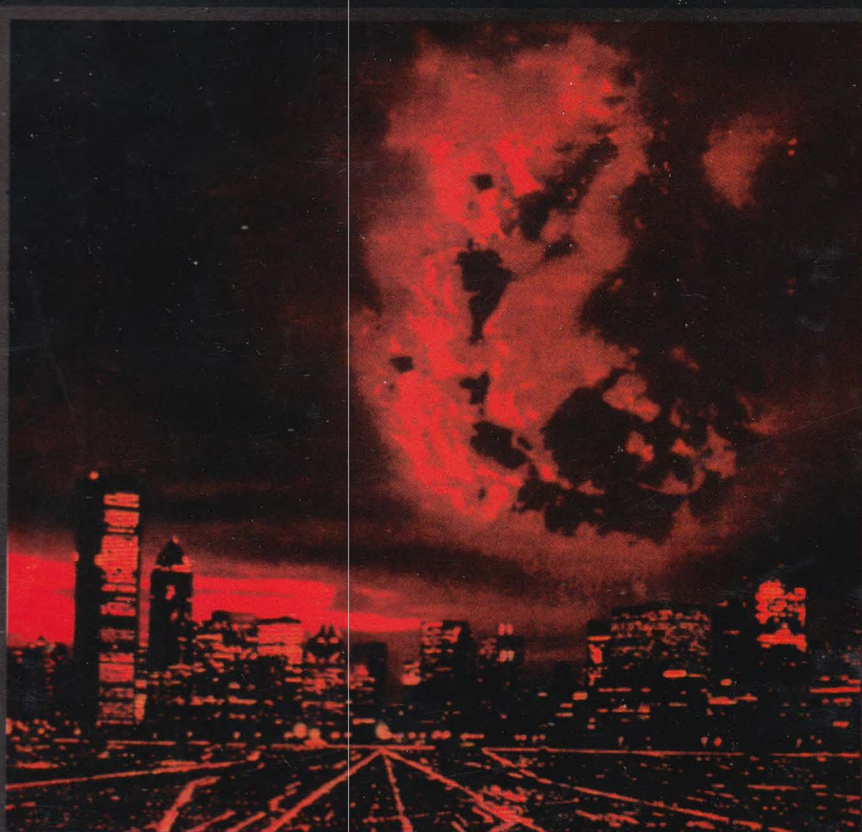
আল-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স সিরিজ-২

কুরআন কিয়ামাত পরকাল



মুহাম্মাদ আন্‌ওয়ার হুসাইন

সম্পাদনায়

প্রফেসর ড. এস. এম. আজহারুল ইসলাম

যে 'বিজ্ঞান'কে অবলম্বন করে বিবেকবান জ্ঞানী সমাজের একাংশ এতদিন পর্যন্ত 'পরকাল' সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করছিল এবং নিজেরাও বিভ্রান্তির তলদেশে তলিয়ে যাচ্ছিল, সেই 'বিজ্ঞান'ই একবিংশ শতাব্দির শুরুতে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার মাধ্যমে উদ্ঘাটিত বিস্ময়কর মহাজ্ঞানের মহাসমাহার নিয়ে আল-কুরআনের দাবীকৃত 'পরকাল' সম্পর্কীয় সকল বিষয়গুলো বাস্তবতার আলোকে প্রমাণ সাপেক্ষে উপস্থাপন করে মানবজাতিকে প্রকৃত কল্যাণের পথ প্রদর্শন করতে শুরু করেছে। সাথে সাথে বিষয়ের প্রকৃত সত্য ও বাস্তব 'তথ্য এবং ছবি' প্রকাশ করে 'পরকাল' অস্বীকার করার সকল পথই কার্যত রুদ্ধ করে দিয়েছে। বক্ষমান সিরিজটি উক্ত তথ্য ও ছবি বুকে ধারণ করে সুহৃদ পাঠকের সম্মুখে হাজির হয়েছে।

- আপনি কি বর্তমান বিজ্ঞানের আলোকে পরকাল দেখতে চান? তাহলে বইটি একবার পড়ে দেখুন,
- আপনি কি নিজ 'ঈমান' বহুগুণে বৃদ্ধি করতে চান? তাহলে বইটি পড়ে দেখতে পারেন,
- আপনি কি 'সত্য ও মিথ্যার' মধ্যে পরখ করতে চান? তবে বইটি আপনারই প্রয়োজন বেশি,
- আপনি কি মহাকাশ বিজ্ঞান বুঝতে চান? তাহলে বইটি একবার পড়ে দেখতে পারেন,
- আপনি কি সত্য ও সুন্দরের পতাকাবাহী সিপাহ্সালার? তাহলে বইটি আপনার নিত্যসঙ্গী হতে পারে,
- আপনি কি আগামী দিনে সোনালী সমাজ গড়ার লক্ষ্যে রাজপথে দৃঢ়পদে এগিয়ে চলা যুবক? তাহলে বইটি আপনাকে সঠিক পথ প্রদর্শনে সহায়তা করতে পারে।

"শপথ নক্ষত্র পুঞ্জের (গ্যালাক্সির) যখন উহারা ভাসিয়া ভাসিয়া (মহাশূন্যে পরিভ্রমণে নিরত থাকিয়া) অদৃশ্য হইয়া যায় (প্রচন্ড গতির কারনে মহাসঙ্কোচনে পড়িয়া ক্রমান্বয়ে সব ভেঙ্গে চুরে "মহাসূক্ষ্ম" এক বিন্দুতে উপনীত হয়)"।

(৫৩ ঃ ১)

"কত মহান তিনি, যিনি আকাশে সৃষ্টি করিয়াছেন দূর্গ (গ্যালাক্সি) এবং উহাতে স্থাপন করিয়াছেন প্রদীপ ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র।" (২৫ ঃ ৬১)

কুরআন, কিয়ামাত ও পরকাল

QURAN, DOOMSDAY & HEREAFTER

"তুমি তো বিস্ময়বোধ করিতেছ, আর উহারা করিতেছে বিদ্রূপ এবং যখন উহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হয় উহারা তাহা গ্রহণ করে না। উহারা কোন নিদর্শন দেখিলে উপহাস করে এবং বলে 'ইহাতো এক সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নহে।' আমরা যখন মরিয়া যাইব এবং মৃত্তিকা ও অস্তিতে পরিণত হইব, তখন কি আমাদিগকে উত্থিত করা হইবে? এবং আমাদের পূর্বপুরুষদিগকেও? বল, 'হাঁ, এবং তোমরা হইবে লাঞ্ছিত।'

উহা একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দ হইবে, আর তখনই উহারা প্রত্যক্ষ করিবে এবং উহারা বলিবে, 'দুর্ভোগ আমাদের! ইহাই তো কর্মফল দিবস।' ইহাই ফয়সালার দিন যাহা তোমরা অস্বীকার করিতে।"

আল্-কুর'আন (৩৭ : ১২-২১)

আল্-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স সিরিজ-২

কুরআন কিয়ামাত পরকাল

(প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক তথ্যভিত্তিক)

মুহাম্মাদ আন্ওয়ার হুসাইন

সম্পাদনায়

প্রফেসর ড. এস. এম. আজহারুল ইসলাম

অধ্যাপক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাক্তন অধ্যাপক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ

কিং সউদ ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ, সৌদি আরব

র‍্যাকস পাবলিকেশন্স

২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

কুরআন, কিয়ামাত ও পরকাল

মুহাম্মাদ আনওয়ার হুসাইন
পরিচালক
দ্যা ডিভাইন লাইট রিসার্চ সেন্টার
কর্ণেল হাট, চট্টগ্রাম।

ISBN : 984-873-000-1 set

প্রকাশনায়
র‍্যাকস পাবলিকেশন্স
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০০১
পঞ্চম প্রকাশ : আগস্ট, ২০০৯

প্রচ্ছদ : আহসান কম্পিউটার সেন্টার

পরিবেশনায়
আহসান পাবলিকেশন
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৬৭০৬৮৬

মুদ্রণ : প্রাইম প্রিন্টার্স
১০ নিলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা মাত্র
ইউএস ডলার : ৬.০০

RAQS Book Series : 05

QURAN, DOOMSDAY & HEREAFTER

MUHAMMAD ANWAR HUSAIN

Edited by :
Dr. S.M. Azharul Islam

মরহুম শ্রদ্ধেয় পিতা– জনাব জামাল আহম্মাদ, যিনি আমার জন্মদাতা হিসেবে আমার জন্য একটি সুন্দর নাম বাছাই করে, দীর্ঘ প্রায় ২৫টি বছর কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আমার জন্য আহার যুগিয়ে এবং গভীর রাতে পিন পতন স্তব্ধতার নীরব পরিবেশে পড়ার টেবিলে এসে মাথায় হাত রেখে আমার জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে দোয়া করতেন, সেই পরম শুভাকাঙ্খী ও দরদী পিতার রূহের মাগফিরাত কামনা করে এবং জান্নাতের মেহমানের মর্যাদা লাভের দোয়া আল্লাহ পাকের শাহী দরবারে পেশ করে তাঁরই উদ্দেশ্যে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে উৎসর্গ করছি।

প্রকাশকের নিবেদন

প্রথমেই তাঁর নামে সকল প্রকার প্রশংসা ও গুণগান প্রকাশ করছি, যিনি আমাদের এই মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক এবং যিনি আমাদের মত অনুল্লেখযোগ্য তাঁর গোলামদের দিয়ে মানবজাতির জন্য সর্বশেষ হিদায়াতস্বরূপ প্রেরিত তাঁরই পবিত্র 'বাণীসমূহকে' জ্ঞানের সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রযুক্তিগত চরম উৎকর্ষতার ভেতর দিয়ে প্রমাণ সাপেক্ষে মানবজাতির জ্ঞানচক্ষুর সম্মুখে তুলে ধরার তাওফীক দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

আমাদের প্রথম প্রকাশিত 'আল-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স সিরিজ-১' এর প্রতি প্রথম থেকেই সম্মানিত পাঠক সমাজের বর্ণনাতীত আগ্রহ লক্ষ্য করে আমরা আমাদের উক্ত কাজে পূর্বের তুলনায় বেশি আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েছি, যার ফলশ্রুতিতে বক্ষমান সিরিজ-২। যথাসাধ্য স্বল্পসময়ের ব্যবধানেই জ্ঞানতাপস পাঠককুলের হাতে আমরা বইটি তুলে দিতে সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা চালিয়ে এসেছি। এতে কিন্তু আমাদের কোন প্রকার কৃতিত্ব নেই। সকল কৃতিত্ব একমাত্র 'আল্লাহরই জন্য। তাঁর পক্ষ থেকে সার্বিক সাহায্য অবতীর্ণ না হলে অন্তত আমাদের পক্ষে এই কাজ মোটেই সম্ভবপর ছিল না।

বক্ষমান সিরিজটি পরকাল অবিশ্বাসীদের সকল প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংকীর্ণতা ও ভিত্তিহীন হাজারো প্রশ্নকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়ে একেবারে কঠিন এক বাস্তবতার মধ্যদিয়ে বৈজ্ঞানিক সত্যতার মাপকাঠিতে 'পরকালকে' পাঠকের সামনে এনে উপস্থাপন করেছে। ফলে যিনি বিজ্ঞানে বিশ্বাসী হবেন, তিনি অবশ্যই পরকালে বিশ্বাসী না হয়ে পারবেন না। বর্তমান বিজ্ঞান আল্লাহ, পরকাল ও জান্নাত-জাহান্নাম অস্বীকার করার সকল পথই যে বন্ধ করে দিয়েছে উক্ত 'মহাসত্য' তথ্যটি বিজ্ঞান প্রিয় ও বিজ্ঞান পাগল মানুষগুলোকে অবহিত করার লক্ষ্যে লেখকের শত চেষ্টা-প্রচেষ্টার সাথে আমাদের সামর্থকেও সংযোজন করতে এগিয়ে এসেছি।

আল্লাহ আমাদের কবুল করুন। আমীন!

মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া

সম্পাদকের কথা

অসংখ্য প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার এক সাগর জোয়ারের ঢেউ ভেংগে ভেংগে শেষ অবধি আল-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স সিরিজ-২, "কুরআন, কিয়ামাত ও পরকাল" চিন্তাশীল জ্ঞানী পাঠক সমাজের হাতে অর্পণ করার নিমিত্তে সম্পাদনা করতে পেরে মহান স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহর গুণগান ও প্রশংসা অবনতশীরে প্রকাশ করছি, আলহামদুলিল্লাহ।

প্রায় তিনশত বছর পূর্বে ইংরেজ দার্শনিক ও রাজনীতিক ফ্রান্সিস বেকন (Francis Becon) একটি কঠিন 'সত্য' উক্তি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন 'সামান্য দর্শন জ্ঞান মানুষকে নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যায়, আর গভীর দর্শন জ্ঞান তাকে ধর্মের পথে টেনে আনে।' উক্ত তথ্যটি আমাদের বক্ষমান খণ্ডের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের অপ্রতিরোধ্য প্রবাহের ছোঁয়ার এক সোনালী আভায় কিরণ ছড়িয়ে মানব জাতিকে সত্য ধর্মের সুশীতল ছায়ার হাতছানি দিচ্ছে।

বিজ্ঞানের বর্তমান অগ্রগতিতে অর্জিত সাফল্যগুলোকে লেখক যেভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন তাতে আমার কাছে মনে হয়েছে, কিয়ামাত, পরকাল ও আল্লাহকে অস্বীকার করার ব্যাপারে 'বিজ্ঞান'-ই এখন বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কারসমূহ যেন অদৃশ্য কোন এক প্রভাবশালী নিয়ন্ত্রকের ইশারায় 'কুরআনের' পক্ষ অবলম্বনে ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে।

বইটি সম্পাদনা করতে গিয়ে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি এই ভেবে যে, সঠিকভাবে কুরআনকে বুঝার জন্য বিজ্ঞানের কোন বিকল্প হতে পারে না। বস্তুতঃ জ্ঞানের তরী-ই পারে জ্ঞানসাগর পাড়ি দিতে। বইটি যে এক রূঢ় ও কটিন বাস্তবতার কারণে সমগ্র বিশ্ববাসীর নিজ স্বার্থেই পড়ার প্রয়োজন রয়েছে, তা কেবল অধ্যয়নের পরই অনুমেয় হতে পারে। আগামী

দিনগুলোতে বিজ্ঞান যে অদৃশ্য ও ধর্মীয় বক্তব্যসমূহকে আরও প্রকাশ্য প্রমাণ ভিত্তিক উপস্থাপনে দৃঢ় ভূমিকা রাখবে, বইটি অধ্যয়নের পর তা এক প্রকার নিশ্চিতরূপেই বলা যায়।

স্বল্প সময়ের ভিতর বইটি সম্পাদনা করতে হয়েছে বলে কিছু কিছু অসঙ্গতি থাকা স্বাভাবিক। ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে সঠিকভাবে আরও উন্নত করার ইচ্ছা রইল। উক্ত মহান সিরিজের লেখক তার গবেষণা, চিন্তা-চেতনা, ভাবনা ও তার ফলাফলকে চরম বাস্তবতার আঙ্গিকে আরও বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে দিক পাল হারা মানবতাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকায় যেন অবতীর্ণ হতে পারেন সে প্রার্থনা জানিয়ে ইতি টানছি।

"সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত, মিথ্যার পতন অবশ্যম্ভাবী।"

ড. এস. এম. আজহারুল ইসলাম

লেখকের কথা

আল্‌হামদুলিল্লাহ, এক সাগর সমস্যা এক এক করে অতিক্রমের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তায়ালা পরিশেষে 'বর্তমান বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পরকালের সত্যতা' বিষয়ক বইটি বিশ্বব্যাপী মানব সমাজের হাতে তুলে দেয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে অধ্যয়নের পরই আশা করছি পাঠক সমাজ বইটির অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন এ জন্য যে, 'কুরআন' এবং 'বিজ্ঞান'-এর এক অভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে বক্ষমান সিরিজে।

আমাদের এই মহাবিশ্বের তুলনায় ভূ-পৃষ্ঠের মানবকুল ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র এক প্রাণী হলেও উক্ত বিশাল মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচনে কিন্তু কখনও চুপটি করে বসে থাকেনি; বরং সৃষ্টিকর্তা 'আল্লাহ তায়ালার' পক্ষ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে কেবলই এগিয়ে গিয়েছে। প্রথম দিকে ব্যর্থ হলেও বিংশ শতাব্দীতে ব্যাপক বিষয়ে সফলতার সোনালী যুগের সূচনা করতে সমর্থ হয়েছে। এখন প্রতিদিন এক এক করে আবিষ্কারের কাতারে সংযোজন হচ্ছে নিত্য-নতুন বিষয়সমূহ। আর পৃথিবীর মানবগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ ভাবছে আবিষ্কৃত তথ্যসমূহ বুঝি এই প্রথম তাদের সম্মুখে প্রকাশিত হয়েছে। আসলে কিন্তু তা নয়; বরং সত্য কথা হলো– মহাবিশ্বের স্রষ্টা তাঁর অদৃশ্য সত্তাকে মানব জ্ঞানের আওতায় প্রকাশ করার জন্য প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে 'আল-কুরআন' নামক ঐশী গ্রন্থে মহাবিশ্বের মৌলিক বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহকে বিশ্বব্যাপী প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘ সময় পর তা এক এক করে 'বিজ্ঞান' নামক মাধ্যমের ভেতর দিয়ে প্রমাণিত করে চলেছেন, যেন প্রায় দেড় হাজার বছরের এক প্রান্তে ঐশী বাণী কুরআনের প্রস্তাবকে এবং অপরপ্রান্তে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত হুবহু বিষয়কে দর্শন করে মানব সমাজ তাদের একমাত্র অদৃশ্য 'প্রভুর' সার্বিক কৃতিত্বকে জ্ঞানের মাপকাঠিতে মেনে নিতে পারে। মানুষ যেন তার স্বভাবজাত আকুতি-মিনতি ও ভক্তির সাথে উর্ধ্বতন মহান সত্তার পদতলে নিজ মস্তককে অবনত করে দিতে পারে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মানব সমাজের জ্ঞানীরা আজ সে পথে নেই, বর্তমান 'বিজ্ঞানই' তাদের 'প্রভুর' স্থান দখল করে আছে, এ দুঃখ রাখার জায়গা কোথায়?

আজকে বিজ্ঞানের গৌরবময় পরিবেশে সত্য ও সঠিক 'বিজ্ঞান' যে 'আল-কুরআনের' সহযোগী এবং অনুগামী তা এতই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছে যে, তার

একটু তুলনামূলক আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলেই সমাজের জ্ঞান চক্ষুধারীগণ সাথে সাথেই 'কুরআনের' শ্রেষ্ঠত্ব পদে পদে দর্শন লাভ করে এক ও একক স্রষ্টার করুণায় সিক্ত হয়ে নিজেকে ধন্য করে তুলতে পারেন। আর এতটুকুন কাজের আঞ্জাম দেয়া-ই একজন বিশ্বাসী হিসেবে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির এই কসরত করার একমাত্র কারণ।

বক্ষমান 'আল-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স সিরিজ-২' সুধী পাঠকের বৈচিত্রময় তীক্ষ্ম দৃষ্টির সামনে আল-কুরআনের বেশ কয়েকটি পবিত্র ঐশী বাণীর প্রকৃত তথ্য সরাসরি বৈজ্ঞানিক তথ্যের বাস্তবতার আলোকে নূতনভাবে মেলে ধরেছে। অথচ বিষয়গুলো এতদিন মানবীয় কল্পনায় দোদুল্যমান ছিল। বইটি অধ্যয়নে সে দোদুল্যমান অবস্থার অবসান ঘটবে।

বইটি এমন এক সময় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, যখন একবিংশ শতাব্দির গোড়াতেই মহাকাশ বিজ্ঞানে সবচেয়ে বেশি সফলতা লাভকারী দেশ আমেরিকার 'NASA' সেন্টারের উদ্যোগে প্রথমবারের মত মহাশূন্যে তৈরী 'ইন্টারন্যাশনাল স্পেস ষ্টেশন-ফ্রিডম' (International Space Station–Freedom) নভোচারী এবং মহাকাশ বিজ্ঞানী ধারণ করে তাদের কার্যক্রম শুরু করার ঘোষণা দিয়েছে। পরবর্তীতে যা কুরআনের পক্ষে আরও নিত্য-নতুন আবিষ্কার সম্পন্ন করে মহান সত্তা আল্লাহর কৃতিত্বকে বিশ্বব্যাপী উদ্ভাসিত করবে। এরপর 'Gain-assisted Super liminal light propagation হেড লাইন physicists L. J. Wang' A. Kuzmich এবং A. Dogaria একযোগে ২০শে জুলাই ২০০০ সনে ইংল্যান্ডের মাসিক জার্নাল 'Nature'-এ ঘোষণা করেছেন মহাবিশ্বে বর্তমান বিশ্বাসকৃত 'আলোর গতিই (প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল) সবচেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন' তা সত্য নয় বরং মিথ্যা। তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় (experiment) লেসার পাল্‌স (laser pulse) বিংশ শতাব্দীর উক্ত সর্বোচ্চ দ্রুতির রেকর্ড ভেঙ্গে ফেলেছে, 'Nothing can travell faster than light' (কোন কিছুই আলোর চেয়ে দ্রুত চলতে পারে না) এখন মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে, যা কুরআনও পূর্বে অনুমোদন করেনি। কারণ তাতে আল্লাহর সার্বিক ক্ষমতা এবং মহাবিশ্বে তাঁর কার্য নির্বাহ সীমিত হয়ে পড়ে। যাই হোক, অবশেষে সত্য দিন উদয় হতে শুরু করেছে এবং ভবিষ্যতে বিষয়টি আরও ব্যাপকতা লাভ করে আল্লাহর বাণীকে পরম সত্য বাণী হিসেবে প্রকাশ করবে।

অপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে– বিশ্বব্যাপী চার জাতির ১৬টি ইউনিভার্সিটি এবং NASA-র সিনিয়র সাইন্স ম্যানেজার Mr. Harley Thronson, ইটালিয়ান টীম লীডার Mr. Paolo de Bernardes সহ ক্যালিফোর্নিয়ার Institute of Technology-র টীম লীডার Mr. Andrew Large প্রায় চার মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে পরিচালিত International project dubbed "Boomerang"-এ ব্যাপক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে অবশেষে একযোগে বিশ্বব্যাপী ঘোষণা করেন– আমাদের মহাবিশ্বটি 'Closed' মহাবিশ্ব নয় (যা এতদিন ধারণা করা হত); বরং 'Open' মহাবিশ্ব (যা কুরআনও দাবী করে আসছে)। পরবর্তী সিরিজগুলোতে ইনশাআল্লাহ উক্ত বিষয়সমূহ বিস্ময়কর জ্যোতির বিকীরণ ছড়িয়ে মহাসত্যের মহিমা ও গুণগান গেয়ে গেয়ে পাঠকের সম্মুখে হাজির হবে এবং ঐ আলোচনার নিমিত্তে বইটি যথার্থ ক্ষেত্র তৈরীতে বিশেষ অবদান রাখতে দারুণভাবে সহযোগিতা করবে।

যে কোন মানুষের-ই কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে, তাই বইটির যে কোন ব্যাপারে মন্তব্য, পরামর্শ ও সংশোধনী অবহিত করলে একটি মহৎ কাজে সম্মানিত পাঠকের একান্ত সহযোগিতা ও প্রশংসনীয় অংশগ্রহণ হিসেবেই বিবেচনা করবো এবং পর্যালোচনা সাপেক্ষে তা পরবর্তী সংস্করণে সংযোজন বা বিয়োজনের সর্বাত্মক চেষ্টা করবো।

বইটির শুরু থেকে প্রকাশিত হওয়ার সময় পর্যন্ত যারা যতটুকুনই সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন, প্রার্থনা থাকলো মহাবিশ্বের প্রতিপালক মহান আল্লাহ যেন এর উত্তম বিনিময় তাদের সকলের ভাগ্যলিপিতে লিখে দেন।

পরিশেষে বলতে চাই– "বিজ্ঞানের বর্তমান আবিষ্কার, রুখে দিয়েছে 'আল্লাহ'-কে অস্বীকার।" আমাদের সিরিজগুলোতে সম্মানিত পাঠক সমাজ তা বাস্তব চোখে অবশ্যই দর্শন লাভ করতে সক্ষম হবেন এবং তার-ই পরিপ্রেক্ষিতে নিজ করণীয় কি হতে পারে, সে ব্যাপারে যথার্থ ভূমিকা নিয়ে সম্মুখপানে অগ্রসর হবেন– এই আশা ব্যক্ত করে প্রকৃত জ্ঞান ও সত্যের পথে সবাইকে আমন্ত্রণ পেশ করছি।

বিনীত

মুহাম্মাদ আনওয়ার হুসাইন

বৈজ্ঞানিক অঙ্কপতন
(Scientific Notation)

1 Billionth (US)	=	0.000000001	=	10^{-9}
1 Millionth	=	0.000001	=	10^{-6}
1 Thousandth	=	0.001	=	10^{-3}
1 Hundredth	=	0.01	=	10^{-2}
1 Tenth	=	0.1	=	10^{-1}
1 Hundred	=	100	=	10^{2}
1 Thousand	=	1000	=	10^{3}
1 Million	=	1,000,000	=	10^{6}
1 Billion (US)	=	1000,000,000	=	10^{9}

১৯৬০ সাল থেকে মহাকাশের মহাশূন্যতায় যারা রেকর্ড পরিমাণ সময় অবস্থান করে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাদের তালিকা

মহাশূন্যে অবস্থানগত সময়	তারিখ	আকাশযান	খ্যাতি অর্জনকারী
১ দিন	৬ আগষ্ট ১৯৬১ সাল	Vostok 2	Gherman Titov (রাশিয়া)
১ সপ্তাহ	আগষ্ট ১৯৬৫ সাল	Gemimi 5	Gordon Cooper Charles Corrad (আমেরিকা)
১ বছর	১৯৮৭-৮৮ সাল	Mir	Vladimir Titov Musakhi Mananrov (রাশিয়া)
৪৩৮ দিন	১৯৯৪-৯৫ সাল	Mir	Valeri Poliakov (রাশিয়া)
১৬৯ দিন	১৯৯৪-৯৫ সাল	Mir	Yelena (মহিলা) Kondakona (রাশিয়া)

মহাশূন্য পরিসংখ্যান

সৌর ব্যবস্থা										
	সূর্য	বুধ	শুক্র	পৃথিবী	মঙ্গল	বৃহস্পতি	শনি	ইউরেনাস	নেপচুন	প্লুটো
ব্যাস (কিলোঃ)	১,৩৯২,০০০	৪,৮৭৪	১২,১০৩	১২,৭৫৬	৬,৭৮৬	১৪২,৯৮৪	১২০,৫৩৬	৫১,১১৮	৪৯,৫২৮	২,২৭৪
ভর (পৃথিবী = ১)	৩৩২,৯৪৬	০.০৫	০.৮২	১	০.১১	৩১৮	৯৫.১৮	১৪.৫	১৭.১৪	০.০০২
পৃষ্ঠদেশে মাধ্যাকর্ষণ বল (পৃথিবী = ১)	২৭.৯	০.৩৮	০.৯১	১	০.৩৮	২.৩৬	০.৯২	০.৮৯	১.১২	০.০৭
পৃষ্ঠদেশে গড় তাপমাত্রা (C)	৫.৫০০	১৭৯	৪৮২	১৫	-৬৩	-১২১	-১৮০	-১৯৩	-২০০	-২৩০
দিনের দৈর্ঘ্য (ঘণ্টায়)	৬১০-৮৬৪	১,৪০৮	৫,৮৩২	২৪	২৫	১০	১০	১৮	১৯	১৫৩
বছরের দৈর্ঘ্য (পৃথিবীর দিনের হিসাবে)	-	৮৮	২২৫	৩৬৫	৬৮৭	৪,৩৩৩	১০,৭৬০	৩০,৬৮৫	৬০,১৯০	৯০,৮০০
সূর্য থেকে দূরত্ব (মিলিয়ন কিলোঃ)	-	৫৮	১০৮	১৫০	২২৮	৭৭৮	১,৪২৭	২,৪৭১	৪,৪৯৮	৫,৯০৬
সূর্যের চতুর্দিকে আবর্তন গতিবেগ (কিলোঃ/ঘণ্টা)	-	১৭২,৩৩২	১২৬,০৭২	১০৭,২৪৪	৮৬,৮৬৮	৪৭,০১৬	৩৪,৮১২	২৪,৫১৬	১৯,৫৪৮	১৭,০৬৪
বলয় সংখ্যা	০	০	০	০	০	৩	৭	১০	৬	০
আবিষ্কৃত চন্দ্রের সংখ্যা	০	০	০	১	২	১৬	১৮	১৭	৮	১

সূচীপত্র

নূর-উল-কুরআনঃ

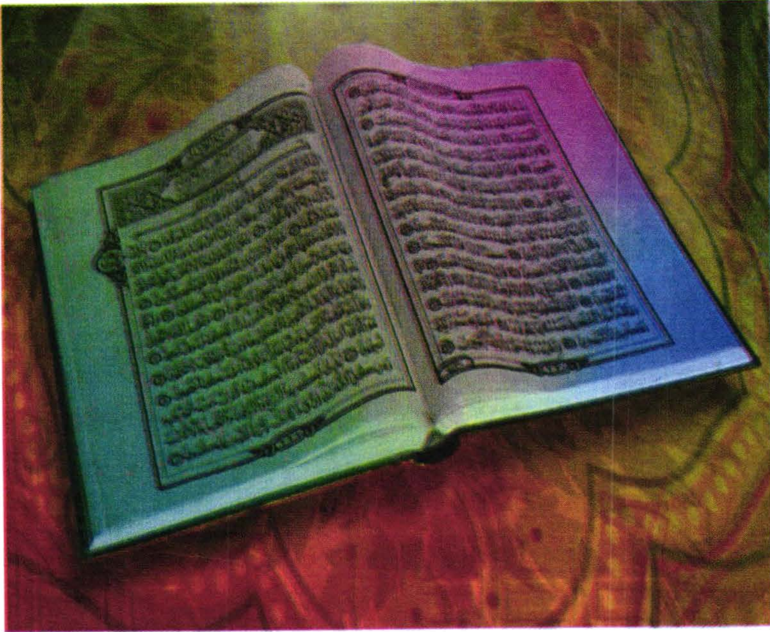
"শপথ বিজ্ঞানময় কুরআনের" (৩৬ঃ২)। মহাগ্রন্থ আল্-কুরআনের মধ্যে স্থান পেয়েছে সর্বমোট ১১৪টি সুরা (Chapter)। আবার এই ১১৪টি সুরার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৈশিষ্টের অধিকারী সুরা হচ্ছে-'সুরা ইয়াসীন'। পবিত্র হাদীসগ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে যে-'সুরা ইয়াসীন' হচ্ছে কুরআনের 'হৃদপিন্ড'। প্রাণীদেহে তার হৃদপিন্ডটি যেমন অনন্য বৈশিষ্ট্যধারী এবং গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক অনুরূপভাবে 'সুরা ইয়াসীন'ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং অনন্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সুরা হিসাবে কুরআনে স্থান লাভ করেছে। এর পিছনে যে কারণগুলো রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো-সুরাটির শুরুতেই উচ্চারিত হয়েছে-"শপথ বিজ্ঞানময় কুরআনের", এটি এমন একটি 'বাক্য' যার মূলবক্তব্য, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েও মানবমন্ডলী তা বর্ণনা করে শেষ করতে পারবে না। সীমা-পরিসীমাহীন জ্ঞানময় বিশাল মহাবিশ্বের মাঝে একটি বালু-কনার সমানও মানুষ এখনো জ্ঞানার্জন করতে পারেনি যেখানে, সেখানে বিজ্ঞানময় মহাবিশ্বের খুব একটা বড় ধরনের জ্ঞান অর্জন করা যে মানবমন্ডলীর পক্ষে কখনো সম্ভব নয়, সে কথা বর্তমান নামকরা বিজ্ঞানীগণই কিন্তু প্রকাশ করে যাচ্ছেন। পৃথিবীপৃষ্ঠে আগত মানবজাতির প্রয়োজনে মহাবিশ্বের জ্ঞানসাগর থেকে যতটুকুন দরকার, ঠিক ততটুকুনই ঐশীগ্রন্থ আল্-কুরআন বুকে ধারণ করে আমাদের দরজায় কড়া নাড়ছে। আর এতে লক্ষণীয় যে বিভিন্ন উৎস থেকে পেশকৃত 'বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবসমূহ' শত শত বার অবস্থানের পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকলেও 'আল্-কুরআন' প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে মাত্র একবারের জন্য যা ঘোষণা করেছে বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবনা হিসাবে তা আজও সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্তিত থেকে মানবজাতিকে জ্ঞানের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পরশ বুলিয়ে মহাসত্যের পানে ডাক দিয়ে যাচ্ছে।

পূর্বে 'কুরআনের' ওপর যথাযথভাবে গবেষণা না হওয়ার কারণে এবং সাথে সাথে বিজ্ঞানের মাধ্যমেও খুব একটা বেশি আবিষ্কার সম্পন্ন না হওয়ায় মানবজাতি, কুরআন যে সত্য-সত্যই বিজ্ঞানময় এবং তার প্রতিটি পৃষ্ঠাই বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবসমূহের উজ্জল কিরণচ্ছটায় উদ্ভাসিত, তা অনুধাবন করতে পারেনি। বর্তমানে অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায় এবং একই সাথে উক্ত দুটি কাজ পাশাপাশি এগিয়ে চলার কারণে মানবসমাজ একহাতে ধারণকৃত উদ্ঘাটিত বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে অপর হাতে আঁকড়ে ধরা

কুরআনের সাথে মিলিয়ে দেখতে গিয়ে, প্রকৃত বাস্তবসত্য ও প্রমাণিত বিষয়গুলোর হুবহু মিল দেখে শুধু অভিভূতই হচ্ছে না; সাথে সাথে কিংবর্তব্যবিমূঢ়ও হয়ে পড়ছে। ভাব্ছে- এও কি সম্ভব? ৭ম শতাব্দীর ঘোর আমাবশ্যার অন্ধকারের চাইতেও আরো ঘন-কালো, অশিক্ষা ও কুশিক্ষার পরিবেশে অবতীর্ণ মানবজাতির পথচলা আলোস্বরূপ 'আল্-কুরআনের' তুলনাহীন ও কালজয়ী অমোঘবাণীসমূহ কি না কেবলমাত্র বিংশ শতাব্দীতেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত ও সর্বোচ্চ পর্যায়ে উদ্ঘাটিত তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে জানা বা বুঝা সম্ভবপর হচ্ছে। এতে জ্ঞানবানদেরও আর বুঝতে মোটেই কষ্ট হচ্ছে না যে– আল্-কুরআন বর্তমান প্রশংসিত বিজ্ঞানের কত হাজার বছর অগ্রে থেকে পদচারণা করছে! তাই এমন একটি মহাবিস্ময়কর, অম্লান ও চিরসত্য 'জ্ঞানের বাণী' বিশ্বব্যাপী সগৌরবে প্রকাশিত করে জ্ঞানবান মানবসমাজের প্রখর দৃষ্টির সম্মুখে তুলে ধরার কারণে হয়তোবা 'সুরা ইয়াসীন' 'কুরআনের' হৃদপিন্ডস্বরূপ আখ্যায়িত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছে এবং সে জন্য বাক্যটি সুরার প্রথমেই উচ্চারিত হয়েছে।

আমরা 'আল্-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স-সিরিজ-১ এ মহাগ্রন্থ আল্-কুরআনের অলৌকিক বেশ কয়েকটি বিস্ময়কর বৈশিষ্টের উল্লেখ করেছি। যেমনঃ কুরআনের ভাব, ভাষা, বাক্য ও এর দৃঢ়তা, ন্যায্যতা, সৌন্দর্যের অতুলনীয়তা এবং ১৯ সংখ্যার মাহাত্মসহ আরও কয়েকটি বিষয়ে প্রমাণ করার চেষ্ট করেছি যে– সার্বিক বিবেচনায় 'আল্-কুরআন' মানবীয় জ্ঞানে তৈরী এবং অবতীর্ণ হয়নি তা বিশ্বব্যাপী উদ্ভাসিত হয়ে ঝল্-ঝল্ করছে। বর্তমান নিরপেক্ষ ও ত্রুটিমুক্ত কম্পিউটারও (Computer) উৎকর্ষিত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা দ্ব্যার্থহীন ভাবে প্রকাশ করেছে। চলতি পর্বেও আমরা কুরআনের আরও কয়েকটি অনন্য ও গুরুত্বপূর্ণ অলৌকিক বৈশিষ্টের দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের চেষ্টা করবো, যে বিষয়গুলো একেবারেই সম্প্রতি উদ্ঘাটিত হয়ে সমগ্র বিশ্বব্যাপী 'কুরআনের' সত্যতাকে কল্পনাতীত জ্ঞানের সমারোহে প্রখর রোদ্রকোজ্জল দিনের শুভ্রতায় মেলে ধরেছে।

দিন যতই যাচ্ছে ততই আমাদের নিকট মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টার 'কৃতিত্ব' এবং 'মাহাত্ম' ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে, 'কুরআনে' তিনি কেন যে উল্লেখ করেছেন–"বল, যদি পৃথিবীর মানব মন্ডলী এবং জ্বিনেরা পরস্পর মিলিত হয়ে 'কুরআনের' মতো করে একখানা গ্রন্থ রচনা করার চেষ্টা করে, তাহলেও তারা তা কক্ষণই পারবে না, যদিও তারা একে



চিত্রঃ ১

"এক কল্যানময় কিতাব, ইহা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে মানুষ ইহার আয়াত সমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ।" (৩৮ ঃ ২৯)

'আল্-কুরআন' সৃষ্টির সেরা মানব সমাজে মহাজ্ঞান সমৃদ্ধ এক মহাবিস্ময়ের বিস্ময় হয়ে বিরাজ করছে। জ্ঞানের সকল শাখাকে একত্রিত করে অবতীর্ণ হয়েছে এই কিতাব।

অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করুক না কেন !" (১৭:৪৪), তা এখন মানবজ্ঞানে একটু একটু করে উপলব্ধি করা সম্ভবপর হচ্ছে। অতি সম্প্রতি একজন আরবীভাষী প্রখ্যাত ইসলামী পন্ডিত ও গবেষক (Scholar) 'আল্-কুরআনের' ওপর তাঁর আধুনিক চিন্তাধারার আলোকে কতকগুলো ব্যবহৃত শব্দের ওপর গবেষণা করে এদের বিস্ময়কর যে পরিসংখ্যানগত উপাত্ত (Statistical data) লাভ করেন, তা খুবই আগ্রহ ভরে (Highly interestingly) শুধু মুসলিম জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গই অবলোকন করে ধন্য হননি, সাথে সাথে বিশ্বব্যাপী এক বিরাট সংখ্যক অমুসলিম জ্ঞানী সমাজও জ্ঞানপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে রীতি মতো স্তম্ভিত হয়ে যান। বিশেষ করে বিজ্ঞান (Science) এবং (Statistics) পরিসংখ্যান-এর উপর দক্ষ ব্যক্তিত্ব সম্পন্নরা 'কুরআনের' উক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণে গ্রন্থ বুননে কতিপয় শব্দের আশ্চার্য করার মত কৌশল স্থাপনে তারা অভিভূত হয়ে যান।

ডঃ তারিক আল্-সুওয়াইদান (Dr. Tarik Al-Suwaidan) তাঁর গবেষণালব্ধ বিস্ময়কর ও নজিরবিহীন প্রাপ্তিকে ইন্টারনেটের (Internet) মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ওয়েভ সাইট (Web Site)গুলোতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে সৃষ্টির সেরা মানুষের জ্ঞানের রাজ্যকে আরেকবার নাড়া দিয়ে প্রমাণ করলো–'কুরআন' সত্যগ্রন্থ, 'কুরআন' অবতীর্ণকারী মহান স্রষ্টা 'আল্লাহ্' সত্য এবং 'আল্লাহ্‌র' জ্ঞান, মহাবিশ্বে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানবীয় জ্ঞানের বহু বহু উর্ধ্বে, যা কল্পনা করাও এক দুরূহ ব্যাপার বৈ কি !

এবার ডঃ তারিক আল-সুওয়াইদানের গবেষণায় উদ্‌ঘাটিত বিষয়গুলো লক্ষ্য করুন ঃ

শব্দ (Word)	অর্থ (Meaning)	শব্দটি যতবার কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে তার সংখ্যা। Number of times accound in the Quran.
AL-DUNYA	ইহ্জগত - This World	১১৫ (115) বার
AL-AKHIRA	পরজগত -Here after	১১৫ (115) বার
AL-MALAIKA	ফিরিশ্তাগণ – Angles	৮৮ (88) বার
AL-SHAYATEEN	শয়তান - Satans	৮৮ (88) বার

AL- HAYAT	জীবন - Life	১৪৫ (145) বার
AL-MAOUT	মৃত্যু - Death	১৪৫ (145) বার
AL-NAFA	উপকারী - The Useful	৫০ (50) বার
AL-FASAD	ক্ষতিকর-The Harmful	৫০ (50) বার
AL-NAAS	জনগণ - The Peoples	৩৬৮ (368) বার
AL-RASUL	রাসুল - The Messengers	৩৬৮ (368) বার
AL-IBLEES	ইবলিশ Iblees	১১ (11) বার
AL-ESTA'AJAT	পরিত্রাণ - Seeking Refuse in Allah From Iblees	১১ (11) বার
AL-MUSIBAH	পরীক্ষা Test	৭৫ (75) বার
AL-SUKRAN	আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ Thanking to Allah	৭৫ (75) বার
AL-ENFAQ	দান - Spending	৭৩ (73) বার
AL-RADA	সন্তুষ্টি - Pleased	৭৩ (73) বার
AL-DALOON	ধ্বংস - Those Astray	১৭ (17) বার
AL-MAOUTY	মৃত - Those Dead	১৭ (17) বার
AL-MUSLEMEEN	মুসলিম - The Moslem	৪১ (41) বার
AL-JEHAD	জিহাদ - The Struggle	৪১ (41) বার

AL-JAHAB	স্বর্ণ - Gold	৮ (8) বার
AL-TAREF	অতিরিক্ত - Over Spending	৮ (8) বার
AL-SAHAR	যাদু - Magic	৬০ (60) বার
AL-FETNAH	ধ্বংসের পথ - Some thing Thalleeds Astray	৬০ (60) বার
AL-JAKAH	যাকাত - Alms	৩২ (32) বার
AL-BARAKAH	বরকত - Blessing	৩২ (32) বার
AL-AKAL	জ্ঞান - Brain	৪৯ (49) বার
AL-NOOR	আলো - Light	৪৯ (49) বার
AL-LESAN	জিহ্বা - Tongue	২৫ (25) বার
AL-MAUEJAH	উত্তমবাক্য - Good Talk	২৫ (25) বার
AL-RAGIBAH	ইচ্ছা - Desire	৮ (8) বার
AL-RAHEBAH	দুষ্কৃতিকারীকে ভয় - Fear Terror	৮ (8) বার
AL-JAHOR	উচ্চ কন্ঠে - Loud	১৬ (16) বার
AL-ELANIAH	প্রকাশিত করা - Publicaly	১৬ (16) বার
AL-SADDAH	শক্ত - Hard	১১৪ (114) বার
AL-SABAR	ধৈর্য - Patience	১১৪ (114) বার
MOHAMMAD (SAWS)	মুহাম্মদ (সঃ) – Mohammad (Saw)	৪ (4) বার
AL-SARIAH	শরীয়া বিধান - Allah's Law	৪ (4) বার
AL-RAJUL	পুরুষ - Man	২৪ (24) বার
AL-MARRAH	মহিলা - Woman	২৪ (24) বার

AL-SHAHR	মাস - Month	১২ (12) বার
AL-YAOM	দিন - Day	৩৬৫ (365) বার
AL-BAHAR	সমুদ্র - Sea	৩২ (32) বার
AL-BAR	ভূমি - Land	১৩ (13) বার

বর্তমান বিজ্ঞানসমৃদ্ধ বিশ্বে যেহেতু পৃথিবীর পানিময় অংশ এবং শুকনো ভূমি পারসেনটেজেই (Percentage) প্রকাশ করা হয়ে থাকে এবং এটাই সঠিক পদ্ধতি, তাই 'সমুদ্র' এবং 'ভূমির' কুরআনিক হিসেবকে আমরাও পারসেনটেজে নিয়ে যেতে চাই, তাহলে দাড়ায় ঃ-

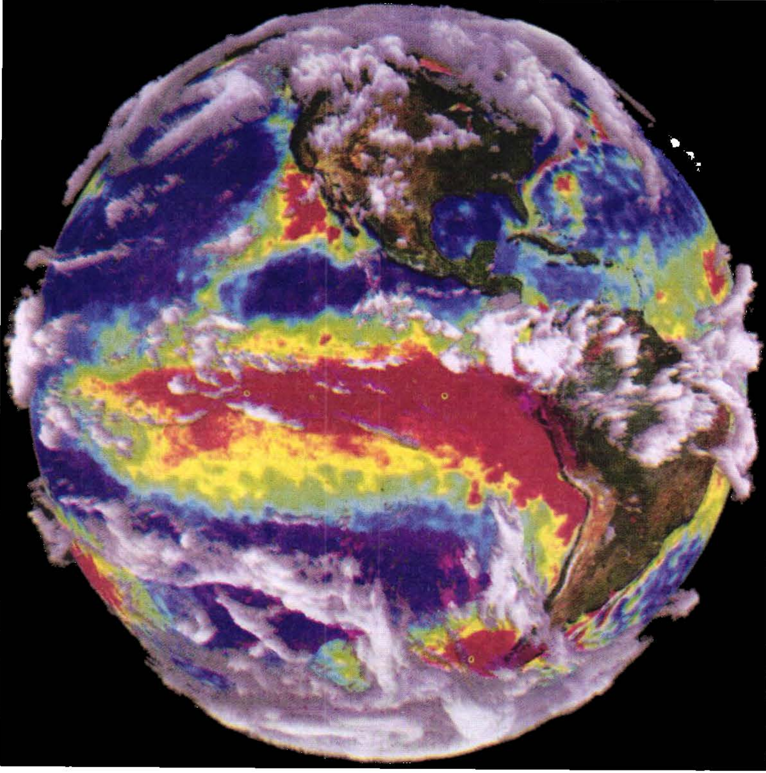
৩২+১৩ = ৪৫

সুতরাং, ৩২/৪৫ X ১০০০ % = ৭১'১১১১১১১ % পানি,

আবার, ১৩/৪৫X ১০০০ % = ২৮'৮৮৮৮৮৮৮৮ % ভূমি।

বর্তমান বিজ্ঞান উক্ত হিসেবকেই সঠিক বলে রায় প্রদান করেছে, যা আমরা সবাই ইতোমধ্যেই অবগত হয়েছি।

ওপরের ডাটাটি নিরপেক্ষ ও দোষমুক্ত এবং পক্ষপাতহীন কম্পিউটার কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত ও পরিবেশিত, যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের তেমন কোন আলো পৃথিবীর মানবসমাজের জ্ঞানের রাজ্যকে তরাঙ্গায়ীত করেনি, মহাবিশ্ব এবং এর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মানুষ কল্পনার অনুসরণ ছাড়া সত্য-সঠিক কোন দিশা পায়নি, এমনি ধরনের এক অজানা-অচেনা পরিবেশে প্রায় ২৩টি বছর সময়ের প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনমত একটু একটু করে অবতীর্ণ হয়ে প্রায় ৬৬৬৬টি পবিত্র ঐশীবাণী সমূহ একত্রিত হয়েই 'আল্-কুরআন' নামে বিশ্বের বুকে স্থায়ী পরিচিতি লাভ করেছে। আর সেই 'কুরআনই' আজ বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার মানদন্ডে যাচাই-বাছাই হয়ে 'অনন্যগ্রন্থ' হিসেবে বিশ্বব্যাপী সগৌরবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে চলেছে। এতে মূলতঃ এক ও একক মহান স্রষ্টার মাহাত্মই প্রকাশ পাচ্ছে বেশি। 'কুরআন' যদি সত্যই একজন মহাজ্ঞানী সত্ত্বার নিকট থেকে অবতীর্ণ না হয়ে থাকে, তাহলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চূড়ান্ত মোড়কে সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিপাটি করে এরূপ শত শত আশ্চর্য করার মত অনন্য বৈশিষ্ট্য ধারণ করে কিভাবে কুরআন বিশ্ব মানবসমাজকে অভিভূত করে দিতে পারে? কোন মানুষের পক্ষে কি এমনি



চিত্রঃ ২

"বরং তিনি (আল্লাহ্), যিনি পৃথিবীকে করিয়াছেন বাসউপযোগী (জীবনময়) এবং উহার মাঝে মাঝে প্রবাহিত করিয়াছেন নদী-নালা এবং উহাতে স্থাপন করিয়াছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই দরিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন অন্তরায়।
আল্লাহত্ব সহিত অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তবুও উহাদিগের অনেকেই জানে না।" (২৭ ঃ ৬১)

- আল্লাহ্ তাঁর রাসুল ও তাঁর কিতাব পরম সত্যতার মাপকাঠিতে সার্বিকভাবে উত্তীর্ণ বিধায় প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বেই অবৈজ্ঞানিক যুগে পৃথিবীর পানিমগ্ন ও শুকনো ভূমির পরিমাণ শতকরা হিসেবে সূক্ষ্ম পরিমিতিতে তুলে ধরা সম্ভবপর হয়েছে।

ধরনের কোন গ্রন্থ রচনা করা আদৌ সম্ভব? বর্তমান পৃথিবীতে তো গ্রন্থ, কিতাব ও পুস্তকের অভাব নেই, কিন্তু 'কুরআনের' মতো অকল্পনীয় বৈশিষ্ট সম্পন্ন সত্য কিতাব বা গ্রন্থ কি আর একখানাও পাওয়া যাবে কোথাও? ইতোমধ্যেই এর উত্তর কম্পিউটার জগত পেশ করেছে এবং স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছে যে, কুরআনের মত করে সমসংখ্যার শব্দে, বাক্যে, ছন্দে, ভাব, ভাষায় ও বৈশিষ্টে মানুষের পক্ষে একখানা গ্রন্থ রচনা করা সম্ভবপর নয়।

ওপরে উদ্ধৃত 'ডাটা'-তে একবার নজর দিলেই বুঝা যায় যে, 'কুরআন' কত গভীর জ্ঞানের উৎস থেকে পরম সত্যতা সহকারে ধরার বুকে আগমন করেছে। এত বিরাট একটি গ্রন্থে লক্ষ-লক্ষ শব্দ বুননের ভিতর দিয়ে প্রায় দীর্ঘ ২৩টি বৎসর যাবত কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য বিশেষ বিশেষ শব্দসমূহ এর বিপরীত মেজাজের শব্দের সংখ্যার সাথে পরিপূর্ণ সমতা বজায় রেখেই অবতীর্ণ হয়ে পবিত্র ঐশীগ্রন্থ 'কুরআনে' সংকলিত হয়েছে? ওপরের 'ডাটা'র পুরো ব্যাখ্যায় না গিয়ে শুধু চিহ্নস্বরূপ কয়েকটি শব্দের কথাই আলোচনায় আনা যেতে পারে। যেমনঃ 'ইহ্জগত' শব্দটি 'পরজগত' শব্দের সংখ্যার সাথে সংগতি রেখেই সমসংখ্যায় 'কুরআনে' স্থান পেয়েছে। একই ভাবে 'ফিরিশতা' শব্দটি এর বিপরীতে 'শয়তান' শব্দের সাথে সমতা রক্ষা করেছে। 'জীবন' নামক শব্দ ও 'মহিলা' শব্দদ্বয়ও সমসংখ্যায় আবির্ভূত হয়ে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

পৃথিবীতে বারমাসে পূর্ণ একটি বৎসর গণনা করা হয়, আর সে কারণেই মিল রেখে 'মাস' শব্দটি সর্বমোট ১২ বার 'কুরআনে' উল্লেখিত হয়েছে, আবার পৃথিবীতে ৩৬৫ দিনে পূর্ণ একটি বৎসর হিসেব করা হয় বিধায় এর সাথে সমতা রেখেই 'দিন' শব্দটি ৩৬৫ বার ব্যবহৃত হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় নয় কি ? এভাবে অসংখ্য শব্দই 'মহান স্রষ্টার' সৃষ্টি নৈপুণ্যতার জ্বলন্ত স্বাক্ষর হয়ে 'কুরআনে' স্থান পেয়েছে, যা আমরা ডাটা-তে উল্লেখ করেছি।

ডঃ তারিক তাঁর গবেষণায় 'কুরআনের' অলৌকিক যে উপস্থাপনার সর্বশেষ নিদর্শন আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন তা জ্ঞানবান সমাজকে রীতিমতো চমকে দিয়েছে। তারা ভাবছেন কত নিখুঁত ও সুক্ষ্মতার শতকরা হিসাবেই (Percentage) না কুরআন পৃথিবীর পানি ও ভূমির পরিমাণ উপস্থাপন করেছে, যা বিজ্ঞতার চূড়ান্ত অবস্থানকেও হার মানিয়ে দেয়। প্রায়

১৪০০ বৎসর পূর্বের 'কুরআন' বর্তমান (Modern) যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ধারা এবং প্রাপ্তিকেও তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

সুতরাং 'আল্-কুরআন' যে সঠিক বিজ্ঞানের পথ প্রদর্শক তা নতুনভাবে প্রমাণিত হয়ে বিশ্ব মানব সমাজকে সত্যের পানে আবারও আহ্বান জানাচ্ছে।

'আল্-কুরআন' বিজ্ঞানময়, তার শত-শত প্রমাণ ইতোমধ্যেই সমগ্র বিশ্বব্যাপী স্পষ্ট আলোতে যে উদ্ভাসিত হয়ে বর্তমানে মানব জ্ঞানের সামনে ধরা দিয়েছে, এর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় আমরা বক্ষমান খন্ডেও বাস্তবতার আলোকে ছবিসহ উপস্থাপন করেছি, যাতে করে প্রিয় পাঠকবর্গের আগ্রহের তাড়নার ভিতর দিয়ে জ্ঞানের সোপানকে ক্রমান্বয়ে পূর্ণ করা যায় এবং পাঠকবর্গ আল্-কুরআনের 'সত্যতা'-কে দিবালোকে পরখ করে নিয়ে পরবর্তীতে সত্য-সঠিক ও কল্যাণের পথে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যেতে পারেন।

নেবুলা

আল্-কুরআনঃ

"(ওহে মানুষ) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য কর।" (১০ ঃ ১০১)

"আকাশজগত ও ভূ-মন্ডলের মধ্যস্থিত বস্তুপুঞ্জের মধ্যে জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।" (২ ঃ ১৬৪)

"বল, তোমরা কি আল্লাহ্কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর এমন কোন কিছুর সংবাদ প্রদান করিবে, যাহা তিনি অবগত নহেন? তিনি অজ্ঞানতা হইতে অতিশয় পবিত্র।" (১০ঃ১৮)

"আকাশজগত ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপনরহস্য নাই, যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে লিখিত নাই।" (২৭ঃ৭৫)

"তিনিই মানুষকে জ্ঞাত করিয়াছেন ইতোপূর্বে সে যাহা জানিত না।" (৯৬ঃ৫)

"(প্রচন্ড-মহাক্ষমতা অর্জন ব্যতিরেকে স্থানীয় আকাশ এবং পৃথিবী হইতে বাহির হইয়া যাইতে চাহিলে) তোমাদের উপর আগুণের শিখা, ধূলা-বালি, গলিত তাম্র মিশ্রিত ধোঁয়া-মেঘপুঞ্জ ছড়াইয়া পড়িবে, তোমরা যাহার মোকাবিলা করিয়া পার হইয়া যাইতে পারিবে না।" (৫৫ঃ৩৫)

"তোমরা তোমাদের প্রভুর এই নিদর্শনমূলক (বিজ্ঞানসম্মত) বাণীকে মিথ্যা মনে করিয়া কি অস্বীকার করিতে পার?" (৫৫ঃ৩৬)

"আল্লাহ্র বাণীর কোন পরিবর্তন নাই–ইহা মহাসাফল্য।" (১০ঃ৬৪)

"তিনি তোমাদিগকে বহু নিদর্শন দেখাইয়া থাকেন, অত:পর তোমরা আল্লাহ্র কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করিবে?" (৪০ঃ৮১)

"নিশ্চয়ই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে পর্যবেক্ষণশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।" (১৫ঃ৭৫)

"এইগুলো জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের নিদর্শন।" (১০ঃ১)

"ইহা পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতেই অবতীর্ণ গ্রন্থ।" (৪০ঃ২)

"আল্লাহ্ সম্পর্কে কোন সন্দেহ আছে কি যে, তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা?" (১৪ ঃ ১০)

"সত্য তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতেই অবতীর্ণ, সুতরাং যাহার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক এবং যাহার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুক।" (১৮ ঃ ২৯)

"আল্লাহ্ তোমাদিগের (অবিশ্বাসীদের) শ্রুতি ও দৃষ্টির উপর মোহরাঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, তোমাদিগের জন্য রহিয়াছে যন্ত্রণাময় শাস্তি।" (২ঃ৭)

আমরা ওপরে উল্লেখিত স্বর্গীয় ঐশীবাণীসম্ভারের ব্যাখ্যা যদি ধারাবাহিকভাবে অবহিত হওয়ার চেষ্টা করি তাহলে এই মুহূর্ত থেকেই কুরআনকে শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় গ্রন্থই মনে হবে না; বরং সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চূড়ান্ত পর্যায়ে অতুলনীয়-অদ্বিতীয় 'Information book' হিসেবেও আমাদের বিবেক কুরআনকে শ্রদ্ধা জানাতে বাধ্য হবে।

সর্বপ্রথম ১০ঃ১০১ আয়াতটিতে আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন দুনিয়ার মানবমন্ডলীকে তাদের প্রভুর পরিচয় উদ্‌ঘাটন করার জন্য, তাঁকে সঠিকভাবে চেনার জন্য, মাথার ওপর অবস্থিত আকাশমন্ডলী ও পায়ের তলার নীচে এই পৃথিবী এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় জিনিষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। কেননা সৃষ্টিকর্তাকে চেনার পূর্বে তাঁর সৃষ্টিকে প্রথমে জানা প্রয়োজন। সৃষ্টির ভিতর দিয়েই অর্থাৎ স্রষ্টার কাজের ভিতর দিয়েই তাঁকে পরখ করতে সুবিধা বেশি।

এরপর ২ ঃ ১৬৪ আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে–মানব সম্প্রদায় তাদের এক ও একক প্রভুকে জানার জন্য, চেনার জন্য অসংখ্য নিদর্শন দেখতে পাবে, যেগুলো সৃষ্টিকর্তা তাঁর কাজের চিহ্নস্বরূপ নিজের থেকেই সংস্থাপন করেছেন। সমাজের জ্ঞানবানরা এই সকল চিহ্ন বা নিদর্শন দেখেই এক আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাসী হয়ে উঠে। তারা জীবনের বাঁকে বাঁকে সেই একক প্রভুর পরোক্ষ দর্শন লাভে নিজেদেরকে ধন্য করে তোলে। দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞানের জোয়ার ভাটায় তারা বিভ্রান্ত হয় না বা অন্ধকারে তলিয়ে যায় না। নিত্য-নতুন আবিষ্কারে কিংবা বিস্ময়কর কোন নতুন সংবাদে দিশেহারা না হয়ে তারা ঠান্ডা মাথায় বিশ্বপ্রভুর অবতীর্ণ পবিত্র বাণীসমূহ মন্থন করে এবং

জ্ঞানের চক্ষু উন্মিলিত করে বাস্তবতার আলোকে নির্দিষ্ট বিষয়ের খুঁটিনাটি থেকে শুরু করে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত গভীর মনোযোগের সাথে পর্যালোচনা করে থাকে। ফলে বিভ্রান্তি তাদের নিকটেও ঘেষঁতে পারে না, বরং নিত্য-নতুন আবিষ্কার যে ১৪০০ বৎসর পূর্বে অবতীর্ণ কুরআনের মহাসত্যতাকে স্বীকৃতি জানাচ্ছে তাই তারা দিব্যি দেখতে পায়। আল্লাহ্ তায়ালার দৃষ্টিতে এরাই সত্যিকার অর্থে 'জ্ঞানবান' মানবসমাজের মধ্যে। এদের জন্যই রয়েছে তাঁর পক্ষ থেকে বড় উপহার, বড় বিনিময়, বড় সাফল্য 'তাঁর সন্তুষ্টি'।

পরবর্তী ১০ঃ১৮ আয়াতে মানব সম্প্রদায়কে প্রশ্নাকারে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীপৃষ্ঠে দু'চারটি নগণ্য জিনিসের সন্ধান করে, আবিষ্কার করে কিংবা উদ্ঘাটন করেই মানুষেরা সকল প্রশংসা, সকল বাহ্বা নিয়ে নিতে চায় এবং এমন ভাব-সাব দেখায় মনে হয় যেন এই সম্পর্কে ঈমানদারদের 'আল্লাহ্' কোন খবরই রাখেন না। আসলেই কি ব্যাপারটা তাই? অবশ্যই নয়, বরং মহাবিশ্বের যেখানেই মানুষ যা কিছু আবিষ্কার, উদ্ঘাটন করে তা করে থাকে সমগ্র বিশ্বের একমাত্র প্রভুর নির্দেশেই। তিনিই এসকল জিনিসের স্রষ্টা, তিনি নিজ ইচ্ছাতেই সমগ্র বিশ্বলোক এবং এর ভিতরে-বাইরে যা কিছু আছে সবই একা সৃষ্টি করেছেন, এর পরিচালনা ও সার্বিক নিয়ন্ত্রণ একমাত্র তিনিই নিজ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেন। তাঁর কোন অংশীদার বা পরামর্শদাতা কিছুই নেই। এসবে তাঁর কোন প্রয়োজনও নেই। তিনি সর্বদিক থেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। সমগ্র মহাবিশ্ব এবং তার প্রতিটি ক্ষুদ্র বালুকণাও তাঁর জ্ঞানের সামনে বর্তমান, সবই তাঁর নখ-দর্পনে। কোন বিষয় তাঁর অজানা থাকবে–এ ধরণের অজ্ঞতা-অজ্ঞানতা থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র। এই কথাটি চিন্তা করাও চরম বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। কারন নগণ্য এই মানবসম্প্রদায় বর্তমানে যা আবিষ্কার করছে, অতীতে যা করেছে এবং ভবিষ্যতেও বিজ্ঞানের নামে যা কিছু আবিষ্কার করবে, তার সবটুকুন কৃতিত্ব, প্রশংসা এবং গুণগান কেবল 'এক আল্লাহ্‌র'-ই জন্য হবে। যেহেতু তিনি এগুলির সৃষ্টিকর্তা এবং বিজ্ঞানের প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বেই তিনি তাঁর সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ 'কুরআনে' মহাপ্রলয় ঘটে যাওয়া পর্যন্ত প্রায় সকল বিষয়ের প্রয়োজনীয় মৌলিক তথ্যসমূহ আগাম-ভবিষ্যতবাণী আকারে মানুষের জ্ঞানের সীমায় পৌঁছে দিয়েছেন, যার মধ্যে বর্তমান বিজ্ঞানের চুল-চেরা সুক্ষ্ম বিশ্লেষণেও সামান্যতম ভুল বা পরিবর্তন পাওয়া যাবে না। প্রতিটি বিষয়ের যখন যতটুকু আবিষ্কৃত হচ্ছে–তাও তাঁরই নিজস্ব পরিকল্পনাতেই হচ্ছে। নতুবা মানুষের হাতে যদি থাকতো–তাহলে সবকিছুই একসাথে পাওয়ার যে

আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে–তাতে কিন্তু সকল রহস্য একবারেই উন্মোচন করার প্রানান্তকর চেষ্টা-সাধণা করে বর্তমান ধারাবাহিক পদ্ধতিকে পুরোপুরি বানচাল করে দিত। বিশৃংখলায় সমগ্র জাহান অচল হয়ে পড়তো। ২৭ঃ২৫ আয়াতে বিষয়টিকে আরো দৃঢ় করা হয়েছে এই বলে যে, আকাশজগত এবং এই পৃথিবীর অর্থাৎ, এক কথায় গোটা মহাবিশ্বের এমন কোন বিষয় নেই, যা সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ্ তাঁর পরিকল্পনা তৈরী করেননি এবং 'লৌহে-মাহ্ফুজ' নামক আলোক সংরক্ষণ ব্যবস্থায় সেখানে লিপিবদ্ধ করেননি। সৃষ্টিমুহূর্ত থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যা কিছুই ঘটেছে, সবই লৌহ-মাহ্ফুজে সুরক্ষিত 'মাষ্টার প্ল্যান' অনুযায়ীই ঘটেছে। ৯৬ঃ৫ আয়াতে এসে একটি মৌলিক বিষয়ে বলা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে মানুষ এতই অসহায় যে সে মহাবিশ্ব তো দূরের কথা, তার বসবাসের পৃথিবী এবং দৃশ্যমান আকাশজগতের কোন কিছু সম্পর্কেও সঠিক জ্ঞান রাখতো না। আল্লাহ্ তায়ালা করুনা করে তাকে ইতোমধ্যেই দৃশ্য-অদৃশ্য বহুবিষয়ে সঠিক জ্ঞান সরবরাহ করেছেন যা গণনা করেও শেষ করা যাবে না।

৫৫ঃ৩৫ আয়াতটিতে পূর্বের আয়াতের সুত্র ধরে (আল্-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স সিরিজ-১-এ 'মহাকাশ অভিযানে' আলোচনা করেছি) বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের দৃষ্টির বাইরে খালি চোখে দেখা যায় না বা বুঝা যায় না এমন দূরত্বে মহাকাশে তাঁর অসংখ্য সৃষ্টির মাঝে একটি বিশেষ বিষয়ে এখানে বক্তব্য পেশ করেছেন বাস্তব নিদর্শন হিসেবে। অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তা হিসেবে তিনি ভালো করেই জানেন যে তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী এই মানব এবং জ্বীন-সম্প্রদায় এক সময় তাদের আবাসস্থল থেকে বৈজ্ঞানিক ক্রমোন্নতির মাধ্যমে মহাকাশে পাড়ি দেয়ার বা ভিন্ন আকাশরাজ্য পাড়ি জমাবার চেষ্টা করবে। তাই এই অবস্থা আসার প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বেই জানিয়ে দিলেন যে, যদি মানুষ এবং জ্বীন-সম্প্রদায় তাদের নিকটবর্তী সীমানা ছাড়িয়ে মহাকাশের দূর-দূরান্ত সফর করতে চায়, তাহলে তাদেরকে অবশ্যই প্রচন্ড-মহাক্ষমতা অর্জন করতে হবে। নতুবা বড় ধরণের বাধার সম্মূখীন হবে এবং মহাকাশ অভিযানে কখনই সফল হতে পারবে না। এই বাধাগুলো হচ্ছে- 'মধ্যাকর্ষণ' নামক যে শক্তি মানুষকে পৃথিবীপৃষ্ঠে আট্কিয়ে রেখেছে–সেই শক্তির আওতামুক্ত হতে পারবে না। আর মহাকাশে মাঝে মাঝে অগ্নিশিখা সম্বলিত গ্যাস, ধূলা-বালি, গলিত তাম্র ও অন্যান্য লৌহজাত এবং তেজষ্ক্রিয় পদার্থের মিশ্রিত উত্তপ্ত ধূঁয়া-মেঘপুঞ্জ আকারে কোটি-কোটি, মিলিয়ন মিলিয়ন মাইলব্যাপী ছড়িয়ে আছে। যার

ভেতর দিয়ে মহাক্ষমতাসম্পন্ন ব্যবস্থা ছাড়া অতিক্রম করা মোটেই সম্ভব হবে না, বরং জ্বলে-পুড়ে ছাঁই হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। সার্বিকভাবে 'মহাক্ষমতা' সম্পন্ন ব্যবস্থায় যদি মহাকাশে উত্তপ্ত অগ্নিময় ধূঁয়া-মেঘ পুঞ্জের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করা যায়, তাহলে ঐ ভয়ঙ্কর আগুণ ও উত্তপ্ত বিভিন্ন গলিত ধাতব পদার্থের মেঘপুঞ্জ ক্ষতি করার মত সুযোগ এবং সময় কোনটাই পাবে না; তাতে আরোহীসহ মহাকাশ যানটি রক্ষা পাবে এবং কাঙ্খিত লক্ষ্যে ছুটে যেতে পারবে। এই হলো আয়াতের মূল বক্তব্য। এই পরীক্ষাটি আমরা আমাদের নিজস্ব পরিবেশেও প্রমাণ করতে পারি। কোথাও খালি জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে ঐ আগুনের ভিতর দিয়ে যদি ধীরে-ধীরে হাতটি নিতে থাকি, তাহলে দেখা যাবে হাতের পশমসহ চামড়াও জ্বলে যাচ্ছে। অথচ ঐ হাতটি যদি দ্রুত গতিতে আগুণের ভিতর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাই–তাহলে একটি পশমও পুড়তে পারে না। কারণ এই অবস্থায় হাতের চামড়াতো দূরের কথা নগণ্য একটা পশম পুড়ার মত সময় এবং সুযোগ কোনটাই আগুণকে দেয়া হয়নি। আশাকরি বিষয়টি বোধগম্যের সীমানায় পৌঁছুতে পেরেছে।

ওপরে উল্লেখিত আয়াতটিতে বড় ধরণের বৈজ্ঞানিক তথ্য পেশ করার সাথে সাথে পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ আরো তথ্য মুক্তার মত বিছিয়ে গেছে। তাহলো যদিও আমাদের দৃষ্টিশক্তি খুবই সামান্য এবং আকাশের দিকে বেশিএকটা দূরত্ব পর্যন্ত কোন বস্তু চিহ্নিত করতে পারি না, আর সে কারণে মহাকাশের মাঝে যে অসংখ্য অদৃশ্য বস্তুসমূহ বিরাজ করছে, সে তথ্যও আমাদের অজানা থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু অন্ধাকারাচ্ছন্ন সেই অবিজ্ঞানযুগে 'কুরআনে'র মাধ্যমেই সর্বপ্রথম আমাদেরকে সে তথ্য অবহিত করা হয়েছে। ফলে মহাকাশের মহাসমুদ্রে সীমা-পরিসীমাহীন নীলিমায় অদৃশ্য বস্তুসম্ভার তালাশে মানুষের আগ্রহের বাহনে গতির সঞ্চার হয়েছে। মানুষ আজ সেই সুত্র ধরে দিগ-বিদিগ অভিযান চালিয়ে কত কি অজানা-অচেনা মহাকাশীয় বস্তুর সন্ধান লাভ করতে সমর্থ হয়েছে, তার পরিসংখ্যান নেয়াও বড় কঠিন হবে। আল্লাহ্ তায়ালা এই বিস্ময়কর অর্দৃশ্য মহাকাশীয় তথ্য পেশ করে সাথে সাথেই ৫৫ ঃ ৩৬ আয়াতে মানব মন্ডলীকে প্রশ্ন করেছেন এই বলে যে–"তোমরা তোমাদের প্রভুর এই নিদর্শনকে মিথ্যা মনে করিয়া কি অস্বীকার করিতে পার?" অর্থাৎ, পৃথিবীর মানবমন্ডলীকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বেই চ্যালেঞ্জ করে জানিয়ে দিয়েছেন যে–যদি মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে, অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ চালিয়ে মহাকাশের এই উত্তপ্ত ধূঁয়া ও

গলিত ধাতব মেঘপুঞ্জের স্তর সম্পর্কিয় আগাম ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারলে, তাই যেন করে দেখায় ! আর যদি বর্ণিত অগ্নিশিখা ও গলিত ধাতব পদার্থের ধূঁয়া-মেঘ পুঞ্জের অস্তিত্ব বর্ণনানুযায়ী পেয়ে যায়, তাহলে অবশ্যই এক আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব নিজ থেকেই স্বাভাবিকভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যাবে এবং সমগ্র মানবমন্ডলী তাঁর একচ্ছত্র গোলামী কার্যকরভাবে মেনে নিতে বাধ্য থাকবে।

তারপর ১০:৬৪ আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা ঘোষণা করে দিলেন যে–তাঁর পবিত্র এই ঐশীবাণীর মধ্যে কখনই কোন পরিবর্তন পাওয়া যাবে না, যা বলা হয়েছে–হুবহু তা-ই পাওয়া যাবে। চুল পরিমাণও এদিক-ওদিক হবে না, হতে পারে না। কেননা একমাত্র তিনিই সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং এই সম্পর্কে তথ্য সরবরাহকারীও মহান 'সত্ত্বা' তিনি নিজেই। তাই যে কোন অবস্থাতেই, যে কোন পরিস্থিতিতেই তাঁর পবিত্র মহাবাণী একই, অপরিবর্তনীয়, অলংঘনীয় এবং সর্বপ্রকার ত্রুটিমুক্ত, চিরন্তন, শ্বাশত ও কালজয়ী। যত প্রকারের চেষ্টা-প্রচেষ্টা, উদ্যোগ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা-ই চালানে হোক না কেন, সকল অবস্থায় ফলাফল একই দিকে প্রবাহিত হবে। আর তা হলো–'আল্লাহ্‌র বাণীর কোন পরিবর্তন নেই', সকল অবস্থায়, সকল পরিবেশে এক ও অভিন্ন। যা বিশ্বাসীদের জন্য অবশ্যই মহাসাফল্যের প্রতীক।

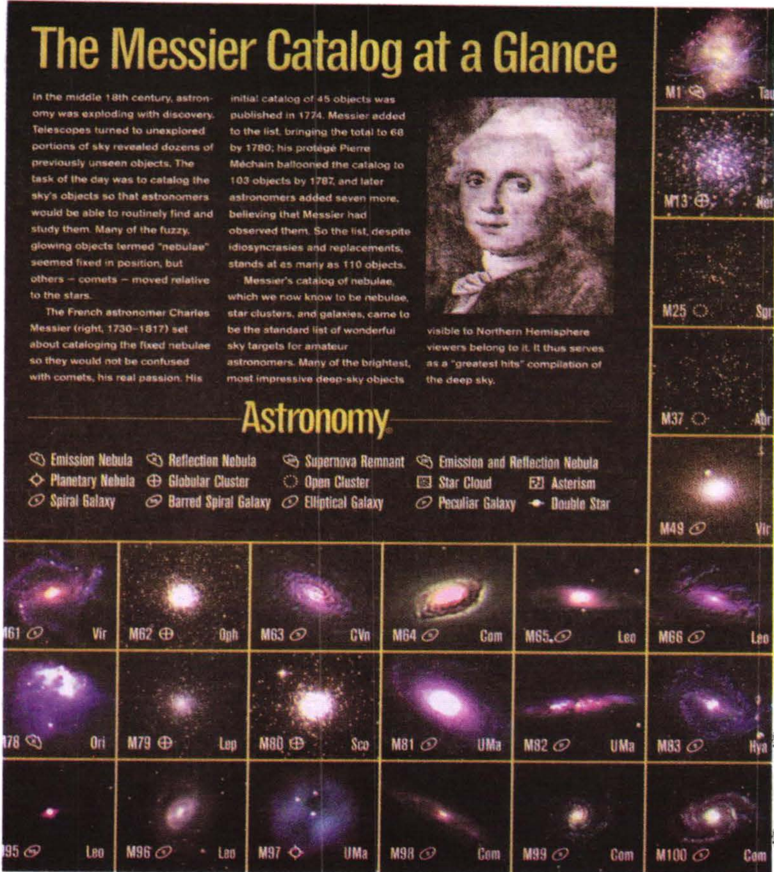
৪০ ঃ ৮১ আয়াতে প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে পূনর্বার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এই বলে যে, এই একটি নয় বরং এই রকম অসংখ্য নিদর্শনে পবিত্র কুরআনের সোনালী পাতা ভরপুর হয়ে রয়েছে। এর কোন একটিকেও কি মিথ্যা প্রমাণ করে মানুষ অস্বীকার করার যোগ্যতা রাখে? আছে এমন কোন প্রমাণ? তাহলে মানুষের কেন এই মিথ্যা অহংকার? কেন সত্যকে মেনে নিতে মানুষ অনীহা প্রকাশ করছে? ১৫:৭৫ আয়াতে তাই বলা হয়েছে–পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন জ্ঞানীসমাজের জন্য উল্লেখিত বিষয়সমূহে আল্লাহ্‌র মহান সত্ত্বাকে উপলব্ধি করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। এই প্রেক্ষাপটে ১০:১ আয়াতটি এগিয়ে এসে ঘোষণা করছে–এই নিদর্শনগুলো শুধু এক আল্লাহ্‌র পরিচয়ই কেবল বহন করছে না, সাথে সাথে কুরআন যে আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ সে কথারও প্রতিষ্ঠা দিয়ে যাচ্ছে। ৪০:২ আয়াত এসে পূর্বের ১০:১ আয়াতের সাক্ষ্যরূপে জবান বন্দী পেশ করছে যে, আল্-কুরআন সত্যি-সত্যি মহাপরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ সত্যগ্রন্থ। এতে কোনই সন্দেহ নেই। এই অবস্থায়

১৪ঃ১০ আয়াতটি জ্ঞানবান সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এই বলে যে এরপরও কি মানুষের আল্লাহ্ সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকতে পারে যে, তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা কি-না? তিনি যদি সৃষ্টিকর্তা না হবেন, তাহলে অদৃশ্যের জ্ঞান কে তাঁকে সরবরাহ্ করলো? কে-ই বা এগুলো সৃষ্টি করলো? তিনি ছাড়া আর কেউ কি আছেন, যিনি এমন ক্ষমতা, শক্তি ও যোগ্যতা রাখেন? থেকে থাকলে কে তিনি? কেন তিনি কোন নিদর্শন পেশ করেন না? যে নিদর্শন দেখে মানুষ তাকে যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ করার সুযোগ পেত ! ১৮ঃ২৯ আয়াতে এসে এ ব্যাপারে সমাপ্তি রেখা টানা হয়েছে এই বলে, সত্য কেবলমাত্র তো বিশ্বপ্রভুর নিকট থেকেই আগত, এর দ্বিতীয় আর কোন সঠিক উৎস নেই, হতে পারে না। যেহেতু আল্লাহ্ এক ও একক, তাই তার উৎস–একটি মাত্র। এই পরিপ্রেক্ষিতে ফুটন্ত লাল গোলাপের মত হাজারো-লক্ষ নিদর্শনে উদ্ভাসিত এই জগত যেখানে এক আল্লাহ্র মহিমার গুণগান করছে, সেখানে বাড়তি কথা বলার আর প্রয়োজন কোথায়? এখন এই সকল নিদর্শন হাতে-কলমে প্রমাণ পাওয়ার পরও যার ইচ্ছা এক আল্লাহ্কে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে তাঁর গোলামী কবুল করতে পারে; আবার যার ইচ্ছা অহংকার করে মহাসত্যের বিপরীতে শুধু কাল্পনিক মিথ্যাকে আশ্রয় করে প্রত্যাখ্যানও করতে পারে! এই অধিকার সবাইকে দেয়া হয়েছে। তবে নিজ নিজ সিদ্ধান্তের ফলে–পরিণতি ভোগ করতে সবাই বাধ্য থাকবে; এতে কোনই সন্দেহ নেই। একথা সত্য যে এমন জ্ঞানগর্ভ, বিজ্ঞানময়, উজ্জল নিদর্শন লাভ করার পরও একমাত্র তারাই সত্যকে অস্বীকার করতে পারে–যাদের শ্রুতি অকেজো হয়ে গেছে এবং দৃষ্টির ওপর আবরণ পড়ে গেছে, ফলে তারা না শুনতে পায় আর না দেখতে পায়, যে কারণে তারা চরম শাস্তির যোগ্য হয়ে পড়েছে। ২ ঃ ৭ আয়াতটি সবশেষে সে কথাই ছড়িয়ে যাচ্ছে।

এবার কুরআনিক আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নিয়ে যেতে চাই যেন উভয় বক্তব্যকে পরখ করে নিতে পারি।

বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের ভাষায় আগুণের শিখা, ধূলা-বালি, গ্যাস এবং বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের ধাতব মিশ্রনের ধূঁয়া বা মেঘপুঞ্জকে 'নেবুলা' (Nebulae) বলা হয়। এই নেবুলা হচ্ছে মহাবিশ্ব সৃষ্টির কাঁচামাল। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী 'Mr. Messier'-এই নেবুলা সম্পর্কে ক্যাটালগ্ (Catalogue) তৈরী করেন।



The Messier Catalog at a Glance

In the middle 18th century, astronomy was exploding with discovery. Telescopes turned to unexplored portions of sky revealed dozens of previously unseen objects. The task of the day was to catalog the sky's objects so that astronomers would be able to routinely find and study them. Many of the fuzzy, glowing objects termed "nebulae" seemed fixed in position, but others – comets – moved relative to the stars.

The French astronomer Charles Messier (right, 1730–1817) set about cataloging the fixed nebulae so they would not be confused with comets, his real passion. His initial catalog of 45 objects was published in 1774. Messier added to the list, bringing the total to 68 by 1780; his protégé Pierre Méchain ballooned the catalog to 103 objects by 1787, and later astronomers added seven more, believing that Messier had observed them. So the list, despite idiosyncrasies and replacements, stands at as many as 110 objects.

Messier's catalog of nebulae, which we now know to be nebulae, star clusters, and galaxies, came to be the standard list of wonderful sky targets for amateur astronomers. Many of the brightest, most impressive deep-sky objects visible to Northern Hemisphere viewers belong to it. It thus serves as a "greatest hits" compilation of the deep sky.

Astronomy

Emission Nebula, Reflection Nebula, Supernova Remnant, Emission and Reflection Nebula, Planetary Nebula, Globular Cluster, Open Cluster, Star Cloud, Asterism, Spiral Galaxy, Barred Spiral Galaxy, Elliptical Galaxy, Peculiar Galaxy, Double Star

চিত্রঃ ৩

"আমি উহাদিগের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করিব বিশ্ব-জগতে এবং উহাদিগের নিজেদের মধ্যে; ফলে উহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ে অবহিত!" (৪১ ঃ ৫৩)

- ১৮ শতকের মাঝামাঝি মহাকাশ বিজ্ঞান হঠাৎ করেই অনেক দূরে এগিয়ে যায়। ফ্রান্সের আকাশ বিজ্ঞানী 'চার্লস মেসিয়ার' (Charles Messier) সর্বপ্রথম প্রায় ১১০টি মহাকাশীয় বস্তুর তালিকা (Catalog) তৈরি করেন, যাদের অধিকাংশই ছিল নেবুলা।

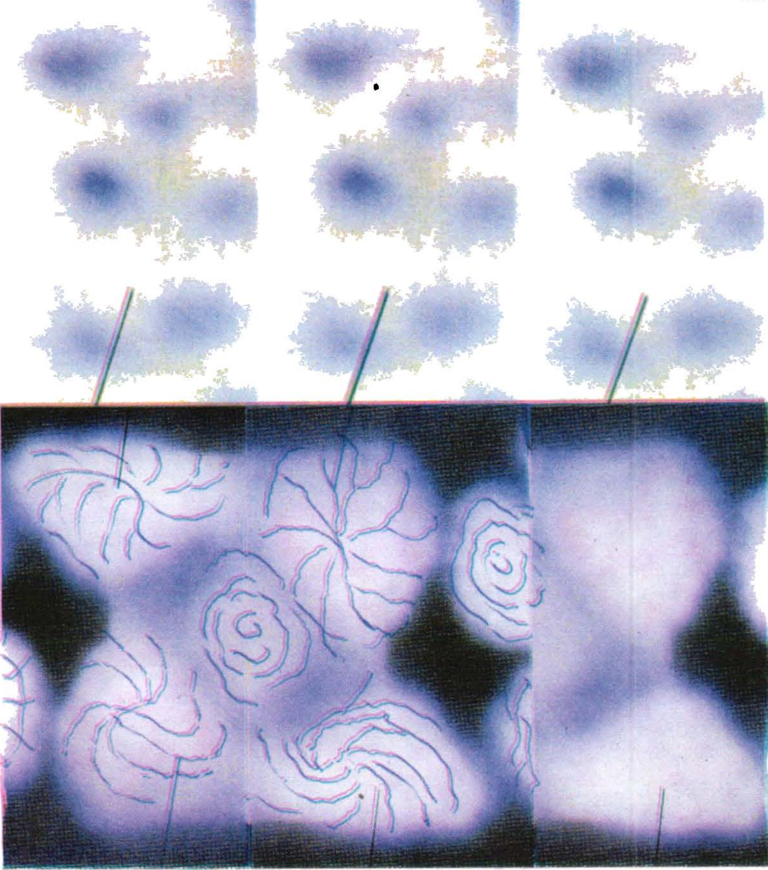
করেন। তিনি এতে দেখান যে, এই মহাকাশীয় নেবুলা প্রধানতঃ দুই ধরণের। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী 'William Herschel' সহ অনেকেই এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করে স্বীকৃতি দেন। অত:পর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ইংলিশ এ্যাস্ট্রোনোমিক্যাল এ্যাস্পেক্ট্রোস্কোপিষ্ট (Astronomichal Spectroscopist) 'Sir William Huggins' তা প্রমাণ করে এর সত্যতা বিধান করেন। এই দুই প্রকার নেবুলার মধ্যে এক প্রকার হচ্ছে–শুধুমাত্র হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম গ্যাসের ধূঁয়া-মেঘপুঞ্জ (Nebulae) যার সাথে অন্য কিছু তেমন থাকে না। এরাই হচ্ছে সৃষ্টির শুরুতে প্রকৃত নেবুলা (Nebulae)। এই প্রকার নেবুলা তুলনামূলকভাবে শীতল হয়ে থাকে। মেঘপুঞ্জের ভিতরকার নক্ষত্র কিংবা আশেপাশের নক্ষত্রের আলোর কারণে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি এই মেঘপুঞ্জকে (নেবুলা) উজ্জল এবং আলোকময় করে রাখে। প্রকৃতপক্ষে এই নেবুলাগুলো 'Big Bang' Model-এ মহাবিশ্ব প্রথম সৃষ্টি হওয়ার পর্যায়কালের সর্বশেষ পর্যায়ে যখন হাইড্রোজেন 'নিউক্লি'-ইলেকট্রন ধারণ করে 'অটলপদার্থ' (Stable atoms) গঠন করতে শুরু করে এবং রেডিয়েশান (Radiation) পদার্থ থেকে পৃথক হয়ে যায়, তখনই সৃষ্ট পদার্থ কণা ধূঁয়ার মেঘ আকারে সমগ্র নবীন মহাবিশ্বকে পরিপূর্ণ করে ফেলে। পরবর্তীতে সময়ের বিবর্তনে এক পর্যায়ে ঐ ধূয়ার কণা-মেঘপুঞ্জের ভেতর মাঝে মাঝে একপ্রকার সুক্ষ্ম 'মহাজাগতিক তার' (Cosmic String) আবির্ভূত হয়ে যখন মহাকর্ষবলের (Gravitation) মাধ্যমে প্রবল আকর্ষণ শক্তি সৃষ্টি করে সৃষ্ট পদার্থ কনাকে নিজেদের সাথে ব্যাপকভাবে জড়িয়ে নিতে থাকে, তখন 'মহাজাগতিক তারকে' কেন্দ্র করে সমগ্র মহাবিশ্ব জুড়ে ধূয়ার-মেঘপুঞ্জের বিরাট বিরাট অসংখ্য স্তর বা গুচ্ছ জন্ম নেয়। পরবর্তী সময়ে এই স্তর বা গুচ্ছগুলিই নেবুলা (Nebulae) নামে পরিচিত হয়। সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় এই জাতীয় নেবুলা থেকেই বিবর্তনের ধারায় পরবর্তীতে জন্ম নেয়- নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহানু, ধূমকেতু, কোয়াসার ইত্যাদি। প্রতিটি নেবুলা থেকে প্রায় গড়ে ২০,০০০ কোটি নক্ষত্র এবং তাদের সৌরজগত সৃষ্টি হওয়ার পরও একটা বিরাট অংশ মেঘপুঞ্জ অবশিষ্ট থেকে যায়। এই জাতীয় এক একটি নেবুলা প্রায় কয়েকলক্ষ আলোকবর্ষ পর্যন্ত স্থান জুড়ে মহাকাশে ছড়িয়ে অবস্থান করতে থাকে। আমাদের এই মহাবিশ্বে এ ধরণের নেবুলা বিলিয়ন-বিলিয়ন হিসাবে বিরাজ করছে।



চিত্রঃ ৪

"অবিশ্বাসীরা কি লক্ষ্য করে না যে, আকাশমন্ডল ও পৃথিবী পরস্পর সংযুক্ত ছিল, পরে আমি উহাদিগের পৃথক করিয়া দিয়েছি এবং প্রতিটি জীবন্ত জিনিসকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি পানি হইতে। উহার পরও কি তাহারা বিশ্বাস করিবে না? (২১ ঃ ৩০)

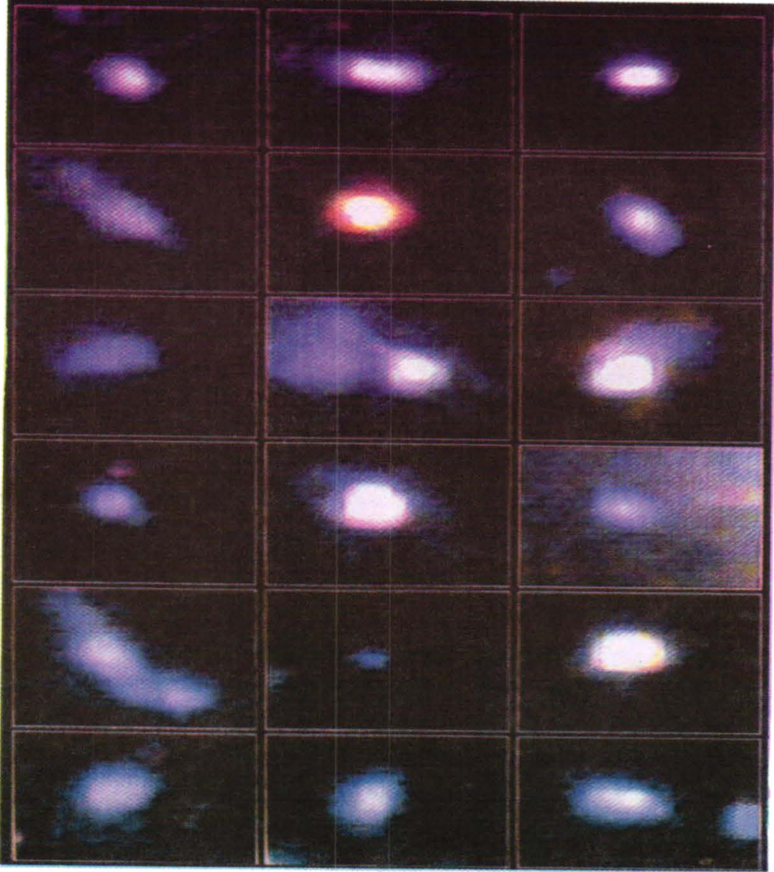
- আমাদের এই মহাবিশ্বের যাত্রা শুরু হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ১৫০০ কোটি বৎসর পূর্বে প্রচন্ড ঘনায়নকৃত এক মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে Big Bang নামক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে।



চিত্রঃ ৫

"অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন, যাহা ছিল ধুম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি উহাকে ও পৃথিবীকে বলিলেন, তোমরা উভয়ে আস- ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। উহারা বলিল, আমরা আসিলাম অনুগত হইয়া।" (৪১ : ১১)

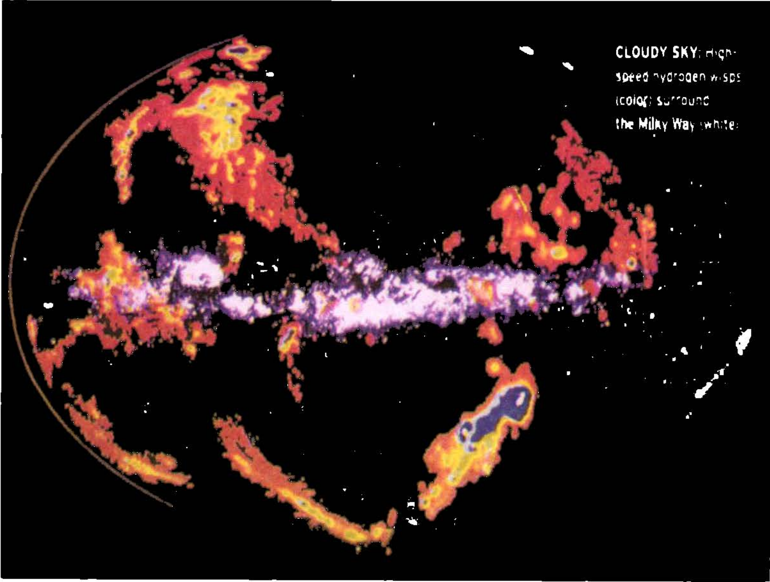
- বিগ-ব্যাংগ বিন্দু হতে পর্যায়ক্রমে ৪টি ধাপ অতিক্রম করার পর 'শক্তি' পদার্থ কণার ধূঁয়ার অস্তিত্ব লাভ করে এবং মধ্যাকর্ষনের প্রভাবে গুচ্ছ গুচ্ছভাবে বিভক্ত হয়ে নবীন মহাবিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে, যা পরবর্তীতে 'নেবুলা' নামে পরিচিতি লাভ করে।



চিত্রঃ ৬

"উহারা কি উহাদিগকে উর্ধ্বস্থিত আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখে না, আমি কিভাবে উহা নির্মাণ করিয়াছি ও উহাকে সুশোভিত করিয়াছি এবং উহাতে কোন ফাটলও নাই?" (৫০ ঃ ৬)

- ছবিতে দৃশ্যমান আদি 'নেবুলা' এর মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ, তারপরও সর্বত্র একত্রে থেকে গেছে নেবুলার বহুলাংশ। ঐ অবশিষ্ট নেবুলা এবং নক্ষত্রপুঞ্জকে বর্তমানে 'গ্যালাক্সী' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।



চিত্রঃ ৭

"তোমরা তোমাদের প্রভুর এই নিদর্শনমূলক (বিজ্ঞানসম্মত) বাণীকে মিথ্যা মনে করিয়া কি অস্বীকার করিতে পার?" (৫৫ ঃ ৩৬)

- আমাদের মাতৃ-গ্যালাক্সী 'মিলকিওয়ে' (Milky Way)-র মধ্যে এখনও উদ্বৃত্ত হাইড্রোজেন পদার্থ কনার ধুঁয়া মেঘপুঞ্জ ব্যাপকভাবে প্রায় লক্ষাধিক আলোকবর্ষ ব্যাস সম্পন্ন স্থান জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে।



চিত্রঃ ৮

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে নিদর্শন রহিয়াছে বিশ্বাসীদিগের জন্যে।" (৪৫ ঃ ৩)

- প্রতিদিন রাতের বেলায় আমাদের মাথার উপর দিয়ে 'Orion nebula' অতিক্রম করে যাচ্ছে এবং মহাকাশের বিরাট একটা অংশ প্রায় হাজার-হাজার আলোকবর্ষব্যাপী যে দখল করে আছে তাও আমাদের জানিয়ে যাচ্ছে।



চিত্রঃ ৯

"অবিশ্বাসীরাই আল্লাহর নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক করে।" (৪০ ঃ ৪)

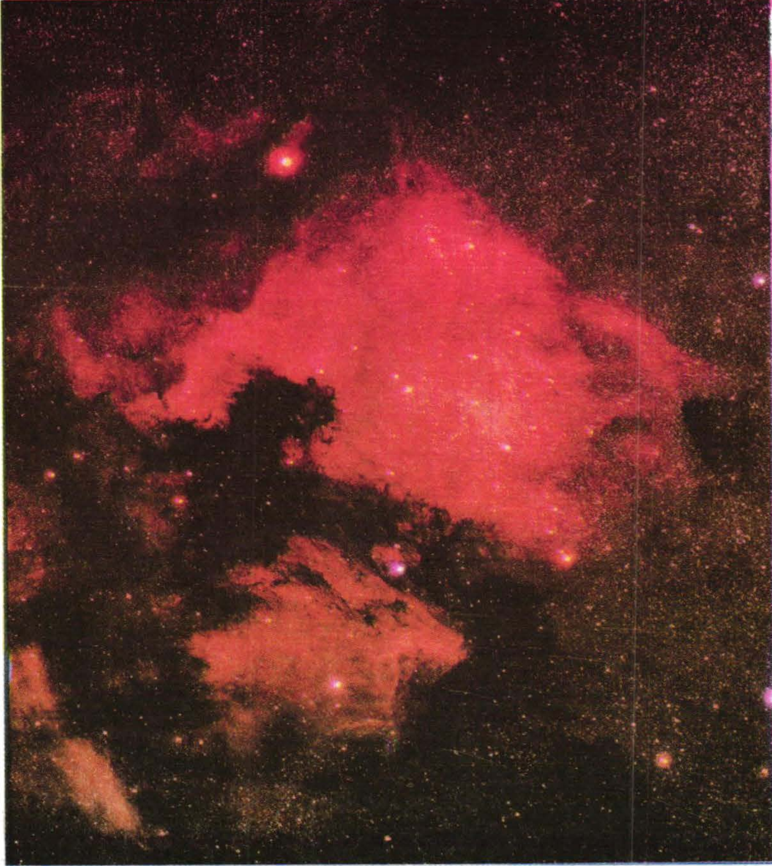
- মহাকাশে শত শত কোটি মাইলব্যাপী ছড়িয়ে আছে 'লাগুন নেবুলা' (Lagoon Nebula) যা অতিক্রম করার ক্ষমতা মানব সমাজ এখনও লাভ করতে পারেনি।



চিত্রঃ ১০

"তিনিই তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনাবলী দেখান।" (৪০ ঃ ১৩)

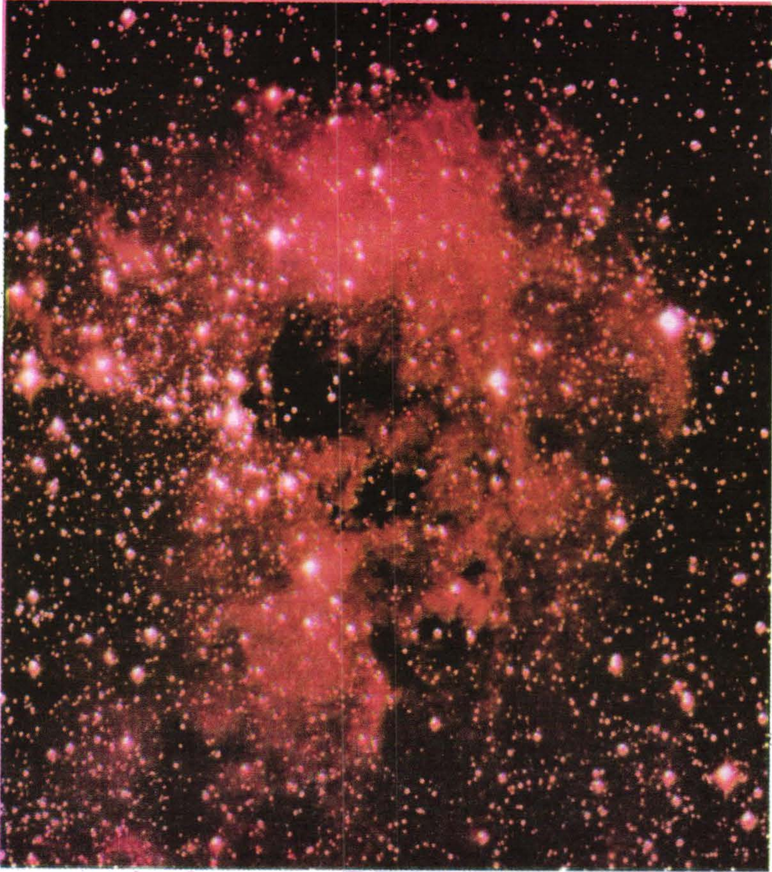
- সোয়ান (Swan) বা ওমেগা (Omega) নেবুলাও আমাদের নিকটবর্তী এক বিরাট ধূঁয়া-মেঘপুঞ্জ যা পাড়ি দেয়া মানব সমাজের এখনও অজানা রয়ে গেছে।



চিত্রঃ ১১

"তিনিই তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনাবলী দেখাইয়া থাকেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন্ কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করিবে?" (৪০ ঃ ৮১)

- নর্থ এ্যামেরিকা (North America) নেবুলাও হাজার হাজার আলোকবর্ষব্যাপী মহাশূন্যে ছড়িয়ে থাকা নেবুলা। যা পাড়ি দেয়ার কথা মানুষ এখনো ভাবতে পারছেনা। মহাক্ষমতা অর্জন ব্যতিরেকে তা সম্ভব হবে না।



চিত্রঃ ১২

"যাহারা নিজগিদের নিকট কোন প্রমান না থাকিলেও আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, উহাদিগের অন্তরে আছে অহংকার, যাহা সফল হইবার নহে। অতএব আল্লাহর শরণাপন্ন হও, তিনিতো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (৪০ ঃ ৫৬)

- M-20 নেবুলা, ব্যাপক বিস্তৃতি নিয়ে ছড়িয়ে আছে মহাশূন্যে মানব দৃষ্টির অন্তরালে আরও অসংখ্য নেবুলা বা পদার্থ কণার ধুঁয়া-মেঘপুঞ্জের সাথে।



চিত্রঃ ১৩

"তুমি কি লক্ষ্য কর না উহাদিগকে যাহারা আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক করে, কিভাবে উহাদিগকে বিপথগামী করা হইতেছে?" (৪০ ঃ ৬৯)

- M-17 নেবুলা বা ধূঁয়া-মেঘপুঞ্জ ও শত শত আলোকবর্ষব্যাপী ছড়িয়ে আছে মহাকাশে। মহাক্ষমতা অর্জন ছাড়া তা পাড়ি দেয়া সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ব্যাপার।



চিত্রঃ ১৪

"কেহ আল্লাহর নিদর্শন প্রত্যাখান করিলে আল্লাহ্ হিসেব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।"
(৩ ঃ ১৯)

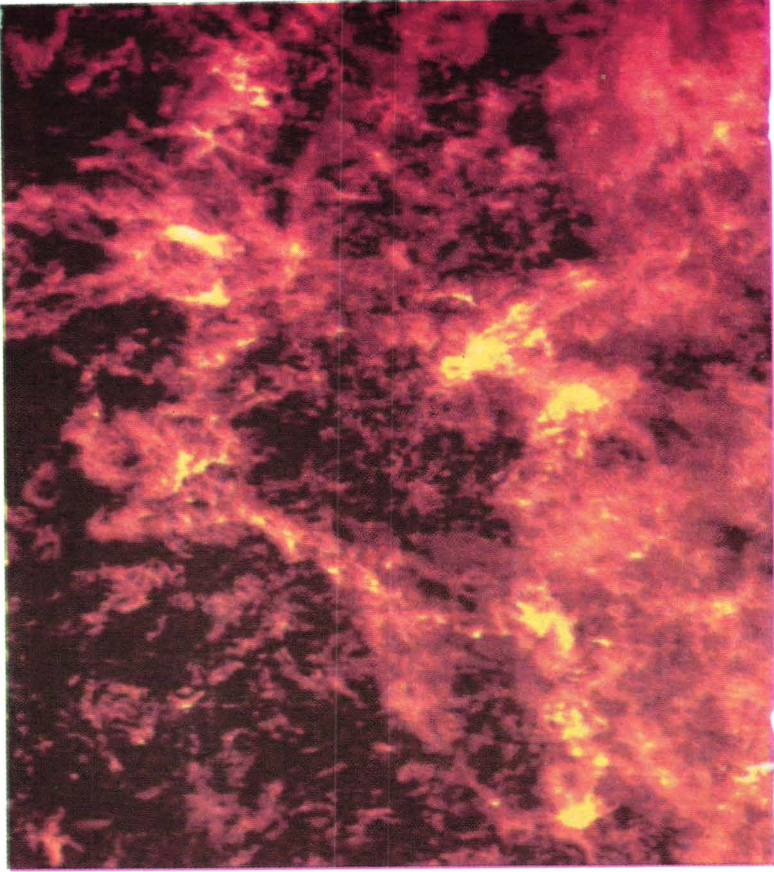
- 'রোসেট নেবুলা' (Rosette Nebula) হাজার হাজার আলোকবর্ষ জায়গা নিয়ে মহাশূন্যে বিস্তৃত। সাদা সাদা চিহ্ন গুলো হচ্ছে নক্ষত্র। বিজ্ঞান হালে এই বিস্ময়কর নেবুলা আবিষ্কারে সক্ষম হলেও কুরআন কিন্তু তা আমাদের অবহিত করেছে প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে 'কুরআনের' সত্যতা প্রমাণের জন্য এতটুকুন যথেষ্ট নয় কি?



চিত্রঃ ১৫

"তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদিগের নিকট স্পষ্ট প্রমান অবশ্যই আসিয়াছে।" (৬ ঃ ১০৪)

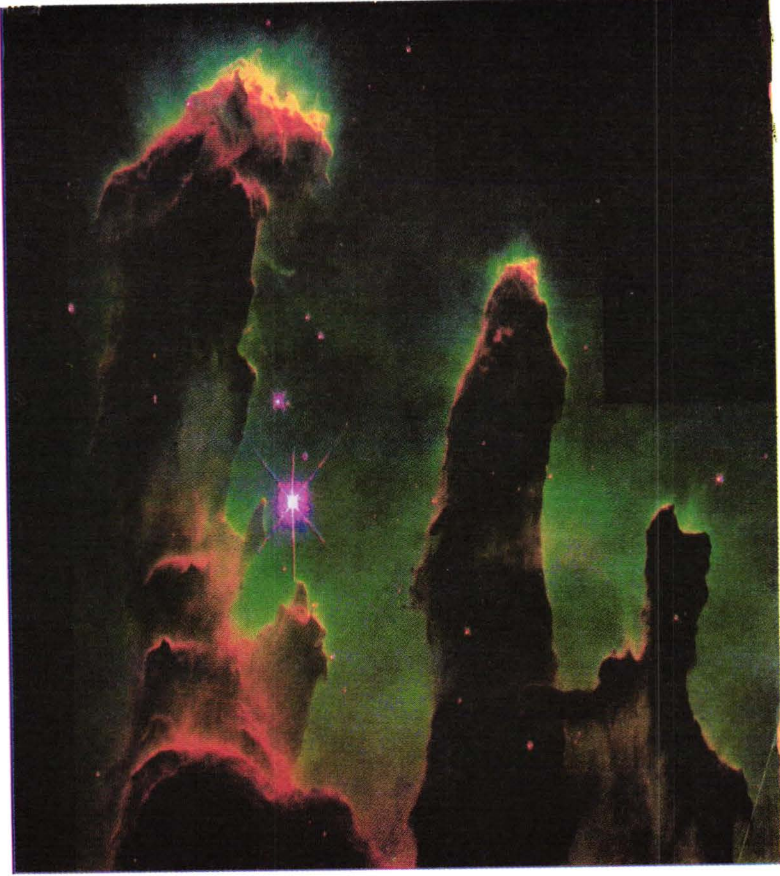
- 'কি হোল নেবুলা' (Keyhole Nebula) পৃথিবী থেকে মাত্র ৮০০০ আলোকবর্ষ দূরে দক্ষিনাঞ্চলীয় আকাশে প্রায় ২০০ আলোকবর্ষ স্থান জুড়ে ছড়িয়ে আছে। ধূলা-বালি ও উত্তপ্ত গ্যাস এবং ডার্ক ক্লাউড (dark cloud) এর মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। বর্তমান বিজ্ঞান তা অতিক্রম করার ক্ষমতা রাখে না বিধায় এর মধ্যে প্রবেশ করলে ধ্বংস অনিবার্য।



চিত্রঃ ১৬

"আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রহিয়াছে; তাহারা এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করে কিন্তু তাহারা এই সকলের প্রতি উদাসীন।" (১২ ঃ ১০৫)

আকাশ শান্ত নয়, বরং ভয়ংকর স্থান। আমাদের গ্যালাক্সীসহ সর্বত্র ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ও কার্বন মনক্সাইড সম্পন্ন নেবুলা। যা মহাকাশ অভিযানে বড় ধরনের বাধা হয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে। বর্তমান প্রযুক্তি এখনও এক্ষেত্রে বড় অসহায়।



চিত্রঃ ১৭

"আমি তো সুস্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করিয়াছি। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।" (২৪ ঃ ৪৬)

মহাবিশ্বের মহাকাশ ছেয়ে আছে বিশাল বিশাল ধূলা-বালি ও পদার্থ কণার ধুঁয়াপুঞ্জ দিয়ে। যার ভিতর দিয়ে অভিযান চালিয়ে সফল হওযার কথা মানুষ এখনো ভাবতে পারে না। 'ঈগল' নেবুলাও তাঁর মধ্যে একটি যা ছবিতে প্রদর্শিত হয়েছে।



চিত্রঃ ১৮

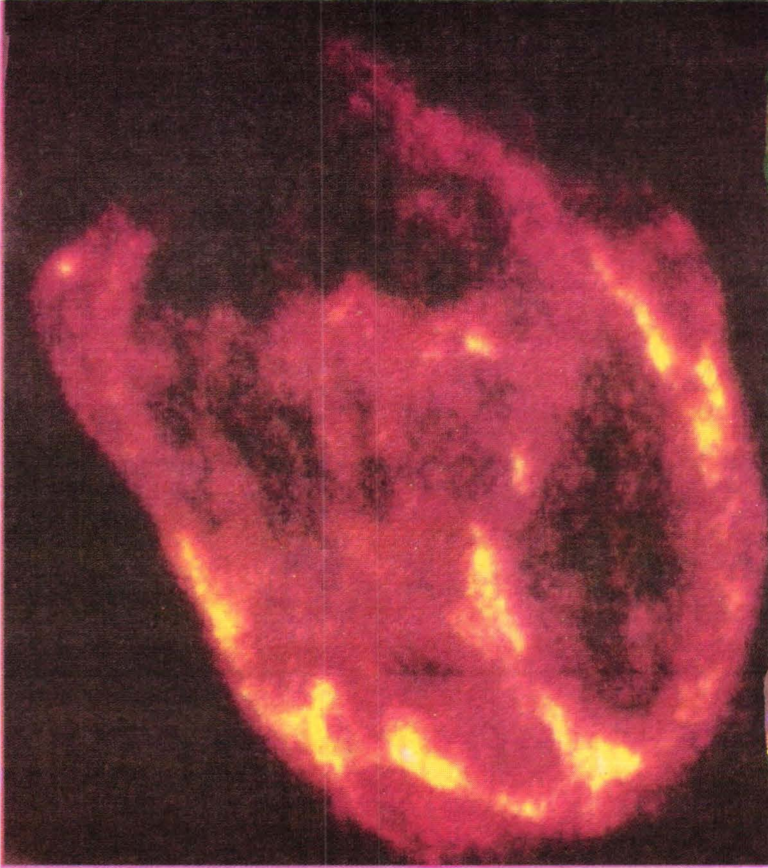
"বল, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহার প্রতি লক্ষ্য কর। নিদর্শনাবলী ও ভীতি প্রদর্শন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপকারে আসে না।"

(১০ ঃ ১০১)

ছবিতে অসংখ্য গ্যালাক্সী দেখা যাচ্ছে। প্রতিটি গ্যালাক্সীতে গড়ে প্রায় ২০,০০০ কোটি নক্ষত্র এবং অগনিত নেবুলা বিদ্যমান। ফলে আন্তঃ মহাকাশ অভিযান এক দুঃস্বাধ্য ও ভয়ংকর ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে।

এই জাতীয় নেবুলার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে- M42, Orion's Nebulae, Lagoon Nebulae, North America Nebulae, Tarantula Nebulae, Large cloud of Magellan, Horse head Nebulae, Caiifornia Nebulae, Crescent nebulae ইত্যাদি।

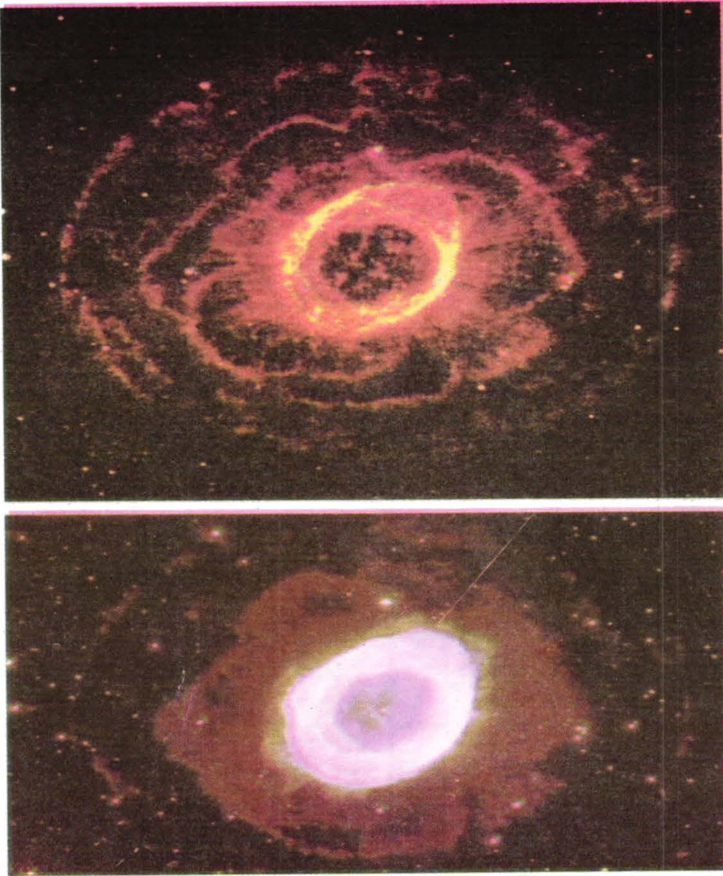
দ্বিতীয় প্রকার নেবুলা সম্পর্কে বিজ্ঞান জানাচ্ছে যে, এরা হচ্ছে 'প্লেনেটারি নেবুলা' (Planetery nebulae), প্রকৃতপক্ষে পুরাতন এবং প্রচন্ড বেগে আবর্তনশীল নক্ষত্রের ধ্বংশবাশেষ হচ্ছে এই জাতীয় নেবুলার অন্তর্ভূক্ত। ছোট বা মাঝারি ধরণের নক্ষত্রের চাইতে বড় বড়-বৃহৎ নক্ষত্র সমূহের (Super nova) 'সুপার নোভা' বিস্ফারণের মাধ্যমে নক্ষত্রগুলো তাদের ভিতরকার বস্তুসম্ভার যা প্রচন্ড উত্তপ্ত গ্যাসীয় অবস্থা ধারণকৃত, তা বাইরের দিকে (Outer Space) নিক্ষেপ করে। ধ্বংসপ্রাপ্ত নক্ষত্রের কেন্দ্র থেকে অনবরত X-ray, এবং Ultra-violet radiation নির্গত হওয়ার কারণে নেবুলার স্তরটি বিকীরণের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে উজ্জলতা ছড়িয়ে থাকে। তখন সারফেস্ (Surface) তাপমাত্রা প্রায় ৪০০,০০০ ^{o}c (চার লক্ষ ডিগ্রি) পর্যন্ত উঠে যায়। নক্ষত্র ধ্বংস হওয়ার পূর্বমুহূর্তে নক্ষত্রাকারে (core) সৃষ্টি হওয়া বিভিন্ন মৌল যেমন–লৌহ, তামা, ব্রঞ্জ, ম্যাগনেসিয়াম, কার্বন, ইউরেনিয়াম, পটাশিয়াম, ফস্ফরাস ইত্যাদি গলিত অবস্থায় ধূঁয়ার মেঘপুঞ্জের সাথে মিশ্রিত থাকে বলে এই জাতীয় নেবুলা সত্যিই বড় ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে। এই নেবুলা সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে মিলিয়ন-মিলিয়ন বছর পর্যন্ত বর্ধিত হয়ে চলে এবং মহাকাশে এরাও কয়েক মিলিয়ন মাইলব্যাপী ছড়িয়ে থাকে। বিজ্ঞান বর্তমান রকেট প্রযুক্তি দিয়ে এই নেবুলার একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত শত চেষ্টা করেও পৌঁছতে পারবে না এবং প্রচন্ড উত্তপ্ততার কারণে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এ বিষয়গুলো চিরদিনই মহাকাশের মহাবিস্ময়ের অন্তর্ভূক্ত। বর্তমান বিজ্ঞানীগণ একবিংশ শতাব্দীতে এই জাতীয় নেবুলাকে ডিঙিয়ে মহাকাশ পাড়ি দেয়ার জন্য অকল্পনীয় ক্ষমতার অধিকারী আলোর গতিসম্পন্ন বা তার কাছাকাছি গতিসম্পন্ন আকাশযান পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নে ইতোমধ্যেই উদ্যোগ গ্রহণ করে কাজ শুরু করেছেন। এই প্রকল্প সফল হলে মহাকাশ বিজয়ে মানুষ অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবে নিঃসন্দেহে। তবে নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে, গ্যালাক্সী থেকে গ্যালাক্সীতে ভ্রমণে এই আলোর গতি সম্পন্ন আকাশযানও পরিত্যাক্ত



চিত্রঃ ১৯

"আল্লাহ্ তায়ালা সঠিক প্রমাণকে স্বীয় অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন, যদিও পাপাচারীরা অপ্রীতিকর বোধ করে।" (১০ ঃ ৮২)

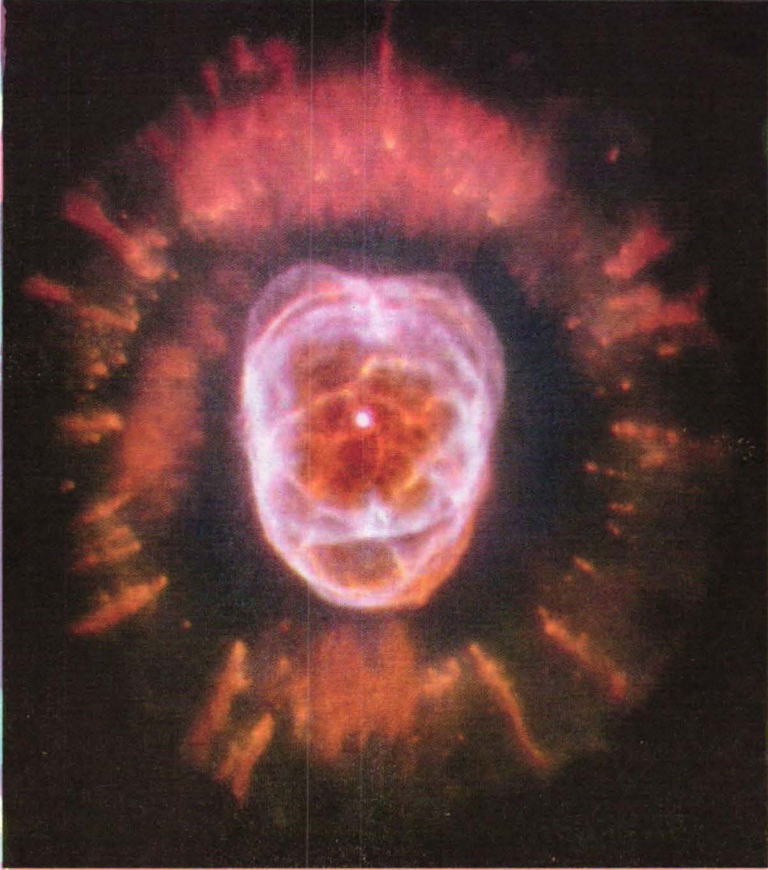
- প্রতিটি গ্যালাক্সীতেই প্রতিনিয়ত নক্ষত্র ধ্বংস হচ্ছে। ফলে শত শত আলোকবর্ষব্যাপী বিস্তৃত হচ্ছে আগুনের লেলিহান, উত্তপ্ত ধূলা-বালি ও বিভিন্ন পদার্থের মিশ্রন ও গ্যাস, যা প্রায় ১০ মিলিয়ন ডিগ্রি তাপমাত্রা সম্পন্ন হয়ে থাকে, ছবিতে একটি নক্ষত্রের ধ্বংস মূহুর্ত ধারন করা হয়েছে।



চিত্রঃ ২০

"আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন রহস্য নাই, যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নাই।" (২৭ ঃ ৭৫)

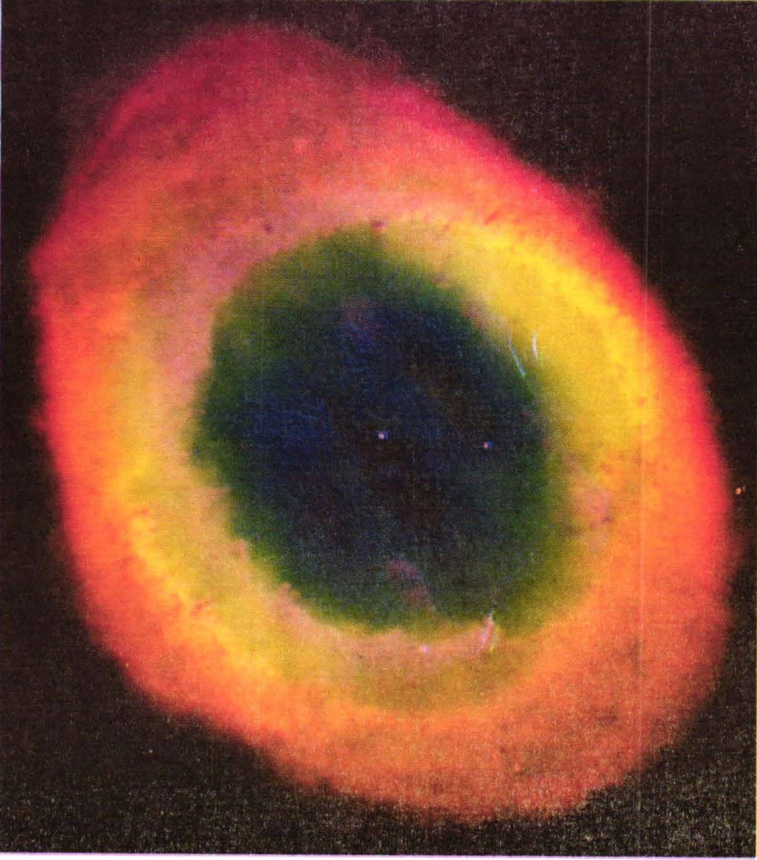
- 'রিং নেবুলা' (Ring Nebula) 'নক্ষত্র' ধ্বংস পরবর্তী অবস্থা, যা মহাকাশে অসংখ্যরূপে সৃষ্টি হয়ে আছে। উত্তপ্ত ধূলা-বালি ও অগ্নি এবং গ্যাস প্রায় ১০,০০০ মাইল/সেকেন্ড গতিতে চতুর্দিকে ছড়িয়ে যেতে থাকে মিলিয়ন বছর ধরে। বর্তমান বিজ্ঞান এখনও এ জাতিয় নেবুলা বিজয় করার ক্ষমতা লাভ করতে পারেনি।



চিত্রঃ ২১

"বল, আল্লাহ্ ব্যতীত আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে কেহই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।" (২৭ ঃ ২৫)

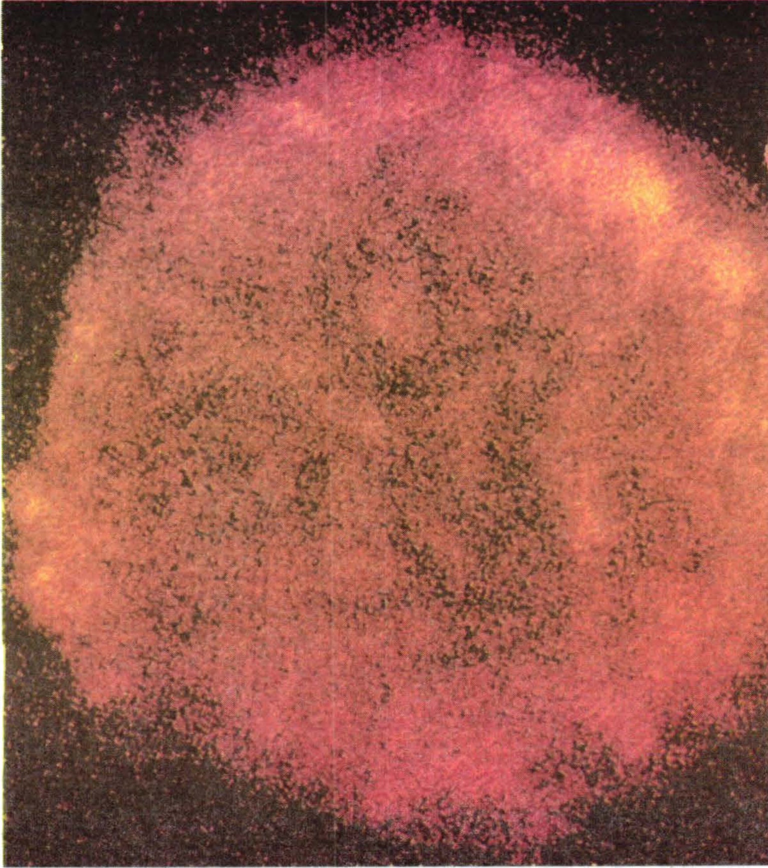
- NGC 2392 একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত নক্ষত্র, যা প্রায় ১০,০০০ বৎসর পূর্বে ধ্বংস হয়ে মহাশূন্যে শত শত আলোকবর্ষব্যাপী ভয়ংক চেহারায় ছড়িয়ে পড়েছে। মানবীয় বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষতা এই জাতিয় নেবুলা এখনও অতিক্রম করার প্রশ্নই উঠে না।



চিত্রঃ ২২

"যিনি (আল্লাহ্) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর লুকায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন।"
(২৭ ঃ ২৫)

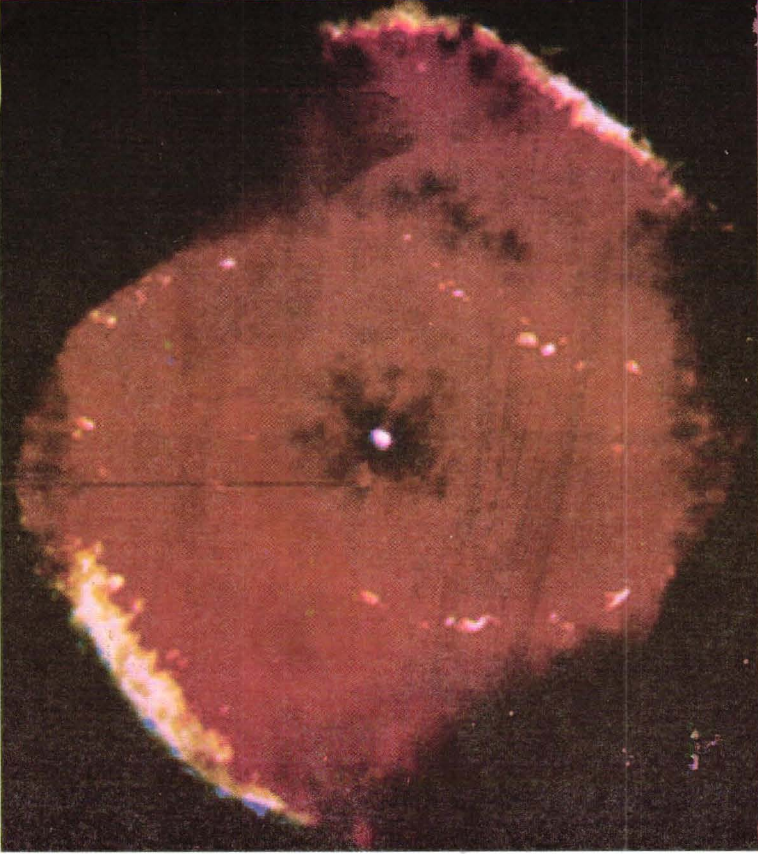
- মানব দৃষ্টির আড়ালে মহাকাশে কি অদ্ভুদ ও সাংঘাতিকরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত নক্ষত্রের পরিত্যাজ্য ছড়িয়ে আছে শত-সহস্র, কোটি কোটি মাইলব্যাপী, মানুষ যা পাড়ি দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। একি কল্পনা করা যায়? এর তাপমাত্রা প্রায় ১০ মিলিয়ন ডিগ্রি।



চিত্রঃ ২৩

"তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাহাতে তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের সংগে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার।" (১৩ ঃ ২)

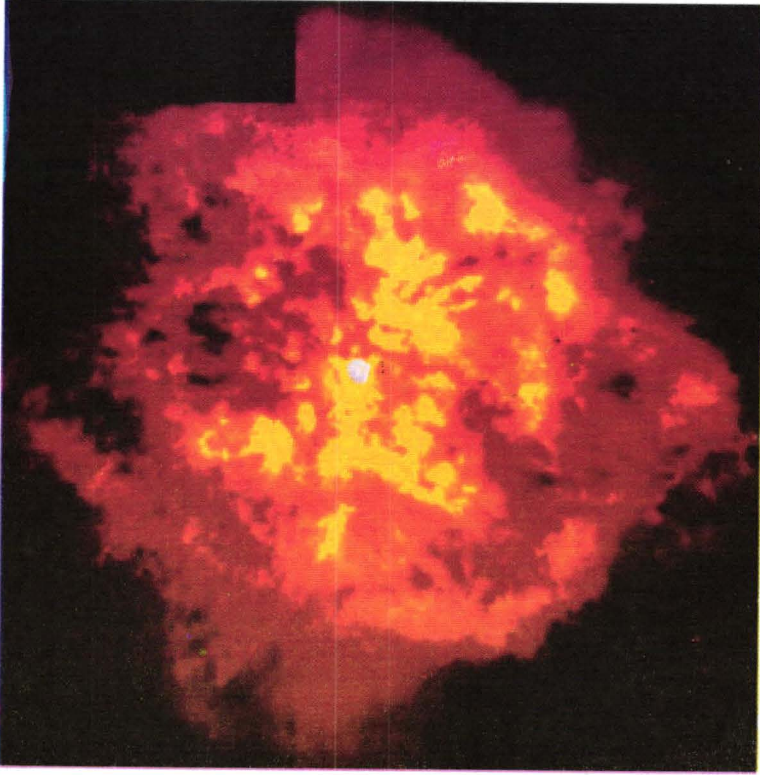
ছবিতে সুপার নোভা SN 1572 যা ১৫৭২ সালে 'কেসিওপিয়া রাশিচক্রে' একটি নক্ষত্র ধ্বংসের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় এবং এখনও প্রায় ১১,০০০ কিঃমিঃ/সেকেন্ডে চতুর্দিকে গ্যাসীয় মেঘ-পুঞ্জ আকারে ছড়িয়ে পড়ছে। ডেনিশ বিজ্ঞানী 'টাইকো ব্রাহে' (Tycho Brahe) তা আবিষ্কার করেন। যা ভয়ংকর তাপমাত্রা বিশিষ্ট ধূঁয়া-মেঘপুঞ্জ।



চিত্রঃ ২৪

"জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এই সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন।"
(১০ ঃ ৫)

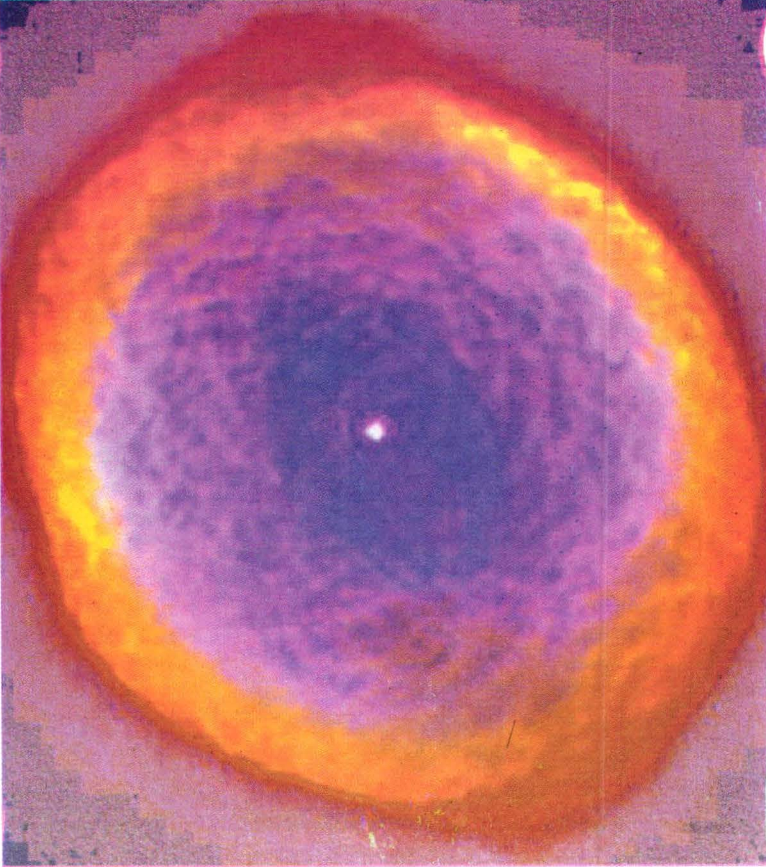
- *'বিড়াল চক্ষু নেবুলা'ও (Cats eye Nebula) নক্ষত্র ধ্বংসের কারণে সৃষ্ট। উত্তপ্ত ধূলা-বালি, গ্যাস, অগ্নি শিখা ও গলিত বিভিন্ন পদার্থের ভয়ংকর পরিবেশে পরিপূর্ণ বিশাল এলাকা দখল করে আছে এ জাতিয় নেবুলা। মহাক্ষমতা লাভ ব্যতীত এসকল ক্ষেত্রে মানব প্রচেষ্টা বড়ই অসহায়।*



চিত্রঃ ২৫

"তোমার প্রভুর পবিত্র সত্ত্বা ব্যতীত সকল কিছুই ধ্বংসের অধীন" (৫৫ ঃ ২৬)

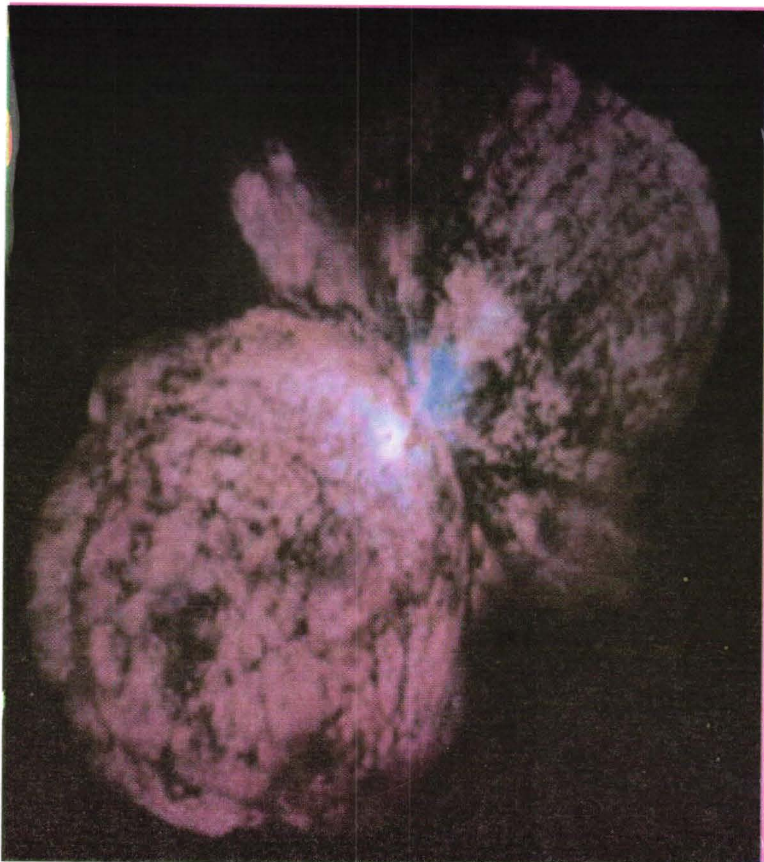
- ধ্বংসপ্রাপ্ত নক্ষত্র পরিত্যাজ্য MI-67 যা প্রায় ১০,০০০ বছর পূর্বে সৃষ্টি হয়ে এখনও প্রচন্ড ভয়াবহতার রূপ পরিগ্রহ করে শত শত আলোকবর্ষব্যাপী ক্রমাগতভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। পৃথিবী থেকে প্রায় ১৫০০০ আলোকবর্ষ দূরে 'সাগিতা' রাশিচক্রের দিকে অবস্থান করছে। এটিও এক ধরনের ভয়াবহ প্লেনেটারি নেবুলা।



চিত্রঃ ২৬

"তোমাদের উপর আগুনের শিখা, ধূলা-বালি, গলিত তাম্র মিশ্রিত ধূঁয়া-মেঘপুঞ্জ ছড়াইয়া পড়িবে, তোমরা যাহার মোকাবিলা করিয়া পার হইয়া যাইতে পারিবেনা।" (৫৫ ঃ ৩৫)

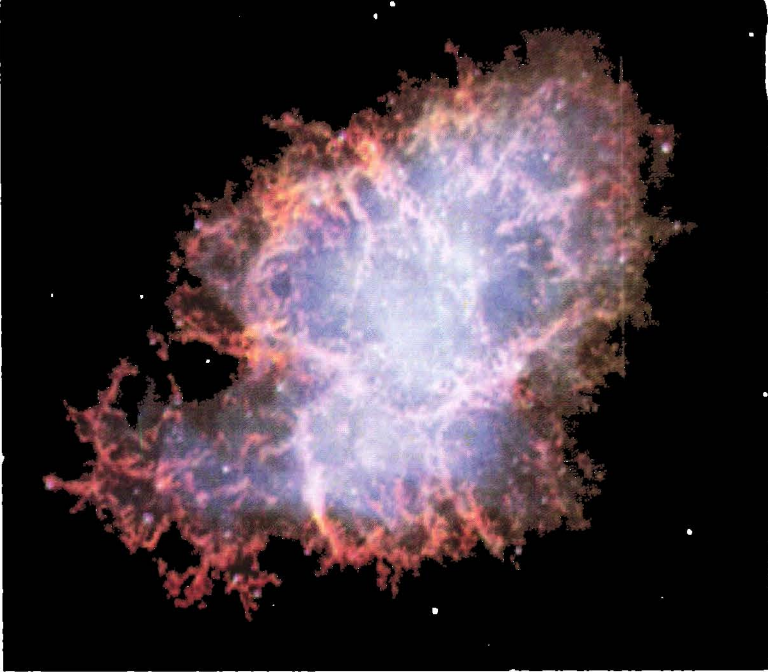
- *এটি একটি প্লেনেটারি নেবুলার (Planetary Nebula) ছবি। আমাদের সূর্যের ন্যায় নক্ষত্র ধ্বংস হয়ে সৃষ্টি হয়েছে। মহাকাশে উত্তপ্ত গ্যাস, ধূলা-বালি, অগ্নি ও গলিত পদার্থের ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টি করে কোটি কোটি মাইল পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। মহাক্ষমতা অর্জন ব্যতিরেকে মানব সমাজের পক্ষে বিজয় করা অসম্ভব ব্যাপার বৈ-কি!*



চিত্রঃ ২৭

"সুতরাং তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন সতর্কবাণীকে অস্বীকার করিতে পার?" (৫৫ ঃ ৩৬)

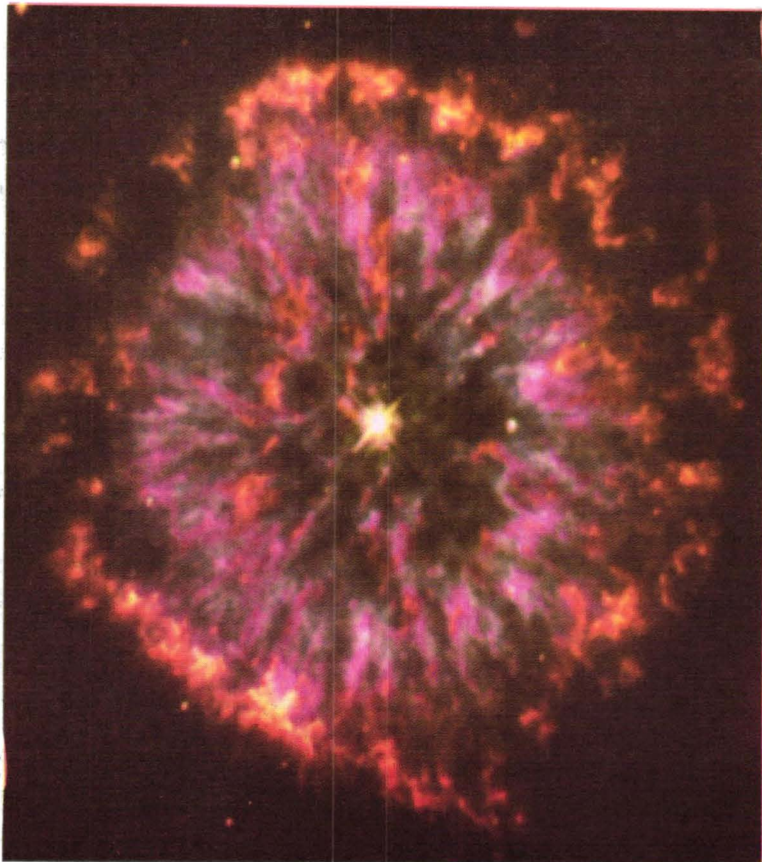
১৯৯৬ সালে আবিস্কৃত মহাকাশে প্রচন্ড বিস্ফোরণে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলা যাত্রী 'এ্যাটা কেরিনা' নক্ষত্র (Star Eta Carinae)। আমাদের সূর্যের চেয়ে প্রায় ১০গুণ বড় নক্ষত্র। ধ্বংস পরবর্তীতে সৃষ্টি করছে শত শত আলোকবর্ষব্যাপী উত্তপ্ত ও ভয়াবহ এক নির্দয় পরিবেশ যা অতিক্রম করার চিন্তাই করা যায় না। এরূপ অগনিত জ্যোতিষ্ক মহাকাশে ছড়িয়ে আছে ভয়ংকর পরিবেশ সৃষ্টি করে।



চিত্রঃ ২৮

"আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নাই, ইহা মহাসাফল্য।" (১০ ঃ ৬৪)

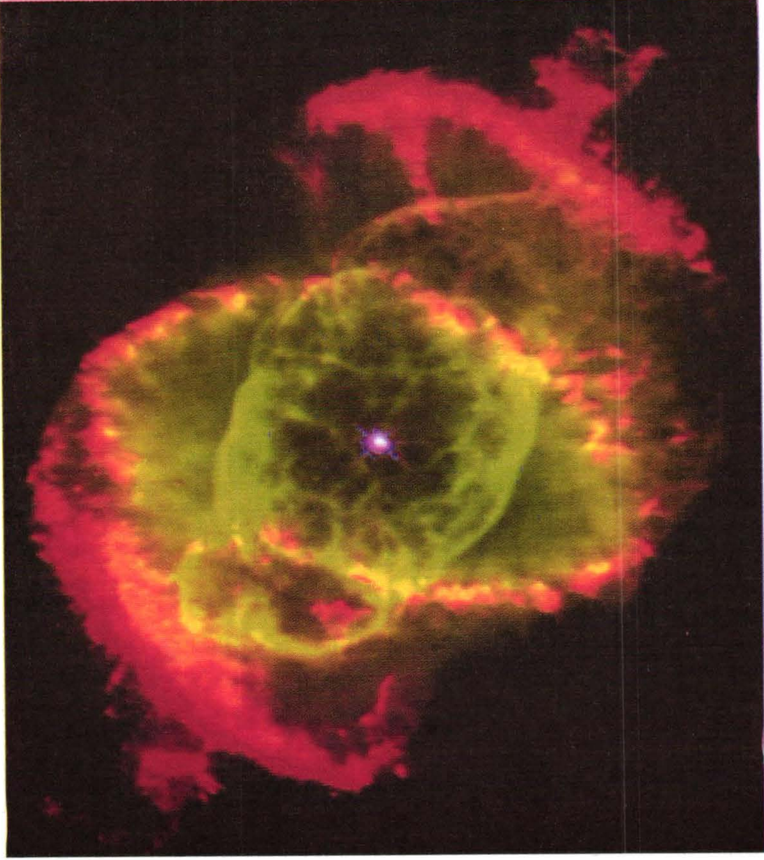
- 'ক্রেব নেবুলা' (Crab Nebula) পৃথিবী থেকে ৬৫০০ আলোকবর্ষ দূরে ১০৫৪ সালে একটি নক্ষত্রের ধ্বংসের মাধ্যমে সৃষ্ট। এখনও প্রায় ১৫০০ কিঃমিঃ/সেকেন্ড গতিতে এর উত্তপ্ত ধূলা-বালি, গ্যাস, অগ্নিশিখা ও গলিত পদার্থ হিসেবে তাম্র এবং স্বর্ণ মহাশূন্যে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। মহাশূন্য অভিযানে এ এক দুঃসাধ্য প্রতিকুল ব্যবস্থা যা অতিক্র করা বর্তমান বিজ্ঞান দিয়ে সম্ভব নয়। ১৪০০ বৎসর পূর্বে কুরআন-ই তা আমাদেরকে প্রথম অবহিত করেছে। একি এক বিরাট আশ্চর্য বিষয় নয়?



চিত্রঃ ২৯

"তিনিই (আল্লাহ্) তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনাবলী দেখান।" (৪০ ঃ ১৩)

- শত-সহস্র লক্ষ মাইল ব্যাসের নক্ষত্রসমূহ মহাকাশে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উত্তপ্ত ধূলা-বালি, অগ্নিশিখা ও মৌলিক পদার্থের গলিত মিশ্রন দিয়ে শত-শত আলোকবর্ষ এলাকা পরিপূর্ণ করে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। বর্তমান বিজ্ঞান এই ভয়ংকর প্রতিকুল পরিবেশ জয় করার জ্ঞান এখনও লাভ করতে পারেনি।



চিত্রঃ ৩০

"তিনিই মানুষকে অবহিত করিয়াছেন, ইতোপূর্বে সে যাহা জানিত না।"
(৯৬ ঃ ৫)

- মানব সমাজ ধাপে ধাপে জ্ঞানের প্রসারতা লাভ করে এই মহাবিশ্বে অসংখ্য অদৃশ্য-অজানা বস্তুর উদ্‌ঘাটন করে চলেছে, যা একদিকে বিস্ময়কর এবং অপরদিকে লুকায়িত 'মহাসত্যকে' দর্শনলাভে সহায়কও বটে। ছবিতে একটি নক্ষত্র বিষ্ফোরণ পরবর্তী ধূলা-বালি, গলিত পদার্থ ও প্রচন্ড অগ্নিশিখা চতুর্দিকে ধ্বংসের নেশায় ছুটে যেতে দেখা যাচ্ছে। শত আলোকবর্ষ হতেও বেশি এলাকা ইতোমধ্যেই দখল করে আছে, যা বর্তমান বিজ্ঞান দিয়ে মানুষ বিজয় করার সামর্থ রাখে না।

হবে। তখন সে স্থান দখল করবে অন্য কোন কিছু। কারণ কল্পনাতীত দূরত্বের কারণে আলোর গতি সম্পন্ন যানও সেখানে অসহায় হয়ে পড়বে, ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

উল্লেখিত আগ্নিশিখাময়, গলিত পদার্থ ও উত্তপ্ত ধূলা-বালি মিশ্রিত মহাকাশীয় এই 'নেবুলা' সম্পর্কে পবিত্র কুরআন এবং বিজ্ঞান কি একই বক্তব্য পেশ করেনি? ১৪০০ বছরের দুই প্রান্তের দুই বক্তব্যের মধ্যে কোন বৈপরিত্য নজরে পড়ে কি? আল্-কুরআনের অকাট্য 'সত্যতা' যে এতে প্রমাণিত হয়েছে তা-কি আর অস্বীকার করা যায়?

ধূলা-বালি, অগ্নিশিখা ও গলিত ধাতব পদার্থ মিশ্রিত ধোঁয়া-পুঞ্জ বা নেবুলা সম্পর্কে দীর্ঘ পর্যালোচনার পর এবার পুরো বিষয়টি সংক্ষিপ্তকারে 'এক নজরে' দেখে নিই।

এক নজর

আল্-কুরআন	বর্তমান বিজ্ঞান
(১) " 'আল্-কুরআন' সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে মানব জাতির জন্য অবতীর্ণ পবিত্র ঐশীবাণী সম্ভার, যা চিরন্তন, শ্বাশ্বত ও কালজয়ী।"	(১) 'বিজ্ঞান' পৃথিবীপৃষ্ঠে মানব সমাজের সময়ে সময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ-অনুসন্ধানের মাধ্যমে অর্জিত বিশেষ জ্ঞান, যা সঠিক রহস্য উদ্‌ঘাটনের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত পরিবর্তনশীল।
(২) "আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী এবং এই দুইয়ের মাঝে যাহা কিছু আছে সকল কিছুই তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন ছয়টি সময়কালে।" (৩২ ঃ ৪)	(২) 'Big Bang' model-এ এই মহাবিশ্বের সৃষ্টির সূচনা হয়েছে এবং 'আলোক শক্তি' হতে পর্যায়ক্রমে ৬টি সময়কালের শেষ পর্যায়ে 'অটল পরমাণু' (Stable atom) সৃষ্টি হয়েছে। বেলজিয়াম বিজ্ঞানী 'ল'মেইটর' ১৯৩৩ সালে সর্ব প্রথম অফিসিয়ালী (Officialy) 'Big Bang' প্রস্তাব পেশ করেন। পরে ১৯৬৪ সালে দু'জন আমেরিকান বিজ্ঞানী

	কর্তৃক 'Back ground radiation' 2.73k আবিষ্কৃত হয়ে 'Big Bang' প্রস্তাবকে প্রমাণিত করে, ফলে উক্ত প্রস্তাব বিশ্ব ব্যাপী প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
(৩) "তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা সকলই আল্লাহ্ তায়ালা জানেন।" (৫৮ ঃ ৭) "(আল্লাহ্) যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন।" (২৫ ঃ ৬) "তিনি সকল কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি সকল বস্তুর সকল অবস্থা সম্পর্কে সবিশেষ অবগত আছেন।" (৬ ঃ ১০২) "আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।" (৯ ঃ ১১৫)	(৩) আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী বস্তুসমূহের মধ্যে সকল বিষয়ে বিজ্ঞান অবগত নয় এবং সে দাবী উত্থাপন ও করে না'। সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞান তার গবেষণাগার, ল্যাবরেটরী, মান-মন্দির ইত্যাদির মাধ্যমে আবিষ্কৃত চূড়ান্ত মানের প্রযুক্তি ব্যবহার করে যখন যতটুকুন উদ্‌ঘাটন করতে পারে তখন কেবল ততটুকুনের-ই দাবী করে থাকে। তাও আবার সমগ্র বিশ্বব্যাপী প্রায় সকল বিজ্ঞানী মহল কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়।
(৪) "(প্রচন্ড শক্তি-ক্ষমতা অর্জন ব্যতিরেকে) তোমরা যদি পৃথিবী ও আকাশের সীমানা ছাড়াইয়া বাহির হইয়া যাইতে চাও তাহা হইলে উত্তপ্ত অগ্নি-শিখা, ধূলা-বালি, গলিত তামা মিশ্রিত ধূয়া-মেঘ পুঞ্জ, তোমাদের উপর ছড়াইয়া পড়িবে যাহার মোকাবিলা করিয়া পার হইয়া যাইতে পারিবেনা। (৫৫ ঃ ৩৫)	(৪) সর্ব প্রথম ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী 'Mr. Messier', মহাকাশে বিশাল-বিশাল নেবুলা বা ধূয়া-মেঘ পুঞ্জের সন্ধান দেন। পরে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে William Herschel সহ সকল বিজ্ঞানীই ঐ প্রস্তাব মেনে নেন। অতঃপর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে Astronomical spect-roscopist 'Sir, William Hugging' ঐ প্রস্তাব প্রমাণ করে তার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেন।

"তোমার প্রভুর বাণী সম্পূর্ণ সত্য ও ন্যায় সংগত। তাঁহার বাণী কেহই মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইবে না। তিনি সমস্ত বিষয়েই অবগত রহিয়াছেন।" (৬ ঃ ১১৫) "আল্লাহ্র বাণীর কোন পরিবর্তন নাই। ইহা এক মহাসাফল্য।" (৬ ঃ ১০৪)	তাতে দুই প্রকার নেবুলাই প্রমাণ করা হয়। যথাঃ (১) আদি নেবুলা ও (২) প্লেনেটারী (Planetery) নেবুলা। পরবর্তীতে আরও প্রমাণিত হয় যে– এক একটি 'নেবুলা' মহাকাশে শত-সহস্র আলোকবর্ষব্যাপী বিস্তৃত হয়ে আছে। এদের কোন কোনটি নক্ষত্রের বিস্ফোরনজাত কারণে সৃষ্ট বিধায় এতে উত্তপ্ত অগ্নিশিখা, গলিত ধাতব পদার্থ এবং ধূলি-বালির মেঘ বা ধূঁয়া দিয়ে পরিপূর্ণ থাকে। যার কারণে ঐ জাতীয় 'প্লেনেটারী নেবুলা' প্রচন্ড উত্তাপ (প্রায় চার লক্ষ ডিগ্রি) সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং মারাত্মক তেজস্ক্রীয়তা Gamma-ray, X-ray ইত্যাদি নির্গত করে থাকে। বিজ্ঞানীগণ আরও প্রমাণ করেন যে, উক্ত উত্তপ্ত মেঘপুঞ্জ বিস্ফোরণ জনিত কারণে প্রায় প্রতি সেকেন্ডে ১১০০০ কিলোমিটার গতিতে মহাকাশে বিস্তৃত হয়ে চলে। বিজ্ঞানের বর্তমান 'রকেট প্রযুক্তি' এই ধরণের একটি নেবুলা পাড়ি দিয়ে অতিক্রম করার যোগ্যতা রাখে না। বর্তমান গতি নিয়ে কোন রকেট যদি ঐ জাতিয় কোন নেবুলাতে ঢুকে পড়ে, তাহলে সাথে সাথেই গতি কম হওয়ার কারণে প্রচন্ড উত্তাপে জ্বলে-পুড়ে ছাই ভস্মে পরিণত হবে।

"বল, তোমরা কি আল্লাহ্‌কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর এমন কোন কিছুর সংবাদ প্রদান করিবে, যাহা তিনি অবগত নহেন? তিনি অজ্ঞানতা হইতে অতিশয় পবিত্র।" (১০ ঃ ১৮) "আল্লাহ্‌ সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ আছে কি যে তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা?। (১৪ ঃ ১০)	ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে মহাকাশ অভিযান। 'প্লেনেটারী নেবুলা ক্ষেত্র বিশেষে তাপমাত্রা ৪০০,০০০ ^{o}C পর্যন্ত প্রদর্শন করে থাকে। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় আরও তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে যে প্রতিটি গ্যালাক্সীতেই বর্তমান আছে অসংখ্য অগণিত নেবুলা। গড়ে প্রতিটি গ্যালাক্সীতে প্রায় ২০,০০০ কোটি নক্ষত্র সৃষ্টি হওয়ার পরও অনুরূপ সংখ্যক কিংবা তার চেয়েও বেশি নক্ষত্র সৃষ্টি হওয়ার মত 'নেবুলা' অবশিষ্ট আছে। আবার প্রতিনিয়ত অসংখ্য নক্ষত্র জীবনসায়াহ্নে ধ্বংস হয়ে সৃষ্টি হচ্ছে ভয়ংকর 'প্লেনেটারী নেবুলা'। তাই এক কথায় বলা যায় মহাকাশ অভিযানে (Inter steller ভ্রমনে) অন্যতম বাঁধা হচ্ছে – অসংখ্য-অগণিত নেবুলার অবস্থান, আর সেই বাধাকে সাফল্য জনকভাবে জয় করার অন্যতম শর্ত হচ্ছে–'প্রচন্ড শক্তি ও ক্ষমতা' সম্পন্ন Space Ship ব্যবহার, নতুবা একদিকে যেমন Mission ব্যর্থ হবে–অন্যদিকে সব জ্বলে-পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।
(৫) "তিনিই মানুষকে জ্ঞান দান করিয়াছেন ইতোপূর্বে যাহা সে	(৫) বিজ্ঞান তার সকল প্রযুক্তি, সাজ সরঞ্জাম ও আবিষ্কার সমূহ

জানিত না।" (৯৬ : ৫) "তিনিই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর লুকায়িত বা অদৃশ্য বস্তুসমূহকে প্রকাশিত করেন।" (২৭ : ২৫) "এই গুলি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের নিদর্শন।" (১০ : ১) "প্রত্যেক সংবাদ প্রকাশের নির্দিষ্ট সময় রহিয়াছে।" (৬ : ৬৭)	নিয়ে অধ্যবসায়ের সাথে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং এভাবে চলতে গিয়েই সময়ের ব্যবধানে পর পর একটি একটি করে অসংখ্য বিষয়ের গোপন রহস্য উন্মোচন করছে। ফলে আল্-কুরআন থেকে পূর্বেই প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবসমূহ 'সত্যবাণী' হিসাবে সমর্থিত হচ্ছে, প্রমানিত হচ্ছে। বিজ্ঞান তার চলার পথে কখন কোন্ বিষয়টি আবিষ্কার করতে সমর্থ হবে সে সম্পর্কে পূর্বে কিছুই জানে না। বিষয়টির কতৃর্ত্ব মনে হয় যেন বিজ্ঞানের হাতে নেই, আছে অন্য কোথাও!
(৬) "তোমরা তোমাদের প্রভুর এই নিদর্শনমূলক (বিজ্ঞানসম্মত) বাণীকে মিথ্যা মনে করিয়া কি অস্বীকার করিতে পার?" (৫৫ : ৩৬) "তিনি তোমাদিগকে বহু নিদর্শন দেখাইয়া থাকেন, অতঃপর তোমরা আল্লাহ্র কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করিবে?" (৪০ : ৮১)	(৬) যা সত্য, বাস্তব, বিজ্ঞান নিরপেক্ষভাবে তার পূজারী। সত্যকে মেনে নিতে যেমন দৃঢ়, ঠিক তেমনি মিথ্যাকেও দূরে নিক্ষেপ করতে বেপরোয়া। তবে ধূরন্ধর মানুষের প্রভাবমুক্ত হওয়া ছাড়া বিজ্ঞান সব সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে অনেক সময়ই ব্যর্থ হয়ে থাকে। মানব জাতির জন্য এ এক অকল্যাণজনক অবস্থা।
(৭) "অতএব হে জ্ঞানীসমাজ! আল্লাহ্কে ভয় করিয়া চলিও।" (৫ : ১০০) "মূলতঃ গোলামদিগের মধ্যে জ্ঞানীরাই আল্লাহ্কে ভয় করে।" (৩৫ : ২৮)	(৭) বিজ্ঞানের সকল দিক ও বিভাগেই একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রতিনিয়তই পরিস্ফুটিত হয়ে চলেছে বেশি, আর তা হলো 'সত্যের লালন'। সত্য এবং বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে তার

	পদতলে নিজকে সমর্পন করতে বিজ্ঞান যদিও বিভিন্ন কারণে এখনো পুরোপুরি সক্ষম হয়নি; তবুও সে পথে যেন সে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। সেদিন হয়তো আর বেশি দূরে নয়, যেদিন বিজ্ঞান বিশ্বব্যাপী মহাসমারোহে এক 'আল্লাহ্‌র' প্রকাশ্য গুণ-জ্ঞানে মুখরিত হবে এবং নিজ মস্তককে তাঁর সামনে অবনত করে দিবে। বর্তমান সর্বশেষ চূড়ান্ত আবিষ্কার সমূহ যেন সে ইংগিতই প্রদান করছে।

সুতরাং ১৪০০ বৎসর পূর্বের 'কুরআন'কে বর্তমান সাফল্যমন্ডিত 'বিজ্ঞান' বাস্তব 'সত্যে' পরিণত করেছে। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে খালিচোখে মানবসমাজ এতদিন যে নেবুলাকে সরাসরি দর্শন না করে শুধুমাত্র কুরআনের সোনালী পাতায় প্রস্তাবাকারে মুদ্রিত দেখতে পেয়েছিল, বর্তমান বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত 'টেলিস্কোপ' মানুষের সেই অসহায়ত্বকে ঘুচিয়ে দিয়ে 'কুরআনের' অদৃশ্য বৈজ্ঞানিক প্রস্তাব করেছে একেবারে প্রকাশ্যে আকাশরাজ্যে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। প্রমান করেছে 'কুরআন' সত্য, 'রাসুল' (সাঃ) সত্য এবং সত্য মহান স্রষ্টা 'আল্লাহ্‌ রাব্বুল আ'লামিন'।

‘কিয়ামাত বা মহাপ্রলয়’
আল্‌-কুরআনঃ
(‘ক’ গ্রুপ)ঃ

“আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যবর্তী যাহা কিছু আছে সকল কিছুই বিচক্ষণতার দাবী অনুযায়ী এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি।” (৪৬ঃ৩)

“উহারা আল্লাহ্‌র যথোচিত সম্মান করে না, কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকিবে তাঁহার হাতের মুষ্ঠিতে এবং আকাশমন্ডলী থাকিবে তাঁহার করায়ত্ত।” (৩৯ ঃ ৬৭)

“শপথ মহা ধ্বংস দিবসের।” (৭৫ ঃ ১)

“নিশ্চয় বিচারের দিন নির্দিষ্ট রহিয়াছে।” (৭৮ ঃ ১৭)

“ইহার চরম জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই নিকট আছে, আমিতো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। (৬৭ ঃ ২৬)

“হে মানুষ! ভয় কর তোমাদিগের প্রতিপালককে, কিয়ামাতের প্রকম্পণ এক ভয়াবহ ব্যাপার।” (২২ ঃ ১)

“তখন চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে।” (৭৫ ঃ ৭)

“কিয়ামাতের মুহূর্ত নিকটবর্তী হইয়াছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে।” (৫৪ ঃ ১)

“হে মানুষ এবং জ্বীন! আমি শীঘ্রই তোমাদিগের প্রতি মনোনিবেশ করিব (তোমাদিগের হিসার সত্তর-ই গ্রহণ করিব)।” (৫৫ ঃ ৩১)

(‘খ’ গ্রুপ)ঃ

“যখন সিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে এবং একটিমাত্র ফুৎকার।” (৬৯ ঃ ১৩)

“ইহাতো কেবল একটিমাত্র বিস্ফোরণের শব্দ।” (৭৯ ঃ ১৩)

“যখন কর্ণবিদারী মহানিনাদ উপস্থিত হইবে।” (৮০ ঃ ৩০)

"এবং সিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, ফলে যাহাদিগকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করিবেন তাহারা ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মুর্ছিত হইয়া পড়িবে।" (৩৯ ঃ ৬৮)

('গ' গ্রুপ)ঃ

"তোমরা কি নিশ্চিত হইয়া গিয়াছ, যিনি আকাশে রহিয়াছেন তিনি তোমাদিগের উপর পাথরবাহী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করিবেন না ? (৬৭ঃ১৭)

"যখন কাওকাব (গ্রহানু / ধূমকেতু) বিক্ষিপ্তভাবে নিক্ষিপ্ত হইবে।" (৮২ ঃ ২)

"শপথ আকাশের এবং (সহসা) আঘাতকারীর, তুমি কি জান এই আঘাতকারী বস্তুটি কি ? উহা একটি প্রজ্জ্বলমান জ্যোতিষ্ক।" (৮৬ ঃ ১-৩)

('ঘ' গ্রুপ)ঃ

"পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হইবে এবং যখন উহা আপন ভার বাহির করিয়া দিবে।" (৯৯ ঃ ১-২)

"জমিন এবং পাহাড় গুলোর মাঝে সংঘর্ষ বাধাইয়া দেওয়া হইবে এবং একই আঘাতে তাহারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।" (১৭ ঃ ৮১)

"সেই দিন সংঘটিত হইবে মহাপ্রলয়।" (৬৯ ঃ ১৫)

"মহাপ্রলয় ! মহাপ্রলয় কি ? মহাপ্রলয় সম্পর্কে তুমি কি জান ? সেই দিন মানুষ বিক্ষিপ্ত হইবে পতঙ্গের মত এবং পর্বতসমূহ ধূনীত হইবে রঙ্গীন পশমের মত।" (১০১ ঃ ১-৫)

"পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হইবে এবং ধাক্কায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়িবে।" (৬৯ ঃ ১৪)

"পৃথিবীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইবে।" (৮৯ ঃ ১১)

"আর যখন পর্বতমালা উন্মিলিত ও বিক্ষিপ্ত হইবে।" (৭৭ ঃ ১০)

"আর পর্বত সমূহ উড়ন্ত ধূলিকণায় পরিণত হইবে।" (৭৩ ঃ ১৪)

"পর্বত সমূহকে যখন অপসারিত করা হইবে।" (৮১ ঃ ৩)

"যেদিন তোমরা উহা প্রত্যক্ষ করিবে, সেই দিন প্রত্যেক স্তন্যদানকারীনি ভূলিয়া যাইবে তাহার দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তাহার গর্ভপাত করিয়া ফেলিবে। মানুষকে দেখিবে মাতাল সদৃশ, যদিও উহারা নেশাগ্রস্থ নহে, বস্তুত আল্লাহ্‌র শাস্তি কঠিন।" (২২ ঃ ২)

('ঙ' গ্রুপ)ঃ

"যখন সমুদ্র উদ্বেলিত হইবে।" (৮২ ঃ ৩)

"যখন সমুদ্র স্ফীত হইয়া যাইবে।" (৮১ ঃ ৬)

('চ' গ্রুপ)ঃ

"যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে।" (৭৭ ঃ ৯)

"যখন আকাশের আবরণ উন্মোচিত করা হইবে।" (৮১ ঃ ১১)

"সেই দিন আকাশ গলিত ধাতুর মত হইবে।" (৭০ ঃ ৮)

"যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হইবে সেই দিন উহা রক্তে-রংগে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করিবে।" (৫৫ ঃ ৩৭)

('ছ' গ্রুপ)ঃ

"যখন সূর্য জ্যোতিহীন ও নিস্প্রভ হইয়া যাইবে।" (৮১ ঃ ১)

"যখন নক্ষত্ররাজি খসিয়া পড়িবে (স্থানচ্যুত হইবে)।" (৮১ ঃ ২)

"তখন চন্দ্র হইয়া পড়িবে জ্যোতিহীন।" (৭৫ ঃ ৮)

"যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একই অবস্থায় একাকার করা হইবে।" (৭৫ ঃ ৯)

"যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হইয়া যাইবে।" (৭৭ ঃ ৮)

"যখন জ্যোতিষ্কসমূহ মলিন হইয়া যাইবে।"

বক্ষমান অধ্যায়ে উদ্ধৃত খুবই ভয়ংকর ও রীতিমত ভীতিপ্রদ ঐশী বাণীগুলোর ওপর দৃষ্টি ফিরিয়ে হয়তোবা ইতোমধ্যেই আমাদের এই নয়নাভিরাম সুন্দর পৃথিবীর শেষ পরিণতির একটা কাল্পনিক চিত্র মনের মধ্যে অঙ্কিত করতে সমর্থ হয়েছি। তবে আরও গভীরভাবে এবং জ্ঞানপূর্ণ পরিসরে নিরেট বাস্তবতার আলোকে পবিত্র বাণীসম্ভার বুঝার জন্য একটু খোলা-মেলা আলোচনার যে প্রয়োজন রয়েছে তা কিন্তু অস্বীকার করা যায় না।

মহাপ্রলয়ের বর্ণনা ঐশীগ্রন্থ 'কুরআনের' প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠাতেই 'কুরআন' মনীষা বিক্ষিপ্তভাবে পাঠককে সমূহবিপদের ভয়াবহতার দৃশ্য ইংগিতে পেশ করে সাবধান-সতর্ক করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। আমরা সেই জ্ঞানগর্ভ বক্তব্যকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য আয়াতগুলোকে ধারাবাহিকভাবে গ্রুপভিত্তিক সাজিয়ে নিয়েছি, যাতে করে পুরো বিষয়টি একবারেই বোধগম্য হয়। 'কুরআন' মনীষা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তায়ালা 'ক' গ্রুপের আয়াতগুলোতে যে বক্তব্য পেশ করেছেন, তার সরল ব্যাখ্যা হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা নিজ ইচ্ছায় নিজ পরিকল্পনায় একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যবর্তী দৃশ্য-অদৃশ্য যা কিছু আছে সকল কিছুই সৃষ্টি করেছেন। এগুলির কোন কিছুই উদ্দেশ্য বিহীন, জ্ঞানহীন কিংবা ছেলে-খেলা নয়; বরং উদ্দেশ্যপূর্ণ, জ্ঞানপূর্ণ ও রহস্যপূর্ণও বটে, যা অবশ্যই ভাবনার বিষয় কিন্তু অধিকাংশ মানুষই সে খবর রাখে না এবং জানতেও আগ্রহী নয়। আর সে কারণেই তারা আল্লাহ্র যথাযথ মর্যাদা, সম্মান বা তাঁর মাহাত্ম উপলব্ধিও করতে পারে না। অথচ এই পৃথিবীর চূড়ান্ত ধ্বংসের দিন এর সম্পূর্ণ করায়ত্ত তাঁর কুদরতি হাতের মুষ্ঠিতে আবদ্ধ থাকবে। প্রচন্ড ও কঠোর হাতের তান্ডবেই মহাপ্রলয়ের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে। কেউ যেন কোনভাবেই তা অবিবেচনা প্রসূত বা বিষয়টি অবাস্তব ভেবে উপেক্ষা করতে না পারে সে জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রতিজ্ঞা করে, কসম করে সেই নির্ধারিত অশুভ দিনটির সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট সময়টি সম্পর্কে কারো সামান্যতম জ্ঞানও নেই, কেউ এর আগমন মুহূর্তের সংবাদ জানে না বা জানতে চেষ্টা করলেও সফল হবে না। এই গুরুতর ধ্বংস মুহূর্তের সংবাদ এবং তার সার্বিক জ্ঞান বিশ্বপ্রভু-প্রতিপালকেরই শুধু আছে যেহেতু তিনিই এ প্রোগ্রাম সিডিউল প্রস্তুতকারক, অন্য কেউ নয় এবং অন্য কেউ হতে পারে না।

অতএব, মানুষের এই ব্যাপারে নিজ স্বার্থেই কঠোর সতর্কতা-সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, কারণ এই প্রলয়ের দিনের কঠোরতা, ভয়াবহতা, তীব্রতা ও ধ্বংসশীল অবস্থা হবে কল্পনাতীত, যা বাস্তব চোখে মানুষ দেখেও নিজ দৃষ্টিকে বিশ্বাস করতে ব্যর্থ হবে। তাদের চোখ ঘটনার প্রচন্ডতায় স্থির হয়ে অবাক বিস্ময়ে জমে যাবে, দৃষ্টিশক্তি তার কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে।

উল্লেখিত অবিশ্বাস্য রকমের প্রলয়ংকরী কিয়ামাতের অঘোষিত অথচ নির্ধারিত অশুভ দিনটি কিন্তু খুবই নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে এবং দুনিয়ার মানুষকে তারই

আগমনের পূর্বাভাস হিসোবে নিদর্শনস্বরূপ তাদেরই সবচেয়ে নিকটবর্তী মহাকাশীয় জ্যোতিষ্ক 'চন্দ্রের' উপর নিক্ষেপ করা হয়েছে সতর্ক সংকেত (Warning shoot) কিয়ামাতেরই এক ধরণের মারণাস্ত্র যা 'চন্দ্রকে' বিদীর্ণ করেছে। এ ঘটনাটি এ জন্যই ঘটানো হয়েছে যাতে করে এ দৃশ্য অবলোকন করে মানুষ নিজ অবস্থানকৃত গ্রহ-পৃথিবী ধ্বংসের মিল খুঁজে পায় এবং বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে যে, চাঁদের নিকটতম বড় প্রতিবেশী এই পৃথিবীতেও তদ্রুপ মহাকাশীয় মারণাস্ত্রের আক্রমণে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। মহাপ্রলয়ের ব্যাপারে আর যেন কোন প্রকার সন্দেহ না থাকে, সেজন্য দুটি কথাকে একই মালায় গেঁথে পরিবেশিত হয়েছে "(কিয়ামাতের মুহূর্ত নিকটবর্তী হইয়াছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে।")

উক্ত ৫৪ ঃ ১ আয়াতখানি পৃথিবীপৃষ্ঠে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠীর জন্য গুরুতর সংবাদ বহন করে এনেছে বিধায় এই ব্যাপারে সকল ধুম্রজাল এবং বিভ্রান্তিমূলক তথ্যসমূহ যা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে মূল সত্যকে আড়াল করে রেখেছে, তা দূর করে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ঘটানো বাস্তব–ঘটনাটি স্পষ্ট আলোতে তুলে ধরার নিমিত্তে বিষয়টির উপর সামান্য করে হলেও আলোকপাত করা জরুরী বোধ করছি।

ঐশীগ্রন্থ কুরআনের সূরা 'ক্বামার'-এর প্রথম আয়াতে 'কিয়ামাত' অস্বীকারকারীদের দৃষ্টি আকর্ষন করে একেবারে চমক সৃষ্টি করে হঠাৎ করেই আল্লাহ্পাক ঘোষণা করলেন যে–"কিয়ামাতের মুহূর্ত নিকটবর্তী হইয়াছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে।" অর্থাৎ, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত সত্যদূত যে 'কিয়ামাতের' ভয় তাদেরকে প্রদান করছেন, তা যে সত্য-সত্যই ঘটবে, তার নিদর্শন বা নমুনা বা প্রদর্শনী দেখাবার মানসেই 'কুরআন মনীষা' এই ঘটনা (চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া) ঘটিয়েছেন। দ্বিতীয় বা তার পরের আয়াতটি এই পরিপ্রেক্ষিতে সামনে তুলে আনলে এ বিষয়ে আরো পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা যায়। সেখানে সাথে সাথেই বলা হয়েছে যে– "কিন্তু এই লোকদের অবস্থা এই যে, কোন স্পষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাইলেও মুখ ফিরাইয়া লয় এবং বলে ইহাতো পূর্ব হইতে চলিয়া আসা যাদু"। অনুরূপভাবে পরবর্তী তৃতীয় আয়াতটিও উল্লেখিত ঘটে যাওয়া ঘটনার কি সুন্দর করে প্রমাণ পেশ করছে–"ইহারা (এই ঘটনাকে) মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে এবং নিজেদের নফসের কামনা-বাসনার-ই অনুসরণ করিয়া বলিয়াছে (ইহাতো পূর্ব হইতে চলিয়া আসা যাদু), (ভালো করিয়া স্মরণে রাখিও) প্রত্যেক ব্যাপারকে শেষ পর্যন্ত একটি পরিণতি পর্যন্ত অবশ্যই পৌছিতে হইবে।" অর্থাৎ, উল্লেখিত ৩টি আয়াত যে বাস্তব ছবি

চোখের সামনে প্রদর্শন করতে চায়, তাহলো–কিয়ামাত নামক যে মহাদূর্ঘটনার মাধ্যমে এবং যে পদ্ধতিতে এই জীবনময় গ্রহের যবনিকাপাত আল্লাহ্ তা'য়ালার পক্ষ থেকে ঘটানো হবে সে গুরুতর বিষয়টির উপমা বা উদাহরণ মক্কার মানুষেরা স্ব-চোখে দেখে যেন মনেপ্রাণে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তদনুযায়ী নিজেদের জীবনকে পরিশোধিত করে নেয়, সে জন্যই নিদর্শনমূলক–চিহ্নস্বরূপ একই রকম অথচ ছোট্ট একটি ঘটনা–চন্দ্রের উপর ঘটানো হয়েছে।

পবিত্র হাদীসগ্রন্থসমূহের বর্ণনাসমূহ হতেও ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ও খুঁটি-নাটি বিষয় জানা যায়। কবে কিভাবে এটি সংঘটিত হয়েছিল তাও হাদীস থেকে ভালোভাবে জানা যায়। এ পর্যায়ে বর্ণনাসমূহ বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আহ্মাদ, আবু উয়ানা, আবু দাউদ তায়ালিসী, আবদুর রাজ্জাক, ইব্নে জারীর, বায়হাকী, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া ও আবু নয়ীম ইসফাহানী বহুসংখ্যক সনদসূত্রে হযরত আলী, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে উমার, হযরত হুযাইফা ও হযরত যুবাইর ইব্নে মুতয়িম (রাঃ) হতে উদ্ধৃত করেছেন। এঁদের মধ্যে তিন জন-অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ্ ইনে মাসউদ, হযরত হুযাইফা ও হযরত যুবাইর ইবনে মুতয়িম (রাঃ) স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন যে, তারা এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, সাক্ষী। দুইজন সাহাবী এমন যাঁরা এর প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হতে পারেন না। কেননা তাঁদের একজন–হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে আব্বাস (রাঃ)-র জন্মের পূর্বে ঘটে যাওয়া ঘটনা। আর হযরত আনাস ইব্নে মালেক (রাঃ) তখন ছিলেন বালক মাত্র। কিন্তু এ দু'জনই রাসূলে করীম (সাঃ)-এর সাহাবী। কাজেই তাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী কিংবা প্রত্যক্ষভাবে অবহিত সাহাবীদের নিকট থেকে শুনতে পেয়ে বর্ণনা করে যে থাকবেন, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ থাক্তে পারে না।

এ পর্যায়ে বর্ণিত ও উদ্ধৃত সমস্ত হাদীস একত্রিত করলে ঘটনার যে বিস্তারিত রূপটি জানা যায়, তা এই যে–হিয্রতের প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বেকার ঘটনা, সেদিন চন্দ্রমাসের ১৪তম রাত্রি ছিল। সবেমাত্র চন্দ্রোদয় ঘটেছিল। সহসা এটা দীর্ণ হয়ে গেল এবং এর একটি অংশ সম্মূখের পাহাড়ের একপার্শ্বে এবং অপর অংশটি অপর পার্শ্বে পরিদৃশ্য হল। এই অবস্থাটি মুহূর্তমাত্রের জন্য থাকল। অতঃপর উভয় অংশই একত্রি হয়ে জুড়ে গেল। নবী-কারীম (সাঃ) এ সময় 'মিনায়' অবস্থান করছিলেন। তিনি লোকদেরকে বললেন, 'তোমরা প্রত্যক্ষ কর এবং সাক্ষী থাক'। কাফিররা বললো, 'মুহাম্মাদ আমাদের উপর যাদু করেছে। এ কারণে আমাদের চক্ষু প্রতারিত হয়েছে।' অন্যান্য লোকেরা বললো,

'মুহাম্মদ (সাঃ) আমাদের ওপর যাদু করতে পারেন। বাইরে যাওয়া লোকদেরকে ফিরে আস্তে দাও, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করব, তারাও এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করছে কি-না?' বাইর হতে যখন কিছু লোক ফিরে আসল, তখন তারাও এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে বলে সাক্ষ্য দিল।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত কোন কোন বর্ণনায় এ ভূল ধারণার সৃষ্টি হয় যে, এ ঘটনাটি মাত্র একবার নয়; দু'বার ঘটেছিল। কিন্তু একেতো সাহাবীদের মধ্যে অন্য কেউ-ই এ কথা বলেননি, দ্বিতীয়ত হযরত আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত কোন কোন বর্ণনায় 'দুবার' শব্দ উদ্ধৃত হয়েছে, আবার কোন কোন বর্ণনায় 'দু'টুকরা বলা হয়েছে। কাজেই দু'বার সংঘটিত হওয়ার কথাটা কিছুমাত্র বলিষ্ঠ নয়। তৃতীয়তঃ কুরআন মজীদ মাত্র একবারই চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার উল্লেখ করেছে। এ সব কারণে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার এ ঘটনাটি মাত্র একবারই সংঘটিত হয়েছিল, যা একমাত্র নির্ভুল কথা। এছাড়া এ বিষয়ে আরও যেসব কথাবার্তা, কিচ্ছা-কাহিনীর মত জনগনের মধ্যে প্রচলিত–যেমন 'নবী-কারীম (সাঃ) অংগুলি দ্বারা চন্দ্রের দিকে ইশারা করলেন এবং এটা দু'টুকরা হয়ে গেল, এর এক টুকরা রাসুলে কারীম (সাঃ)-এর গলার স্থান দিয়ে জামার ভিতরে প্রবেশ করলো ও হাতার মধ্য দিয়ে বের হয়ে গেল' এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা।

এখানে প্রশ্ন উঠ্তে পারে–প্রকৃত ব্যাপারটি তাহলে কি ছিল, ঘটনার আসল স্বরূপটা কি ? এটা কি কোন মুজিজা ছিল এবং মক্কার কাফিরদের দাবী অনুযায়ী রাসুলে কারীম (সাঃ) কি তাঁর রিসালতের প্রমাণস্বরূপ এটা ঘটিয়েছিলেন ? না এটি একটি হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া কোন দূর্ঘটনা ছিল? যা 'আল্লাহ্‌র' কুদ্‌রতে চন্দ্রের ওপর সংঘটিত হয়েছিল এবং রাসুলে কারীম (সাঃ) সেদিকে লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যে, এটা কিয়ামাতের সম্ভাব্যতা ও কিয়ামাতের নিদর্শন ?

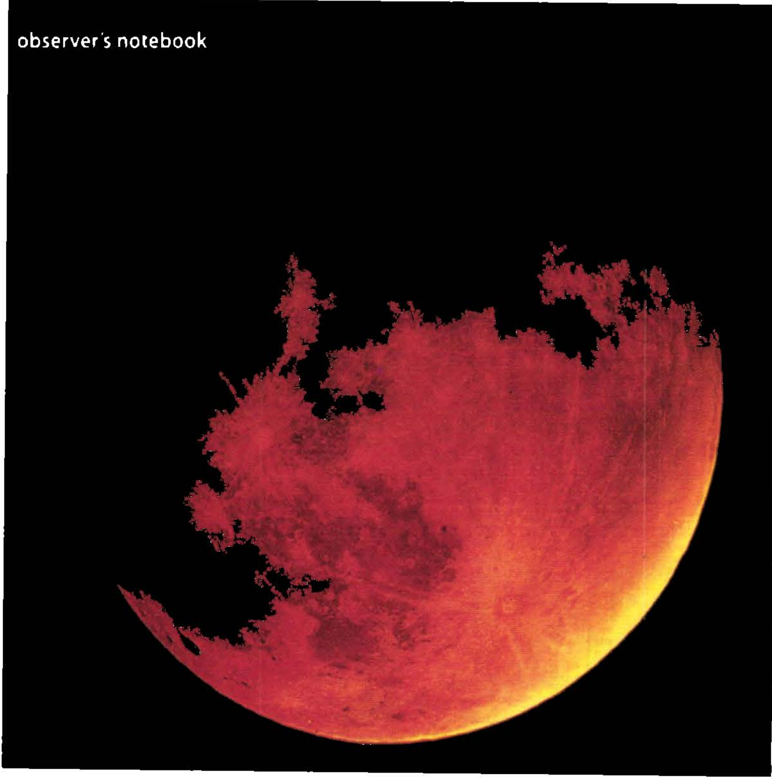
ইসলামের মনিষীদের মধ্যে বিপুলসংখ্যক লোক এ ঘটনাকে রাসুলে কারীম (সাঃ)-এর অন্যতম একটি 'মুজিজা বিশেষ' বলে গণ্য করেছেন। তাঁরা মনে করেন, এটা কাফিরদের দাবী অনুযায়ী দেখানো একটি মুজেজা। কিন্তু এ মত এমন কিছু বর্ণনার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, যা হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি ছাড়া অন্য কোন সাহাবী-ই একথা বলেননি। ইব্‌নে হাজার আসকালানী 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে লিখেছেন যে, যতসূত্রে এই ঘটনার বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে তন্মধ্যে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস ছাড়া অন্য কোন বর্ণনা-ই তাঁর চোখে পড়েনি যা মুশরিকদের দাবী অনুযায়ী চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে বলে উল্লেখিত হয়েছে। অপরদিকে আবু নয়ীম ইস্‌ফাহানী তাঁর এক গ্রন্থে হযরত

আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এ বিষয়ে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু ওটার সনদ যয়ীফ। কেননা হাদীসের গ্রন্থাবলীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে মজবুত সনদে যতগুলি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, তন্মধ্যে কোন একটিতেও এ ঘটনার উল্লেখ নেই। তাছাড়া হযরত আনাস ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ দু'জনের একজনও এ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। পক্ষান্তরে যে সকল বিশিষ্ট সাহাবী এ সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হলেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, হযরত হুযাইফা, হযরত যুবাইর ইবনে মুতয়িম (রাঃ) প্রমূখ। এঁদের একজনও একথা বলেননি যে, মক্কায় মুশরিকগণ নবীকারীম (সাঃ)-এর নবুওয়াতের সত্যতার প্রমাণ হিসোবে কোন নিদর্শনের দাবী করেছিল এবং এ উপলক্ষে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার এ মুজেজাটি তাদেরকে দেখানো হয়েছিল। সর্বাপেক্ষা বড় কথা, 'কুরআন' মজীদ নিজেও এ ঘটনাটিকে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর রিসালাতের প্রমানস্বরূপ নয়; বরং কিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়ার ভয়ংকর নিদর্শনস্বরূপ পেশ করেছে। সাথে সাথে ঘটনাটিতে নবী-কারীম (সাঃ)-এর সত্যতার একটা স্পষ্ট অকাট্য প্রমাণও ছিল এদিক দিয়ে যে, তিনি কিয়ামাতের যে আগাম সংবাদ প্রচার করছিলেন, এ ঘটনা এর সত্যতা বাস্তবভাবে প্রমাণ করেছিল।

ওপরে আলোচিত ৫৪ ঃ ১ আয়াতের বক্তব্যের স্বপক্ষে বৈজ্ঞানিক দলিল পেশ করার পূর্বেই ঘটনার আসল স্বরূপটা কি ছিল, তা আমরা আরও একটু খোলাসা করতে চাই 'কুরআনের' বক্তব্যের আলোকেই। আমরা যদি 'কুরআনের' ৬৭ ঃ ১৭, ৮২ ঃ ২, বা ৮৬ ঃ ১-৩, উক্ত ৫টি আয়াতের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহলে দেখতে পাবো সেখানে পৃথিবী ধ্বংসের ব্যাপারে সরাসরি মহাজাগতিক পাথরখন্ড (Asteroid) অথবা ধূমকেতুর (Comet) আঘাত হানার কথা বলা হয়েছে (বক্ষমান অধ্যায়ের 'গ' গ্রুপের আয়াতগুলো)। তাহলে এখানে আমাদের সামনে দিবালোকের মতই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ৫৪ ঃ ১ আয়াতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কিয়ামাতের সংবাদ তাঁর নবীর (সাঃ) মাধ্যমে পরিবেশনের সাথে সাথে তারই ছোট্ট একটি মহড়া বা প্রদর্শনী আল্লাহ্ পৃথিবীর নিকটবর্তী দৃশ্যমান জ্যোতিষ্ক চন্দ্রের উপর ঘটিয়ে থাকবেন। এই অবস্থায় আমরা আরও নিশ্চিত হতে পারি যে ঐ ঘটনাটি হয়তোবা ঘটেছিল বৃহৎ 'পাথর খন্ড' (Asteroid) দিয়ে, ধূমকেতু (Comet) দিয়ে নয়। কারণ ধূমকেতু পতিত হয়ে থাকলে তা কয়েকমুহূর্তের জন্য হতো না; বরং দীর্ঘ সময়ের জন্য হতো–কয়েক ঘন্টা আকাশে লোকেরা ধূমকেতুকে আলোক উজ্জ্বল অবস্থায় দেখতে পেতো তার বরফ ও ধূলিকণা আচ্ছাদিত পুচ্ছের জন্য। কিন্তু কোথাও

সে রকম বর্ণনার অস্তিত্ব নেই। অতএব, ওপরে উল্লেখিত ৬৭ ঃ ১৭, ৮২ ঃ ২, ও ৮৬ ঃ ১-২ আয়াতসমূহে পৃথিবী ধ্বংসের সূচনাকারী বস্তু–'পাথরখন্ড' (গ্রহানু) সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিত ধারণা লাভ করা যায়, যার ওপর আলোকপাত করে আমরা বলতে পারি যে, চন্দ্রের ওপর সংঘটিত ঘটনাটির সূচনাকারীও ঐ জাতীয় পাথরখন্ডই (গ্রহানু) হয়তোবা হয়ে থাকবে। এ সিদ্ধান্তে যে প্রশ্নের অবতারণা হয় তাহলো–'পাথর খন্ডটি' চাঁদে আঘাত করার পূর্বে এটাকে পৃথিবী থেকে দেখা যায়নি কেন ? উত্তর খুবই সহজ। চাঁদে কোন আবহমন্ডল না থাকায় যে কোন সময় যে কোন পাথর খন্ড-ই এর পৃষ্ঠদেশে নেমে আসার সময় কোন প্রকার বাধার সম্মুখীন হয় না। তাই ঘর্ষনজনিত কারণে জ্বলে-পুড়ে অগ্নিময় মূর্তি ধারণ করার প্রশ্নই আসে না, আর তাই উক্ত পাথর খন্ড যত বড়ই হোক না কেন দূর থেকে দেখাও যায় না। এবারে দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি মাথা উঁচু করে তাহলো– নবী কারীম (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ এবং মক্কায় কাফির সম্প্রদায় চাঁদের ন্যায় অপর একটি খন্ডকে চাঁদের পাশেই স্বল্প সময়ের জন্য জ্বলতে দেখলো কিভাবে? এর সঠিক জবাব বর্তমান বিজ্ঞান পেশ করেছে।

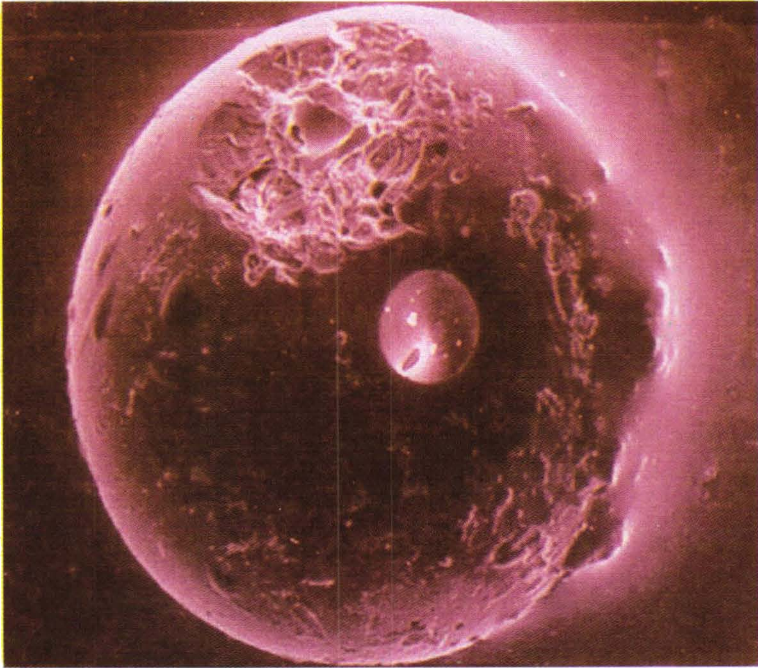
বর্তমান বিজ্ঞান আমাদের মানবসমাজ থেকে বেশ কয়েকজনকে নিয়ে চন্দ্র পৃষ্ঠে অবতরণ করাতে বাস্তবভাবে সফল হয়েছে। সাথে সাথে চন্দ্রের সর্ববিষয়ে লক্ষ-লক্ষ বাস্তব ছবি দুনিয়ার মানুষের সামনে তুলে ধরেছে। তাতে বিজ্ঞান প্রমাণ করে দেখিয়েছে চাঁদের কোন বায়ুমন্ডল নেই এবং সে কারণে চাঁদ নিজ দেহকে মহাজাগতিক পাথরখন্ড বা গ্রহানুদের সরাসরি আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে না। সমগ্র চন্দ্রপৃষ্ঠটি মহাকাশীয় পাথর এবং ধূমকেতুর আঘাতজনিত ক্ষতচিহ্ন দিয়ে ভরপুর হয়ে রয়েছে। এই ক্ষতচিহ্নমূলক অধিকাংশ পুরনো গর্তগুলো গলিত লাভা দিয়ে প্রায় ভরে আছে। চাঁদের গঠন হচ্ছে কঠিন অমশৃন মাটি ও পাথরস্তুপ দিয়ে। জলবায়ু না থাকায় ব্যাপকভাবে রুক্ষ্ম ও বন্ধুর হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞান অবহিত করছে– যখন কোন পাথরখন্ড বা গ্রহানু মহাশূন্য থেকে চাঁদের মধ্যাকর্ষণের কারনে তার পৃষ্ঠের দিকে সবেগে ছুটে আসতে থাকে তখন চাঁদে কোন বায়ুমন্ডল না থাকায় এরা বিনা বাঁধায় এতো প্রচন্ড গতিতে চন্দ্রপৃষ্ঠে আঘাত হানে যে, পতিত স্থানে কল্পনাতীত ধাক্কায় 'Fusion' পদ্ধতিতে পারমানবিক বোমার মত ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ঘটে। ফলে ব্যাপক তাপের সৃষ্টি হওয়ায় পতিতস্থানে মূহুর্তেই বিরাট অগ্নিগোলকের সৃষ্টি হয়। অগ্নিগোলকের প্রচন্ড তাপে চাঁদের শক্ত-কঠিন মাটি, পাথর সব গলে গিয়ে উত্তপ্ত লাভায় পরিণত হয়। পরবর্তীতে ঐ লাভা সৃষ্ট গর্তের কিয়দাংশ পূর্ণ করে থাকে।



চিত্রঃ ৩১

"এবং সেথায় চন্দ্রকে স্থাপন করিয়াছেন আলোকরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করিয়াছেন প্রদীপরূপে।" (৭১ ঃ ১৬)

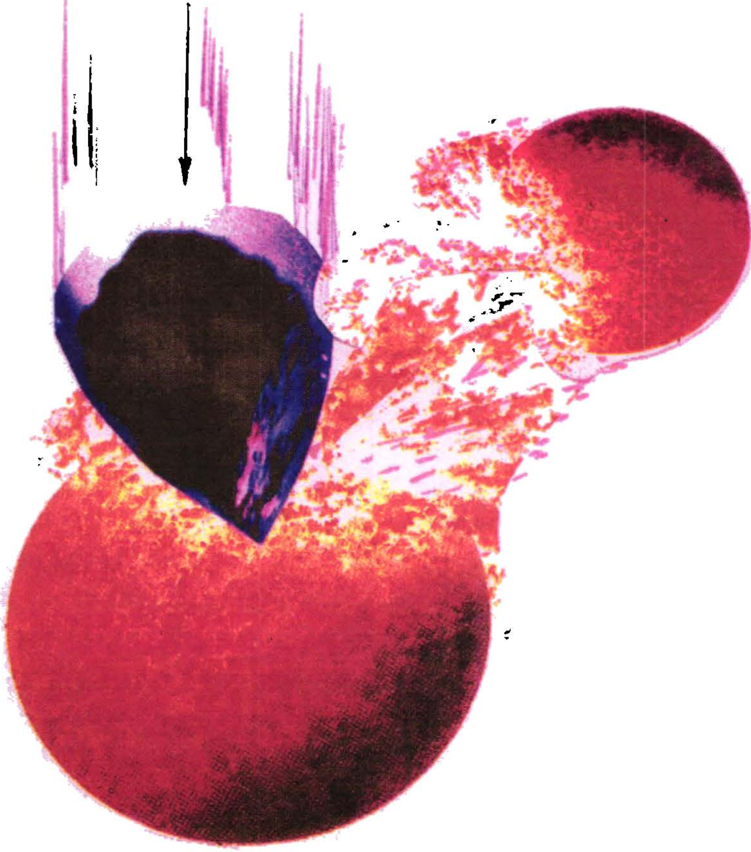
চাঁদ পৃথিবীর নিকটতম মহাকাশীয় জ্যোতিষ্ক ও প্রাকৃতিক উপগ্রহ। এর ব্যাস প্রায় দুই হাজার মাইল অর্থাৎ পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ মাত্র। পৃথিবী থেকে গড়ে প্রায় দু'লক্ষ ত্রিশ হাজার মাইল দূরে অবস্থান করছে।



চিত্রঃ ৩২

"তখন চন্দ্র হইয়া পড়িবে জ্যোতিহীন এবং যখন সুর্য ও চন্দ্রকে একই অবস্থায় একাকার করা হইবে।" (৭৫ ঃ ৮,৯)

- মহাশূন্যে ভাসমান উড়ন্ত পাথরের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত আমাদের প্রিয় চাঁদটি। দূরত্বের কারণে এর প্রকৃত দুঃখজনক চেহারা আমরা দেখতে পাইনা।



চিত্রঃ ৩৩

"কিয়ামাতের মূহুর্ত নিকটবর্তী হইয়াছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে।" (৫৪ ঃ ১)

- বড় ধরনের উড়ন্ত ভাসমান পাথরের আঘাতে চাঁদ বহুবার ক্ষত-বিক্ষত ও বিধ্বস্ত হয়েছে, ফলে চাঁদের বহু শীলাখন্ড বিক্ষিপ্ত হয়ে পৃথিবীতেও পৌছতে সক্ষম হয়েছে।

এই অবস্থায় পাথরখন্ড বা গ্রহানু অথবা ধূমকেতু চন্দ্রপৃষ্ঠে পতিত হওয়ার কারনে যদি প্রচন্ড ধাক্কার প্রতিক্রিয়ায় পতিত স্থান থেকে কোন বড় শক্ত পাথরখন্ড বা একটা পাহাড়খন্ড'দলাবদ্ধ অবস্থায় মহাকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়, তাহলে ঐ উৎক্ষিপ্ত মাটির দলাটিও 'Fusion' পদ্ধতি লাভ করে পারমানবিক বোমার মত প্রচন্ড অগ্নিগোলক সৃষ্টি করে মহাশূন্যে জ্বলতে থাকবে এবং ধাক্কায় (Thrust) প্রাপ্ত উর্ধ্বগতি শেষ হওয়া মাত্র-ই চাঁদের মধ্যাকর্ষণ বলের আকর্ষণে আবার চাঁদের পিঠে ফিরে আসবে। উল্লেখিত বর্ণনার প্রমাণস্বরূপ বহু চিহ্ন ইতোমধ্যেই বিজ্ঞানীরা চন্দ্রপৃষ্ঠে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। এ ধরণের একটি গর্তকে বলা হয় 'ক্লেভিয়াস' যার গভীরতা হচ্ছে প্রায় ২০,০০০ ফুট এবং ব্যাস হচ্ছে প্রায় ১৪৬ মাইল। অপর একটি গর্তের নাম হচ্ছে 'Tsioik Ovskh', যার ব্যাস হচ্ছে প্রায় ১৫০ মাইল। গভীরতা ও হাজার হাজার ফুট। আমরা পূর্ণচন্দ্র রাতে এর বুকের ওপর কালো গর্তের মত যে দাগটি দেখতে পাই বেশ বড় আকারে, এটাও অনুরূপ গর্ত যা 'মৃত সাগর' নামে পরিচিত, এর ব্যাস প্রায় ১,০০০ মাইল। ভাবতে পারেন কত বড় বড় আঘাতের চিহ্ন বুকে ধারণ করে অসহায় চাঁদটি আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে?

অতএব আমরা তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এক প্রকার নিশ্চিত হতে পারি যে–মক্কায় চন্দ্র সম্পর্কে যে দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে, তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, একটি বড় ধরণের পাথরখন্ডই হয়তোবা চন্দ্রপৃষ্ঠে পতিত হয়েছিল এবং আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নবীর মাধ্যমে মক্কাবাসীকে এ দৃশ্য অবলোকন করায়ে বুঝাতে চেয়েছেন পৃথিবীর ধ্বংসও যে অনুরূপ কোন এক ব্যবস্থায় ঘটানো হবে তা যেন তারা এবার বুঝতে পারে এবং তাতে বিশ্বাসস্থাপন করতে পারে ! আল্লাহ্র রাসূল ঐ সময় মক্কায় লোকদেরকে এ পৃথিবীর ধ্বংস নামক 'কিয়ামাতের' ব্যাপারে বিশেষভাবে সাবধান করছিলেন। কুরআনের বর্ণনায়ও চন্দ্র বিদীর্ণের কথার সাথে কিয়ামাতের কথা যুক্ত করে নেয়া হয়েছে।

সুতরাং সার্বিক পর্যালোচনায় ওপরের বক্তব্যই সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়।

আমরা আবার আমাদের মূল বিষয়ের গ্রুপভিত্তিক আয়াতসমূহের পর্যালোচনায় ফিরে আসি। 'ক' গ্রুপের আয়াতসমূহের শেষ পর্যায়ে 'আল্লাহ্' তা'য়ালা বলেছেন যে, পৃথিবীর মানবমন্ডলীর খুব ভালো করেই জানা দরকার



চিত্রঃ ৩৪

"তিনি তোমাদিগকে তাহার নিদর্শন দেখাইয়া থাকেন। অতঃপর তোমরা তাঁহার কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করিবে?" (৪০ ঃ ৮১)

- চন্দ্র পৃষ্ঠে বড় ধরনের পাথর খন্ডের আঘাতে বিরাট এলাকা বা বড় কয়েকটি পাহাড় প্রচন্ড আঘাতে মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে যে বিশাল গর্তের সৃষ্টি করেছে, তার মধ্যে 'ক্লেভিয়াস' গর্তটিও একটি। যার ব্যাস প্রায় ১৪৬ মাইল এবং গভীরতা প্রায় ১০,০০০ ফুট। এরূপ অসংখ্য গর্ত চন্দ্রপৃষ্ঠে ইতোমধ্যেই আবিস্কৃত হয়েছে।

যে, তাদের দুনিয়াবী জীবনের হিসেব গ্রহণ হেতু খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তা সম্পন্ন করবেন। এতে কোন সন্দেহ নেই এবং এ ঘোষনার বিন্দু বিসর্গও এদিক ওদিক হবে না। ফলে এ পৃথিবীর ধ্বংসসাধন যে সত্যি-সত্যি নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে তা আর না বললেও এতটুকুনই যথেষ্ট হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সমগ্র মহাবিশ্বের কার্যক্রমে ব্যায়িত সময়ের তুলনায় এ পৃথিবীতে মানষের আগমন এবং প্রস্থান খুবই স্বল্প সময়ের পরিসর মাত্র। হিসেব করে তা দেখলে বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

এরপর 'খ' গ্রুপের আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে যে, এ মহাপ্রলয়ংকারী 'কিয়ামাতের' বর্ণনা যা তাদেরকে শুনানো হয়েছে–তা কিন্তু শুরু হবে 'সিংগার ফুৎকারের' মাধ্যমে প্রচন্ড ও ভয়ার্ত শব্দ-নিনাদ সৃষ্টি করে। ঐ কল্পনাতীত ভয়ার্ত ও জ্ঞান হরনকারী মহানিনাদের তান্ডবে পৃথিবীর মানব সম্প্রদায় মুর্ছিত হয়ে মৃত্যু বরণ করবে। তবে যারা আল্লাহ্‌র প্রিয়, তাঁরা কিয়ামাতের আলামত ও দৃশ্য সঠিকভাবেই প্রত্যক্ষ করবে কিন্তু সকল প্রকার বিশৃংখলা ও গুরুতর আযাব থেকে তাঁরা আল্লাহ্‌র বিশেষ করুনায় রক্ষা পাবে। পরবর্তীতে হাশরের মাঠ হয়ে জান্নাতে পৌঁছাপর্যন্ত এভাবে স্রষ্টার বিশেষ ব্যবস্থায় (Protection) তাঁরা সকল প্রকার অকল্যাণ ও খারাবী থেকেও বেঁচে যাবে।

তারপর 'গ' গ্রুপের আয়াতসমূহে তিনি উল্লেখ করেছেন এই বলে যে, মানুষের উদ্যত ও সীমালংঘনমূলক আচরণে প্রতীয়মান হয়–তাদের সাথে তাদের রবের যেন এই মর্মে চুক্তি হয়েছে যে, তারা সত্যকে যতই অস্বীকার করুক, সত্য ধর্মকে যতই উপেক্ষা করুক এবং যত প্রকার অন্যায়-বিশৃংখলা ও বাড়াবাড়ি করুক না কেন তাদের প্রভু আকাশে রক্ষিত পাথরের স্তুপ থেকে তাদের ওপর পাথর নিক্ষেপ করবেন না, আসলেই কি এ রকম কোন চুক্তিতে সই করেছে ? তা না হলে তারা ঐ পাথরের আঘাতে যে কোন সময়ইতো ধ্বংস হয়ে যেতে পারে! এ ব্যাপারে কেন তারা অন্তরে ভয় পোষণ করছে না ? কিভাবে তারা এত নিশ্চিন্ততা লাভ করেছে ? অথচ পূর্বের জাতিদের ওপরে অসংখ্যবার এ জাতীয় ঘটনার নিদর্শন ঘটানো হয়েছে। সে কথা কি তারা ভুলে গেছে? অতএব, মানবসমাজের জানা দরকার পৃথিবীপৃষ্ঠে চারনরত প্রাণীকুল, উদ্ভিদকুলসহ সকলকিছুকে মুহূর্তের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন করার জন্য মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টির আড়ালে মহাকাশে-মহাশূন্যে আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন পরিভ্রমনরত অগণিত-অসংখ্য বিরাট-

বিরাট-বিরাট পাথরখন্ড অব্যর্থ মারণাস্ত্র হিসাবে মওজুদ করে রেখেছেন। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ঐ মহাকাশীয় পাথরবহর থেকে একটিমাত্র প্রমাণ সাইজ পাথরখন্ড ছুঁড়ে দিলেও তা অভিকর্ষবলের কারণে উড়ে এসে পৃথিবীকে আঘাত করলে চিরদিনের জন্য জীবনময় এ সুন্দর গ্রহটি নিকষ কালো অন্ধকার মৃত্যুপুরীতে পরিণত হবে। কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সব ঘুমিয়ে পড়বে চিরনিদ্রার ধ্বংসলীলায় ব্যাপক তান্ডবজনিত পরিবেশে। সুতরাং সবকিছু জেনে-শুনে তারপরও 'কিয়ামাতকে' অস্বীকার করা চরম বোকামী ছাড়া আর কি বা হতে পারে ?

'ঘ' গ্রুপের আয়াতগুলোতে আকাশরাজ্যে অবস্থানরত উড়ন্ত পাথরখন্ড বা গ্রহানু দ্বারা পৃথিবী আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পরবর্তী মুহূর্তের প্রচন্ড ধ্বংস জনিত আলামতের দৃশ্য পরিবেশিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে—এত প্রচন্ড শক্তিতে আঘাতকারী বস্তুটি পৃথিবীর ওপর আছড়ে পড়বে যে, তার অবর্ণনীয় ধাক্কায় পৃথিবী ভয়ংকর কম্পণে প্রকম্পিত হবে এবং সে তান্ডবে তার ভিতরের সমস্ত পদার্থ উদগীরণ করে দেবে। সমতল ভূমি ধাক্কায় কুঁচকে ভাঁজ-ভাঁজ হয়ে যাবে এবং পাহাড়গুলোর সাথে সংঘর্ষে উভয়ই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে, পাহাড়গুলো বালি-কণায় পরিণত হয়ে মহাশূন্যে উড়তে থাকবে। মানুষ তার আশা-আকাংখার সব হারিয়ে মাতাল অবস্থায় পতঙ্গের মত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে প্রাণ নিয়ে দৌড়াতে থাকবে। এ অবিশ্বাস্য বিপদ-সংকুল অবস্থা দর্শন করে গর্ভবতী নারীগণ প্রচন্ড ভয়ে গর্ভপাত করে ফেলবে, এমনকি মহিলারা নিজ কোলের দুধপানরত শিশুকেও বিপদের তান্ডবে ভুলে যাবে। ঐ অবস্থায় শুধু নিজ প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টায় ছুটতে থাকবে। ভূ-পৃষ্ঠের মানব-মন্ডলীর ওপর 'কিয়ামাতের' ধ্বংসযজ্ঞের তীব্রতার চেয়ে বেশি বিপদ আর কিছুই হতে পারে না। কারণ এ যে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে পূর্বেই সতর্ক করা এক নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত বিশেষ শাস্তি।

এরপর 'ঙ' গ্রুপের আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, ঐ সময় আঘাতকারী জ্বলন্ত জ্যোতিষ্কের প্রচন্ড ধাক্কায় সাগরের পানি তার পূর্বের স্বাভাবিক লেবেল থেকে কয়েক মাইল ওপরে উঠে আসবে এবং বর্তমানের স্থল অংশের অধিকাংশই ডুবিয়ে দিবে। এতে প্রাণীকুল ব্যাপকভাবে ধ্বংসের করাল গ্রাসে নিমজ্জিত হবে।

তারপর 'চ' গ্রুপের আয়াতে আরও উল্লেখিত হয়েছে যে—উড়ন্ত পাথরের আঘাতে পৃথিবীর যে বর্ণনাতীত ক্ষতি হবে তাতে তার বায়ুমন্ডলীয়

আবরণকে সে আর ধরে রাখতে পারবে না, ফলে পৃথিবীর 'আবহমন্ডল' তিরোহিত হবে। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে মহাবিস্তার ধূলাবালির ছাতা ওপরে উঠে যাবে এবং প্রচন্ড তাপে উত্তপ্ত হয়ে সমগ্র আকাশ জুড়ে রক্তের বর্ণ ধারণ করবে।

শেষে 'ছ' গ্রুপের আয়াতে আরও গুরুতর অবস্থার কথা প্রকাশ করে বলেছেন যে–এ মহাবিস্তার ধূলাবালির ছাতা পৃথিবীর চতুর্দিকে এমনভাবে পরিবেষ্টিত হবে যে পৃথিবী থেকে চন্দ্রকে, সূর্যকে, তারকা বা নক্ষত্র রাজিকেও আর স্পষ্ট করে দেখা যাবে না, জ্যোতিহীন বা নিস্প্রভ হয়ে যাবে। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে দীর্ঘ সময়ে উক্ত অবস্থার কারণে নেমে আসবে অন্ধকার হীম-শীতল তুষার যুগ, ঠান্ডা-বরফে ঢেকে যাবে পৃথিবী নামক গ্রহটি, ক্রমান্বয়ে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়বে বেঁচে থাকা অবশিষ্ট প্রাণীকুল। এ এক নির্ঘাত, অলংঘনীয়, অবশ্যম্ভাবী ও পূর্বনির্ধারিত ঘটনা যা মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবশ্যই ঘটানো হবে।

কুরআনের মাধ্যমে 'কিয়ামাত' বা পৃথিবী ধ্বংসের যে বর্ণনা প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অন্ধকার পরিবেশে মানবজাতিকে তাদের একমাত্র প্রভুর পক্ষ থেকে অবহিত করা হয়েছে, ওপরের সেই ভয়ংকর আলোচনাকে স্মৃতিপটে অঙ্কিত করে এবার চলুন পৃথিবীতে সম্ভাবনাময় ধ্বংসযজ্ঞ ঘটবার ব্যাপারে বর্তমান সাফল্যজনক বিজ্ঞানের সর্বশেষ রিপোর্টে, দেখি-বিজ্ঞান এই গুরুতর বিষয়ে কতটুকুন সত্য এ যাবৎ উদ্‌ঘাটন করতে সমর্থ হয়েছে।

বিজ্ঞানঃ

বর্তমান বিজ্ঞান তার সার্বিক অগ্রযাত্রায় এই মহাবিশ্ব সম্পর্কীয় প্রায় সকল কিছুর ব্যাপারেই ইতোমধ্যে প্রচুর পরিমাণ বাস্তব-সত্য তথ্য প্রদান করতে সমর্থ হয়েছে। আমাদের এই সুন্দর-সবুজ-শ্যামলীমায় পরিপূর্ণ নয়নাভিরাম পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এর শেষ পরিণতি সম্পর্কেও যথেষ্ট প্রমাণিত তথ্য সরবরাহ করে ধন্যবাদ অর্জন করার মত অবস্থান লাভ করেছে।

বর্তমান অগ্রসরমান বিজ্ঞান পূর্বের সকল প্রকার খেয়ালী এবং কাল্পনিক চিন্তাধারাকে নস্যাৎ করে দিয়ে খুবই আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়করভাবে সৃষ্টিতত্ত্বঃ 'Big-Bang model' অবতারণা করে প্রমাণ করেছে যে এই মহাবিশ্ব এবং তার আভ্যন্তরীণ সকল কাঠামো একটা নির্দিষ্ট সময়ের

ব্যবধানে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি হয়েছে। আর যেহেতু সৃষ্টি হয়েছে, অতএব তার একদিন নিশ্চিত ধ্বংস সাধনও ঘটবে। থার্মোডায়নামিকস্ (Thermodynamics) বা তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় আইনও প্রমাণ করছে যে মহাবিশ্বে তাপীয় বস্তু থেকে তাপ বা উষ্ণতা অনবরত তুলনামূলক কম তাপীয় বস্তুতে স্থানান্তরিত হচ্ছে। এতে প্রমাণিত হয় মহাবিশ্বে বর্তমান যত প্রকার তাপীয় উৎস রয়েছে এরা একদিন তাপ বিতরণ করতে করতে নিঃশেষ হয়ে গিয়ে মহাবিশ্বকে ধ্বংসের গহবরে নিক্ষেপ করবে। তাই বর্তমান বিজ্ঞানবিশ্ব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, পৃথিবী সকল কিছুই একটি নির্দিষ্ট সময়ে অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। মহাকাশ পর্যবেক্ষণে রত টেলিস্কোপ প্রযুক্তির (Telescope technology) দিন দিন চরম উৎকর্ষতার কারণে ইতোমধ্যেই বিজ্ঞানীগণ সরাসরি সুপার নোভা বিস্ফোরন (Super nova), একাধিক গ্যালাক্সীর পারস্পরিক সংঘর্ষ, ব্ল্যাক হোলের পিলে চমকানো তান্ডব, ধূমকেতুর পতনে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ইত্যাদি মারাত্মক বিষয়গুলো দর্শনলাভ করে এবং তাদের বাস্তব ছবি সংগ্রহ করে ধরাপৃষ্ঠে বর্তমান মানবমন্ডলীর বিশ্বাসের রাজ্যকে দৃঢ় করতে সমর্থ হয়েছেন যে, মহাবিশ্বের সকল কিছুই ক্রমান্বয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তবে প্রতিটি জিনিসের ধ্বংসের জন্য কি ব্যবস্থা হবে তা নির্দিষ্ট করে বলতে না পারলেও প্রত্যেকটি ব্যাপারেই বেশ কিছু চিহ্ন তুলে ধরেছেন।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মহাজাগতিক নিয়মে পৃথিবী ধ্বংসের আপাততঃ প্রমাণিত ব্যবস্থাসমূহ হচ্ছেঃ

(১) সৌরজগতের প্রাণ নামক 'সূর্যের' ধ্বংসের কারনে,

(২) 'ধুমকেতুর' পতনের মাধ্যমে,

(৩) বড় আকারের 'গ্রহানু' পতনের মাধ্যমে,

(৪) 'সুপারনোভা' বিস্ফোরণের কারণে,

(৫) 'ব্ল্যাকহোলের' মাধ্যমে,

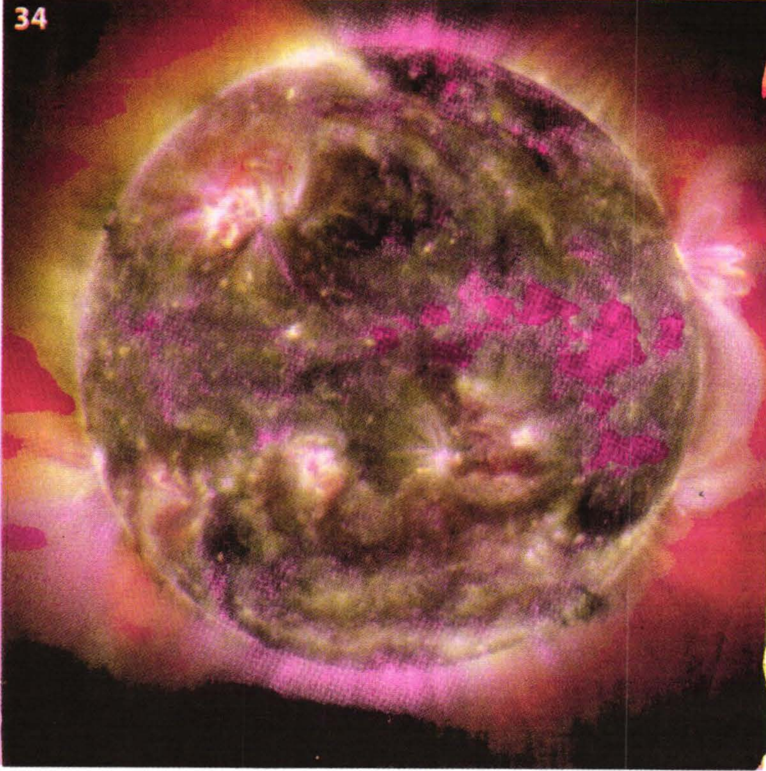
(৬) একাধিক নক্ষত্রের সংঘর্ষের কারণে,

(৭) একাধিক গ্যালাক্সীর 'সংঘর্ষের' কারণে,

(৮) এবং সমগ্র গ্যালাক্সীর 'শূন্যের কোঠায়' গমনে।

সূর্যের ধ্বংসের কারণে ঃ প্রতিটি সৌরজগতেই গ্রহ-উপগ্রহসমূহ সূর্যের উপরই পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে তাদের জীবন পরিক্রমা (Life Sycle) পরিচালনা করে যাওয়ার কারণে সূর্য (নক্ষত্র) যখন বিষ্ফোরন ঘটিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তখন তার মহাকর্ষ বলে (Gravity) আবদ্ধ গ্রহসমূহ তাদের উপগ্রহসহ ধ্বংসের মুখে নিপতিত হয়। সূর্যই যেখানে গ্রহদের জীবন-মরনের জন্য সবচেয়ে বেশি জিম্মাদার, সেখানে সূর্যের ধ্বংসের পরে কি করে তারই অধিনস্ত সৌরজগত টিকে থাকতে পারে জীবন্ত সৌরভে? প্রকৃত পক্ষে সূর্যের আভ্যন্তরীণ জ্বালানী সংকট শুরু হওয়ার সাথে সাথে সূর্যের তাপমাত্রা যখন পূর্বের তুলনায় বাড়তে থাকে, তখন জ্বালানী সংকটের জন্য এর কেন্দ্রে পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থার চাইতে শক্তি (Energy) কম উৎপন্ন হওয়ায় কেন্দ্র থেকে বহির্মূখী চাপ বহুলাংশে হ্রাস পায়। ফলে কেন্দ্রমূখী 'মধ্যাকর্ষণ বল' মাত্রাতিরিক্ত প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ পেয়ে যায়। যার জন্য সূর্যের পৃষ্ঠদেশ চতুর্দিক হতে প্রচন্ড শক্তিতে ভেঙ্গে-চুরে কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হতে থাকে। এতে নক্ষত্রের 'কেন্দ্র' বা 'কোর' (Core) নতুনভাবে ব্যাপকহারে জ্বালানী লাভ করে পূর্বের তুলনায় কয়েকগুন বেশি এনার্জি (Energy) উৎপাদন করতে থাকে। এ অবস্থায় নক্ষত্রের তাপমাত্রা পূর্বের স্বাভাবিক স্কেল থেকে ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাওয়ায় সৌরপরিবারের জীবনময় গ্রহগুলো আর সবুজ-সতেজ ও প্রাণবন্ত থাকতে পারে না। ব্যাপক তাপের কারণে ক্রমান্বয়ে জ্বলে-পুড়ে লাল মরুদ্যানে রূপান্তরীত হয়। জীবনের স্পন্দন প্রচন্ড দাবদাহে চিরতরে মিলিয়ে গিয়ে নিরেট শশ্মানভূমিতে পরিণত হয়, যা একপ্রকার ধ্বংসেরই নামান্তর। চূড়ান্ত ধ্বংস ঘটে নক্ষত্র লাল দানবে (Red giant) পরিণত হলে, তখন তার বৃদ্ধিজনিত বিরাট দেহের আয়তন গ্রহ-সমূহের কক্ষপথ পর্যন্ত প্রসার লাভ করলে ঐ অবস্থায় গ্রহসমূহ আর তাদের স্বতন্ত্র ঐতিহ্য ধরে রাখতে না পেরে নক্ষত্র দেহের সাথে একাকার হয়ে লীন হয়ে যায়। যদি কোন কারনে এই করুণ দশা থেকে কোন গ্রহ বেঁচেও যায় তাহলেও খুব বেশি দিন কিন্তু টিকে থাকতে পারে না। এর কিছুদিন পর-ই লাল দানব (Red giant) নামক নক্ষত্র বিষ্ফোরনের কারণে গ্রহসমূহ নিজ নিজ কক্ষপথে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে মহাকাশে মিলিয়ে যায়।

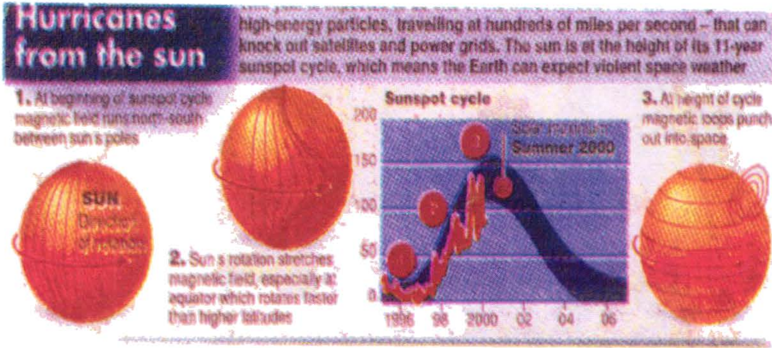
বর্তমান বিজ্ঞান ২০০০ সালের প্রথম সপ্তাহে পৃথিবীর মানবমন্ডলীকে নিজ মাতৃগ্রহ এই 'পৃথিবীর' ব্যাপারেও ওপরে বর্ণিত সৌরপরিবারের মৃত্যু পথের

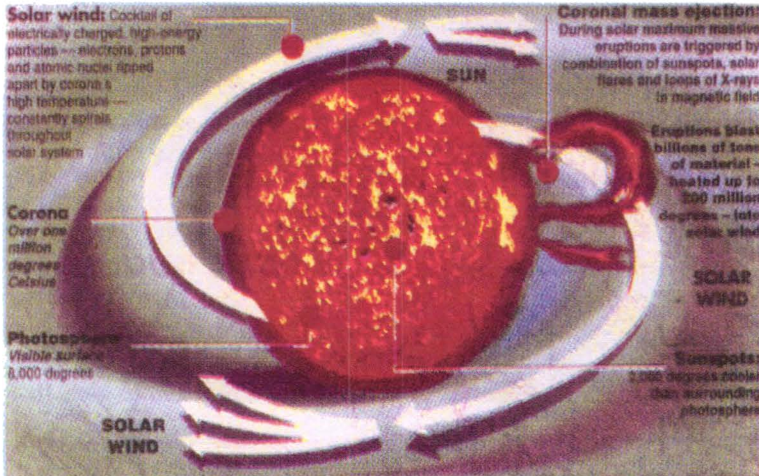


চিত্রঃ ৩৫

"তিনিই তোমাদিগের কল্যানে নিয়োজিত করিয়াছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যাহারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদিগের কল্যানে নিয়োজিত করিয়াছেন রাত্রি ও দিবসকে।" (১৪ ঃ ৩৩)

- আমাদের সৌরজগতের প্রাণ কেন্দ্র হচ্ছে এই সূর্যটি। পৃথিবী জীবন্ত থাকা যেমনি সূর্যের উপর নির্ভরশীল, তেমনি সূর্যের ধ্বংসের সাথে সাথে পৃথিবীও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

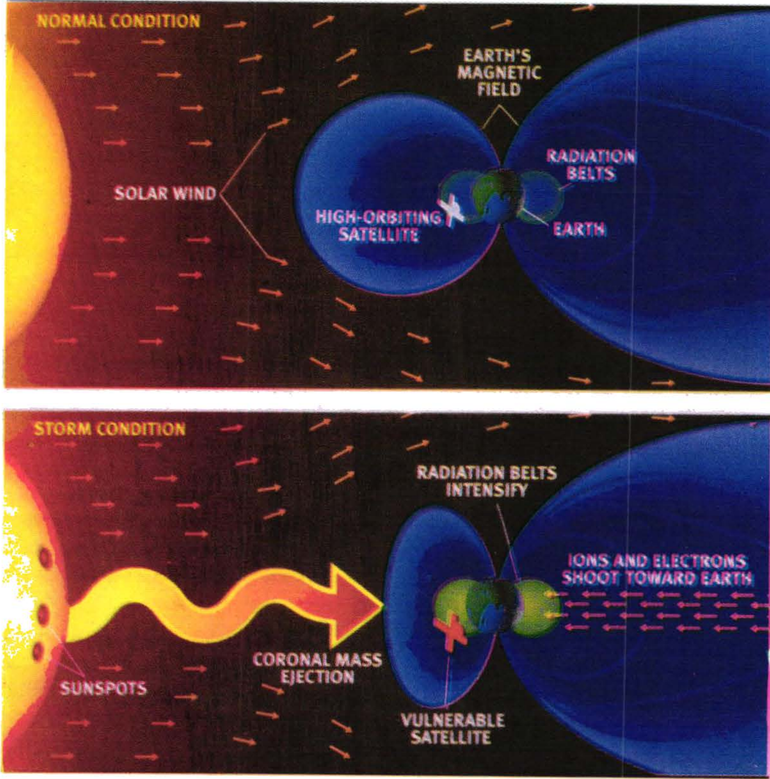




চিত্রঃ ৩৬

> *"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যবর্তী সকল কিছুই আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্টকালের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি।" (৪৬ ঃ ৩)*

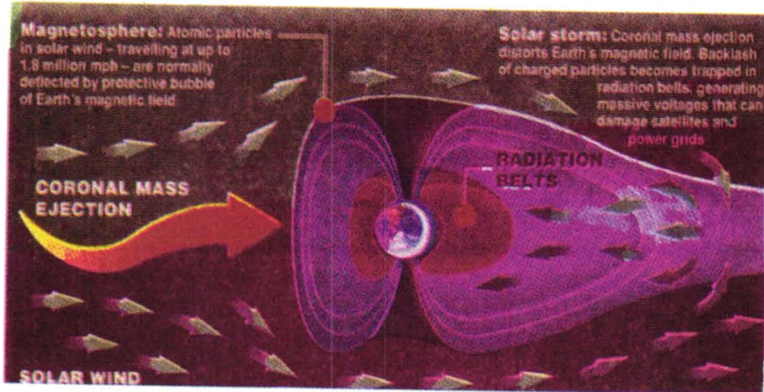
'- সূর্য থেকে নির্গত 'সোলার উইন্ড' (Solar Wind) প্রতিনিয়ত পৃথিবীকে উত্তাপ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখছে।

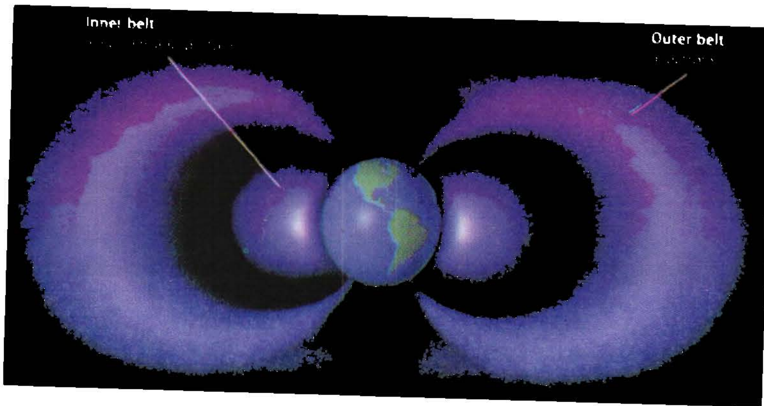


চিত্রঃ ৩৬

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা তাঁহারই। সকলেই তাঁহার আজ্ঞাবহ।" (৩০ ঃ ২৬)

- ১৯৯৭ সাল থেকে আমাদের সূর্যটি পূর্বের তুলনায় ক্রমান্বয়ে তাপবৃদ্ধি ঘটিয়ে ২০০০ সালে স্মরণকালের সর্বোচ্চ উষ্ণতার রেকর্ড প্রদর্শন করে, যা এর ধ্বংসের পূর্ব আলামত বলে বিজ্ঞানীগণ মত প্রকাশ করেছেন।

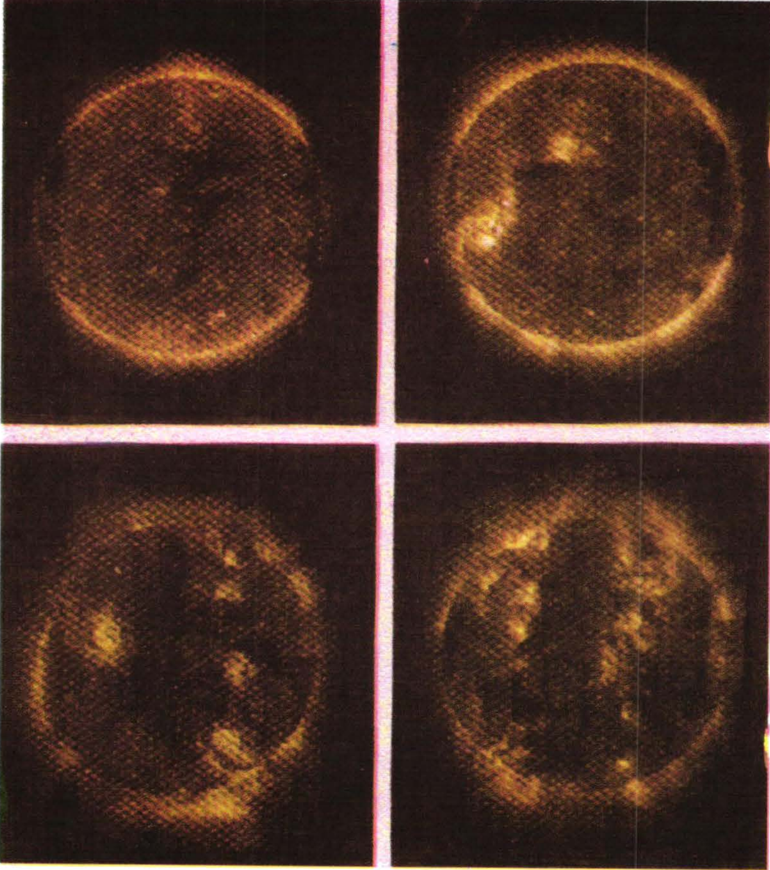




চিত্রঃ ৩৭

"উহারা কোন নিদর্শন দেখিলে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং বলে, ইহাতো চিরাচরিত যাদু।" (৫৪ ঃ ২)

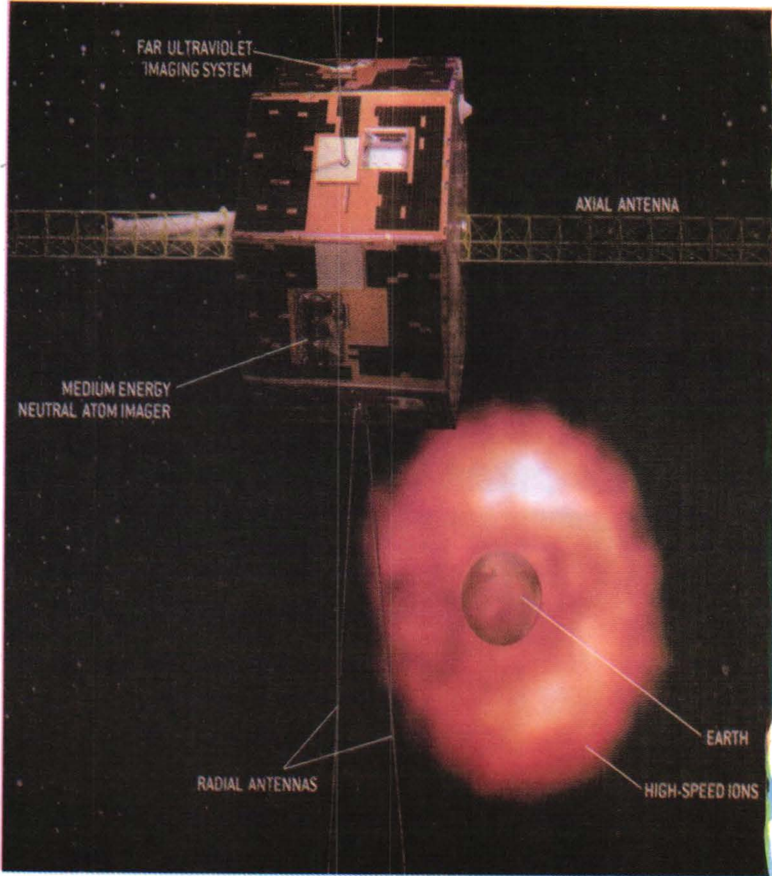
- সূর্য থেকে উত্তপ্ত নির্গত 'Solar Wind' প্রায় ২০০ মিলিয়ন ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা প্রদর্শন করে থাকে। ২০০০ সালে যা পৃথিবীর জন্য মারাত্মক ছিল।



চিত্রঃ ৩৮

"প্রত্যেক সংবাদ প্রকাশের নির্দিষ্ট সময় রহিয়াছে।" (৬ ঃ ৬৭)

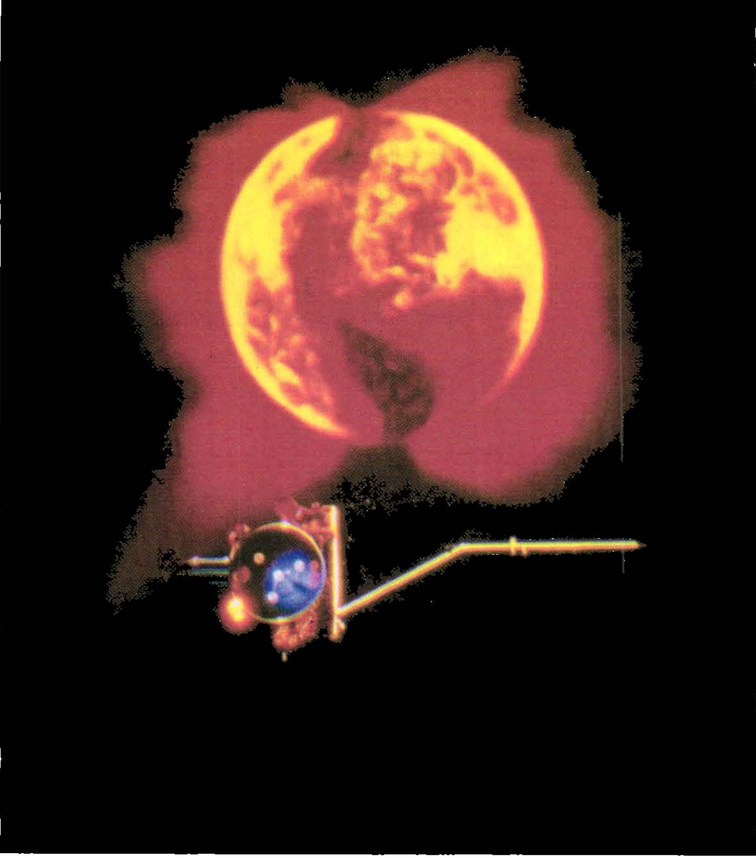
- ওপর থেকে ক্রমান্বয়ে ডানদিকে (ঘড়ির কাটার মত) ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সূর্যের ৪টি ছবিতে চার পর্যায়ের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দেখানো হয়েছে। ২০০০ সালে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিল। বিষয়টি মানবজাতির জন্য সমূহ বিপদের আভাস বৈ-কি।



চিত্রঃ ৩৯

"মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু উহারা উদাসীনতায় মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে।" (২১ ঃ ১)

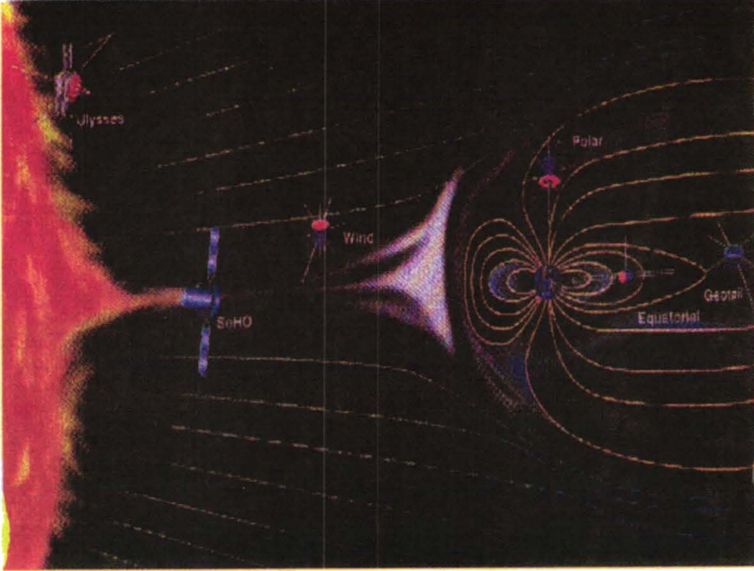
- সূর্য থেকে নির্গত 'সোলার উইন্‌ডে' ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন কনিকাসহ বিভিন্ন প্রকার সাব এ্যাটোমিক পার্টিকেল্‌স পৃথিবীর আবহমন্ডলকে বিপর্যস্ত করে প্রাণীকূলের আভাসযোগ্যতাকে ধ্বংসের মুখে নিপতিত করে থাকে। অতএব সূর্যের অস্বাভাবিক অবস্থা প্রকাশে পৃথিবীবাসীকে 'কিয়ামাতের' কথাই স্বরণ করিয়ে দেয়।



চিত্রঃ ৪০

"সূর্য এবং চন্দ্র (মহান আল্লাহর) গণনায় নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে।" (৫৫ ঃ ৪)

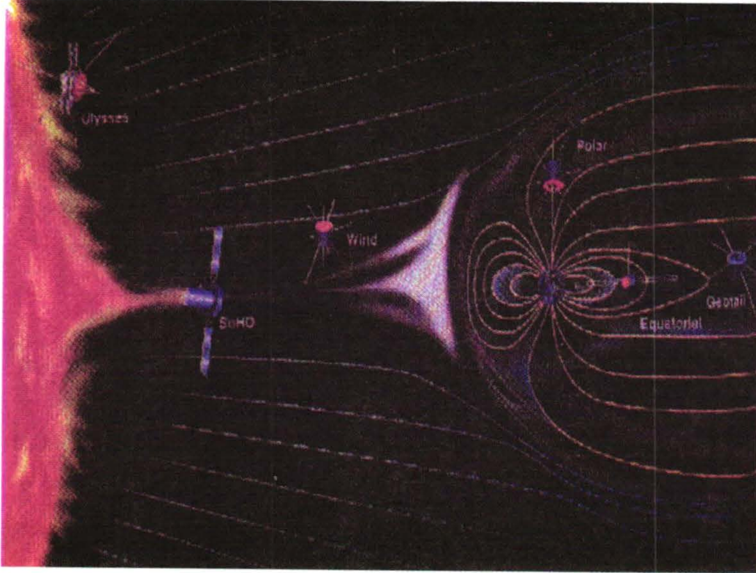
- নক্ষত্রটি তার ধ্বংসের পূর্ব মূহুর্তে প্রচন্ড উত্তপ্ত Solar Wind এবং coronal mass নির্গত করার ফলে পৃথিবীর বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের মাঝে ব্যাপক বিপর্যয় ঘটে এবং radiation bellt-এর তাপমাত্রা কল্পনাতীত হারে বৃদ্ধি পেয়ে (Generating massive voltage) কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহ ও পাওয়ার গ্রীডের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। হয়তঃ একসময় এই Solar Wind পৃথিবীকে পুড়িয়ে পরিণত করবে মরুদ্দানে।



চিত্রঃ ৪১

"ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।"
(১৪ ঃ ৫)

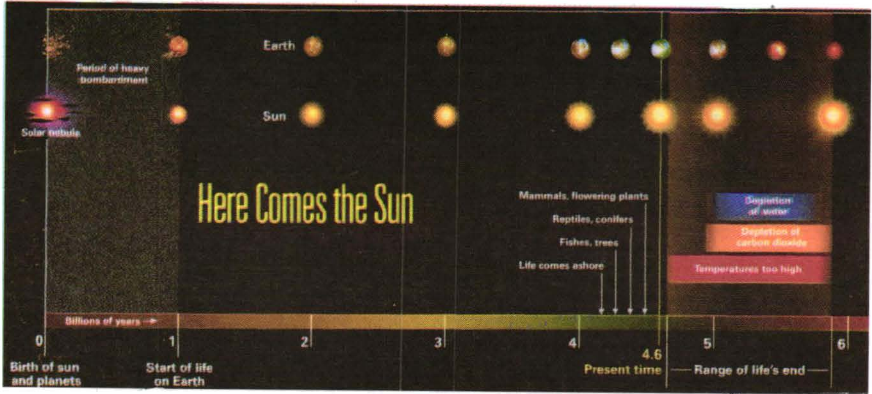
- বিজ্ঞান তার সর্বশেষ উন্নততর প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝামাঝি কক্ষপথে 'SOHO' সেটেলাইটকে ব্যবহার করে সূর্যের প্রতিমূহুর্তের তৎপরতা পর্যবেক্ষন করছে। সাথে সাথে পৃথিবীবাসীকেও সতর্ক করে যাচ্ছে। বর্তমান বিজ্ঞানের এ এক বড় ধরনের সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, কেননা সৌরজগতের কেন্দ্র বা প্রাণরূপ ভয়ংকর তেজস্ক্রিয়তা সম্পন্ন সূর্যের অনেক নিকট থেকে উক্ত স্যাটেলাইট দিয়ে এর জীবন পরিক্রমা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ন তথ্য ও বাস্তব ছবি লাভ করা সম্ভব হচ্ছে।



চিত্রঃ ৪২

"বস্তুত চক্ষুতো অন্ধ নয়, অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়।" (২২ ঃ ৪৬)

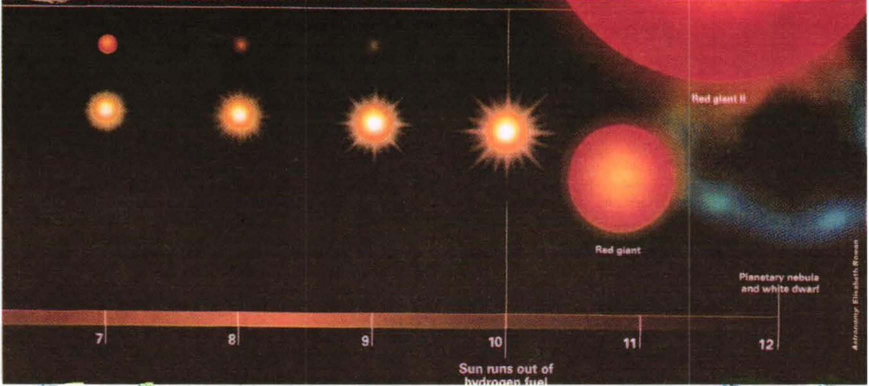
- বিজ্ঞানের বর্তমান অগ্রযাত্রায় আবিস্কৃত ও মহাশূন্যে সংস্থাপিত বিভিন্ন প্রকার স্যাটেলাইটসমূহ মহাবিশ্বের অসংখ্য অজানা রহস্য উন্মোচন করে পৃথিবীপৃষ্ঠে মানবসমাজের হাতে তথ্য ও ছবি সফলভাবে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছে। ফলে মানবসমাজ উপকৃত হচ্ছে অতীতের তুলনায় অনেক বেশি। ছবিতে স্যাটেলাইটটি সূর্যের যে পরিমাণ দূরত্বে থেকে তথ্য ও ছবি ধারণ করছে মানুষের পক্ষে স্ব-শরীরে তা কখনোই সম্ভবপর নয়। সূর্যের ধ্বংসের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রলয় সম্পর্কীয় তথ্য লাভে স্যাটেলাইটের বিকল্প নেই।



চিত্রঃ ৪৩

"যখন সূর্য জ্যোতিহীন ও নিস্প্রভ হইয়া যাইবে, যখন জ্যোতিষ্কসমূহ অন্ধকারে নিমজ্জিত হইবে।" (৮১ ঃ ১, ২)

- সূর্য তার সৃষ্টিক্ষণ থেকে সময়ের সাথে সাথে আভ্যন্তরীন জ্বালানী (হাইড্রোজেন) পুড়িয়ে নিঃশেষ করে করে ক্রমান্বয়ে চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে কেবলই এগিয়ে যাচ্ছে। ফলে একসময় তাপমাত্রা ভয়ানকরূপে বৃদ্ধির কারণে সবুজ পৃথিবী পর্যায়ক্রমে পুড়ে লাল হয়ে যাবে এবং তাতে সকল প্রাণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, আমাদের সূর্যটি বর্তমান যে অবস্থানে আছে, তাতে আর স্বল্পসময় পরেই এর থেকে নির্গত প্রচন্ড তাপের কারণে সবুজ পৃথিবী পুড়ে লাল মরুদ্যানে পরিণত হতে শুরু করবে। বিষয়টি বর্তমান বিজ্ঞানীদেরকে ভাবিয়ে তুলেছে।



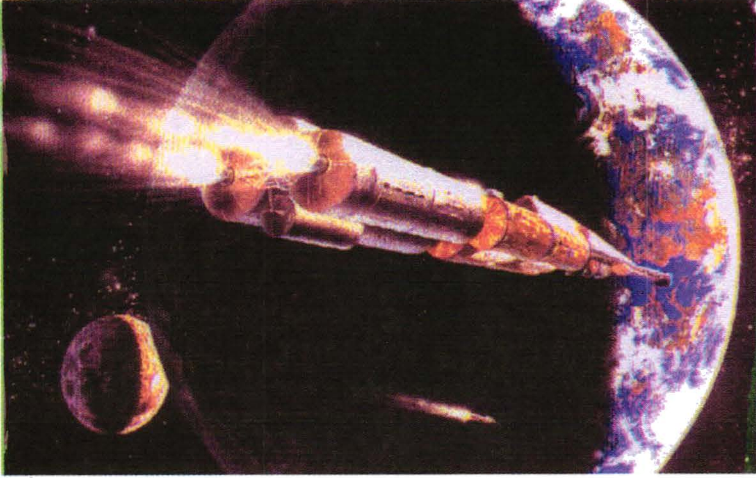
চিত্রঃ ৪৪

"যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একই অবস্থায় একাকার করা হইবে।" (৭৫ ঃ ৮)
"যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হইয়া যাইবে।" (৭৭ ঃ ৮)

- সূর্যের জ্বালানী সংকটের কারনে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে একদিকে সূর্যের যেমন আয়তনে যেমন বৃদ্ধি ঘটবে, তেমনি অপরদিকে পৃথিবীসহ নিকটবর্তী সকল গ্রহব্যবস্থা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। জীবনময় গ্রহ শ্মশানে পরিণত হবে। এক পর্যায়ে সূর্যটি 'লাল দানব'-এ পরিণত হয়ে অবশেষে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং সৌর ব্যবস্থার বাকী গ্রহ ব্যবস্থাও তাতে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ছবিতে সেই ধারাবাহিকতা দেখানো হয়েছে। সূর্যের জীবন পরিক্রমা সম্পর্কে পূর্বে সূর্য বিজ্ঞানীদের সরবরাহকৃত তথ্য বর্তমান পরিবেশে এসে পাল্টে গেছে। তারা বলেছিলেন সূর্যটি আরও সাড়ে চার'শ কোটি বছর পর্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই সৌরজগতকে তাপ বিতরণ করে যাবে। কিন্তু ১৯৯৭ সাল থেকে সূর্যের অস্বাভাবিক আচরণ ও ব্যাপক তাপ বিকিরণের কারণে বর্তমান বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে সূর্যটি আর মাত্র প্রায় এক'শ কোটি বছরের মধ্যেই বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত হবে এবং সৌর পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দিবে।

কাহিনীর অনুরূপ গুরুতর তথ্য পেশ করে ইতোমধ্যেই জ্ঞানী সমাজে একরাশ হতাশার গন্ধ ছড়িয়ে গেছে। ১৯৯৭ সাল থেকে বিজ্ঞানীগণ বিস্ময়করভাবে লক্ষ্য করছেন যে, আমেরিকান স্পেস সেন্টার 'NASA' কর্তৃক 'SOHO' স্যাটেলাইট আমাদের সূর্যের উপর পরিচালিত গবেষণায় যে তথ্য ইদানিং পেশ করেছে তাতে পূর্বের চিন্তাধারা (আমাদের সূর্য আগামী আরও ৪৫০০ কোটি বছর পর্যন্ত প্রায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বর্তমানের মতই তাপ উৎপন্ন ও বিতরণ করে সৌর পরিবারকে টিকিয়ে রাখবে) কে ম্লান করে দিয়ে ঘোষণা করেছে যে আমাদের সূর্য তার শেষ পরিণতির চিহ্ন প্রকাশ করতে শুরু করেছে। ১৯৯৭ সাল থেকে ক্রমান্বয়ে তাপমাত্রা ভয়ানকভাবে বাড়িয়ে বর্তমান ২০০১ সাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী মানব সমাজে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। সূর্যবিজ্ঞানীগণ 'SOHO' স্যাটেলাইট দিয়ে সূর্যের নিকটবর্তী স্থান থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পর ইতোমধ্যেই নতুনভাবে তথ্য প্রকাশ করেছেন যে ১৯৯৭ সাল থেকে পরবর্তী এই কয়টি বৎসরে সূর্যের গড় তাপমাত্রা ব্যাপকহারে বেড়ে গিয়ে যে 'Red signal' প্রদর্শন করছে, তাতে আগামী ১০০ কোটি (১ বিলিয়ন) বছরের মধ্যেই পৃথিবী নামক এ গ্রহের জীব-জগত, উদ্ভিদ জগত ও প্রাণীজগত সূর্যের প্রচন্ড তাপের (Radiation) কারণে জ্বলে-পুড়ে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সমগ্র পৃথিবী হয়ে পড়বে অগ্নিদগ্ধ লালচে একটি বস্তুপিন্ডে যা দর্শন করে মনেই হবে না যে মহাজাগতিক কোন এক শুভক্ষণে এর পৃষ্ঠে বিচিত্র জীবনের সমারোহ বিরাজিত ছিল ! শুনতে ভয়ে অন্তর আঁতকে উঠে তাই নয় কি ? অবস্থা আমাদের যাই হোক - মহাকাশীয় বস্তুদের 'লাইফ সাইকেল' কিন্তু এ কথার-ই সাক্ষ্য বহন করছে। বিজ্ঞানীগণ ইতোমধ্যেই মহাকাশে অসংখ্য নক্ষত্রের ধ্বংস প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাদের ছবিও 'Hubbele Space Telescope'-র মাধ্যমে আমাদের নিকট সরবরাহ করতে সমর্থ হয়েছেন। আরও শুনে আশ্চর্য হবেন যে, বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীর বর্তমান নাজুক অবস্থার কথা বিবেচনা করে প্রতিবেশী অন্য কোন জীবনময় সৌরজগতে মানুষগুলোকে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরের ব্যাপক চিন্তা-ভাবনা ইতোমধ্যেই শুরু করে দিয়েছেন। আমরা যথাস্থানে এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনার প্রয়াস পাবো।

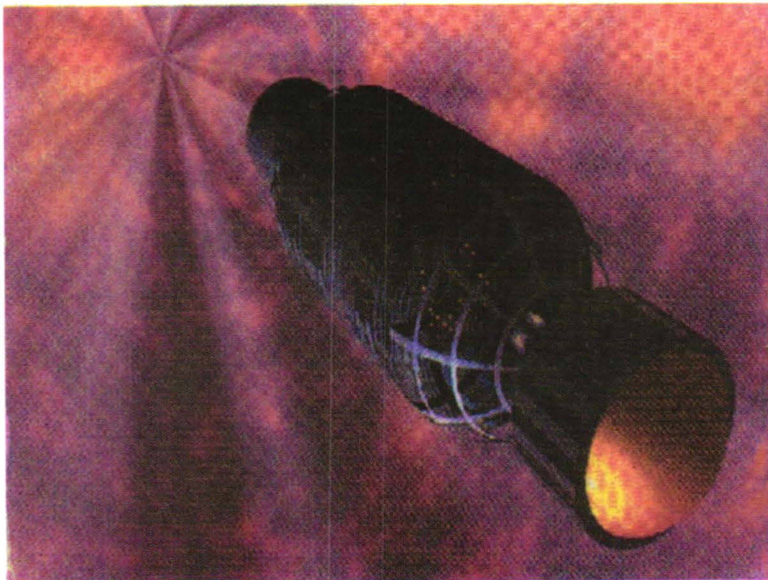
বিজ্ঞানের একেবারে টাট্‌কা এই গুরুতর তথ্য আমাদের জ্ঞানরাজ্যকে দারুণভাবে নাড়া না দিয়ে কি পারে ? পৃথিবীসহ সকলকিছুই সৃষ্টি হয়েছে এবং নির্দিষ্ট সময়ে ক্রমান্বয়ে এক এক করে সবই যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে তা-কি



চিত্রঃ ৪৫

"তাঁহার অন্যতম নিদর্শন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এই দুইয়ের মধ্যে তিনি যে সকল জীবজন্তু ছড়াইয়া দিয়াছেন সেইগুলি, তিনি যখন ইচ্ছা তখনই উহাদিগকে সমবেত করিতে সক্ষম।" (৪২ ঃ ২৯)

- 'কুরআন' এবং 'বিজ্ঞান' উভয়ই দাবী জানাচ্ছে যে মহাবিশ্বের সর্বত্র জীবনময় জগত রয়েছে। আর তাই বিজ্ঞান আমাদের সূর্যের বিপদ সংকেত দর্শনে ভীত হয়ে পৃথিবীর মানুষগুলোকে অন্যকোন জীবনময় গ্রহে স্থানান্তরের চিন্তা করছে। যদিও সম্ভাবনা এখনও একেবারে ক্ষীণ। কেননা ইতোমধ্যে জীবনময় বা আবাসযোগ্য গ্রহ নিকটবর্তী কোন সৌর পরিবারে অবিস্কৃত হয়নি এবং স্থানান্তরের জন্য আলোর গতি সম্পন্ন অথবা তার কাছাকাছি গতিসম্পন্ন আকাশযান এখনও তৈরী হয়নি অথচ এ ধরনের পরিকল্পনায় আলোর গতিসম্পন্ন যানও দূরত্বের বাস্তবতার কারণে অসহায় বলে বিবেচিত হতে বাধ্য।



চিত্রঃ ৪৭

"আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন সপ্তাকাশ এবং অনুরূপ পৃথিবীও। উহাদের মধ্যেও অবতীর্ণ হয় তাঁহার আদেশ। ইহা এইজন্য জানানো হইল যে, যেন তোমরা বুঝিতে পার আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্ব শক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ্ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন।" (৬৫ ঃ ১২)

- মহাবিশ্বের মহাশূন্যতায় বিশাল দূরত্ব পাড়ি দিয়ে পৃথিবীবাসীকে সূর্যের ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার চিন্তায়, অন্যকোন গ্রহে পৌঁছাবার নিমিত্তে বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন মডেলে আকাশযান (Space Ship) তৈরীর পরিকল্পনা করছে। যদিও জীবনময় কোন গ্রহ এখনও আবিষ্কার হয়নি। পৃথিবীর মানব সম্প্রদায়ের উক্ত চিন্তা ও পরিকল্পনা কতটুকুন বাস্তবসম্মত ও ফলপ্রসূ হবে আগত দিনগুলিই তা বলে দিবে। বিষয়টি নিঃসন্দেহে বর্তমান বিজ্ঞানের জন্য যে এক বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

আর বর্তমানে অস্বীকার করা যায় ? ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সবাই তার গন্তব্যের পানে (পরিনতির দিকে) অগ্রসরমান, কে রুখতে পারে বিধাতার এই অপ্রতিরোধ্য বিধান?

ধূমকেতু পতনের মাধ্যমেঃ ১৯৫০ সালে ডাচ এ্যাসট্রোনোমার 'Jan H. Oort' সর্বপ্রথম 'Oort cloud' সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে অবহিত করেন, যা সৌরজগতের চতুর্দিকে প্রায় ৩.২৫X ২.৫ আলোকবর্ষ জায়গা নিয়ে বিস্তৃত। বর্তমান বিজ্ঞানীদের মতে উক্ত 'Oort–cloud'-ই ধূমকেতুদের স্থায়ী আবাসস্থল বা সৃষ্টির উৎস। এরাও আমাদের সৌরজগতের অধিবাসী। তাই সূর্যের অভিকর্ষবলের আকর্ষণে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে এসে গ্রহদের ন্যায় সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলে যায়। এদের চলার পথ বড়ই উপবৃত্তাকার। প্রতি বৎসরই কম-বেশি ৪/৫টি ধূমকেতু সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে থাকে। ধূমকেতুদের মধ্যে দু' ধরণের সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে, যেমন-'Short period comet' ও 'long period comet'.

'ধূমকেতুর' (Comet) প্রধান অংশ হচ্ছে এর 'নিউক্লিয়াস' (Nucleus) যা মূলত বরফ দিয়ে এবং তার ওপর পানির কণা, কার্বন ডাই অক্সাইড, এ্যামেনিয়া, মিথেন এবং ধূলাবালি মিশ্রিত অবস্থায় ঢাকা থাকে। উক্ত 'নিউক্লিয়াস' মাত্র কয়েক মাইল বা কিলোমিটার ব্যাসসম্পন্ন হয়ে থাকে, কিন্তু এর সম্মূখে সৃষ্ট 'Coma'- গ্যাস এবং ধূলাবালির সাথে সূর্যরশ্মির (Sun light) reflection – এর কারণে এত বেশী উজ্জলতা ছড়ায় যে এর জন্য ধূমকেতু মাত্র কয়েক মাইল ব্যাস হওয়া সত্বেও বহুগুণ বড় দেখায়। সূর্যের নিকটে আসা মাত্র এদের শরীর থেকে যে ধূলা-বালি ও গ্যাস নির্গত হয় তা সূর্যরশ্মির সাথে পূর্বের ন্যায় একইভাবে Reflect করে বিধায় এদের পিছনে লম্বা লম্বা 'ডাষ্ট টেইল' (Dust tail) এবং গ্যাস টেইল (Gas tail) পরিলক্ষিত হয়। এ পর্যন্ত প্রায় ১০০০-র মত 'ধূমকেতু' সনাক্ত করা সম্ভবপর হয়েছে। এদের মধ্যে বেশ নাম করা কয়েকটি হচ্ছে Comet Hale, Hyakntake, Hale Bopp ইত্যাদি।

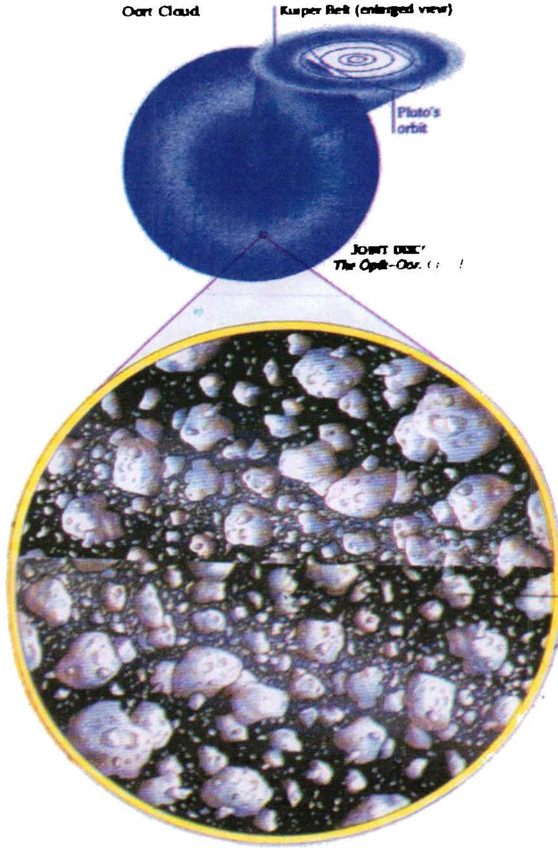
সম্প্রতি বিজ্ঞানীগণ হিসেব করে দেখিয়েছেন যে, 'Oort – cloud-এর Outer region-এ প্রায় ১০০ বিলিয়ন থেকে ১ ট্রিলিয়ন 'ধূমকেতু' বাস করে এবং Inner region-এ প্রায় ৫০০ বিলিয়ন থেকে ১ ট্রিলিয়ন



চিত্রঃ ৪৮

"আমরা চাহিয়াছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করিতে কিন্তু আমরা দেখিতে পাইলাম কঠোর প্রহরী ও পাথর-উল্কাপিন্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ।" (৭২ ঃ ৮)

- ডাচ বিজ্ঞানী জন ওর্ট (Jan Oort) ও বিজ্ঞানী Erast Opik পঞ্চাশের দশকে সৌরজগতের চতুর্দিকে বিরাট পাথর, ধূমকেতু ও উল্কা সমৃদ্ধ এলাকা আবিষ্কার করেন। যার নাম দেয়া হয় 'Opik Oort cloud.' সৌরজতের চতুর্দিকে প্রায় ৩.২৫ X ২.৫ আলোকবর্ষব্যাপী বিস্তৃত ট্রিলিয়ন-ট্রিলিয়ন পাথরখন্ড, ধূমকেতু ও উল্কাসমৃদ্ধ পরিবেশটি মানবজ্ঞানে নিঃসন্দেহে এক ভয়ংকর ব্যপার। উক্ত এলাকা থেকে আগত ধূমকেতু প্রায় সময়ই গ্রহ ব্যবস্থাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে থাকে।



চিত্রঃ ৪৯

"উহারা কোন নিদর্শন দেখিলে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং বলে, ইহাতো চিরাচরিত যাদু।" (৫৪ ঃ ২)

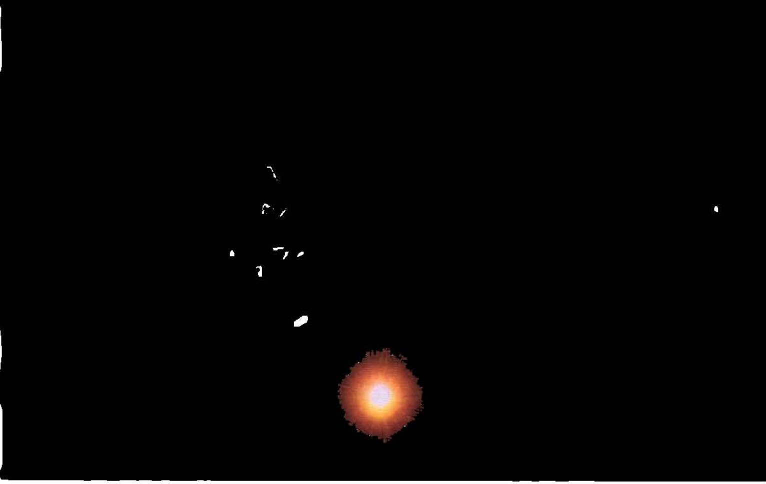
- আমাদের সৌরজগতের চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা বিশাল এলাকাব্যাপী পাথরখন্ড, ধূমকেতু ও শিলাখন্ড পৃথিবীর জন্য অবশ্যই এক ভয়াভহ ব্যাপার। যে কোন সময় ঐ এলাকা থেকে ছুটে আসা ধূমকেতু পৃথিবীকে আঘাত করে ধ্বংসের গহ্বরে নিমজ্জিত করতে পারে।



চিত্রঃ ৫০

"আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদিগের মধ্যে কোন কিছুই খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই।" (৪৪ ঃ ৩৮)

- সূর্যের মধ্যাকর্ষন বলের টানে Oort Cloud থেকে ছুটে আসা ধূমকেতু (comet) সৌরজগতের ভিতর উড়ে যাচ্ছে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার জন্য। ধূমকেতু মূলতঃ শীলা বা পাথর খন্ড, যা দূরবর্তী ঠান্ডা অঞ্চল থেকে বরফ আচ্ছাদিত হয়ে আগমন করে থাকে। সূর্যের আলো বরফ কণায় প্রতিফলিত হয় বলেই দেখতে উজ্জল দেখায়।



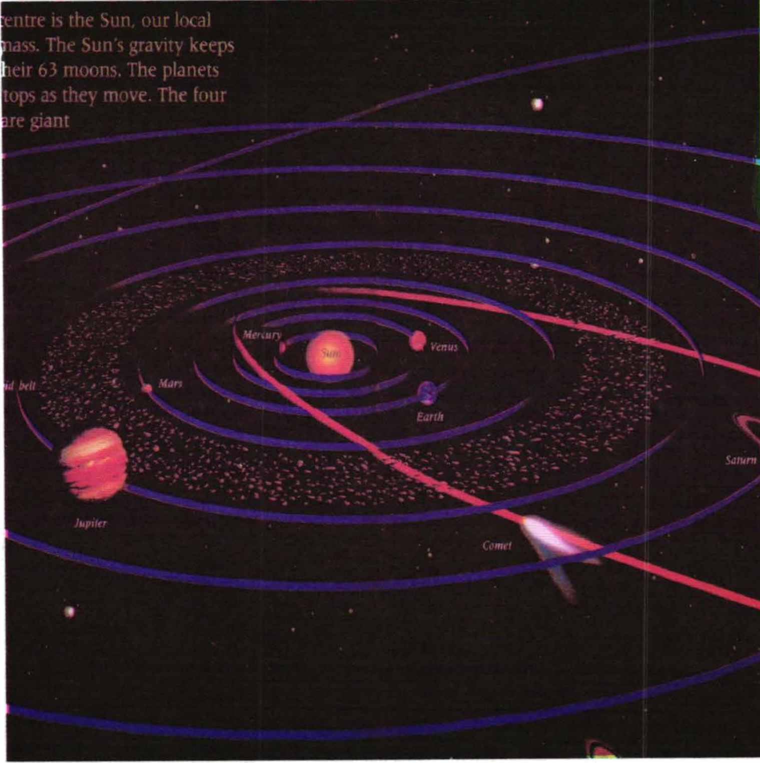
চিত্রঃ ৫১

"যখন কাওকাব (গ্রহান্/ধূমকেতু) বিক্ষিপ্তবাবে নিক্ষিপ্ত হইবে।" (৮২ ঃ ২)

- ধূমকেতুর আগমনে পৃথিবীবাসী আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠলেও আসলে বিষয়টি আনন্দের নয় বরং ঐ ধূমকেতু মহাজাগতিক কোন কারণে পৃথিবীর মধ্যাকর্ষনে আবদ্ধ হলে প্রচন্ড গতিতে ছুটে এসে পৃথিবীপৃষ্ঠে আছড়ে পড়ে মহাপ্রলয় ঘটিয়ে সকল প্রাণকে চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে।

'ধূমকেতু' বর্তমান আছে। এই কল্পনাতীত বিরাট সংখ্যক মহাকাশীয় ধূমকেতুর যে কোন মাঝারি বা বড় আকারের একটির উড়ন্ত আঘাতই আমাদের পৃথিবীর চেহারা পাল্টিয়ে দিতে পারে। যেমনিভাবে প্রায় ৬৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে মাত্র ১০ কিলোমিটার ব্যাসের একটি 'ধূমকেতু' পতনের কারণেই পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে বিরাট আকৃতির প্রাণী 'ডায়নোসোর' প্রজাতির চিরতরে প্রস্থান ঘটে। 'ধূমকেতুর' পতন যে কত ভয়াবহ ও বিপদজনক হতে পারে তা বুঝার জন্য অতি নিকটের অর্থাৎ ১৯৯৪ সালে গ্রহরাজ 'বৃহস্পতির' ওপর পতিত ধুমকেতু 'সু-মেকার লেভী-৯' ও এর আঘাতের ভয়াবহতা থেকেই অনুমান করা যায়। 'সু-মেকার লেভী-৯' ধূমকেতুটি একটি কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিন করতে এসে ১৯৯২ সালে 'বৃহস্পতি গ্রহের' অভিকর্ষ বলে আট্‌কা পড়ে যায়। আমাদের পৃথিবীর তুলনায় প্রায় ৩০০ গুণ বৃহৎ এই বৃহস্পতি গ্রহের প্রবল আকর্ষণেই ধূমকেতুটি প্রায় ২১টি খন্ডে বিভক্ত হয়ে ছুটে আসতে থাকে এবং ১৯৯৪ সালের জুলাইতে ঘন্টায় প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার মাইল (১২৫০০০ মাইল/ঘন্টা) তীব্র গতিতে বৃহস্পতির ওপর আছড়ে পড়ে। ২.৫ মাইল ব্যাসের প্রথম খন্ডটি আঘাত হানে ১৬ই জুলাই এবং সর্বশেষ খন্ডটি আঘাত করে ২২শে জুলাই। প্রথম খন্ডটির আঘাতে বৃহস্পতি গ্রহের পৃষ্ঠে যে মারাত্মক ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি করে, তার পরিমান প্রায় ৬০ লক্ষ মেঘাটন TNT-র বিষ্ফোরনের সমান। আর সর্বমোট ২১টি খন্ডের আঘাতের বিষ্ফোরনের সমষ্টি ছিল 'দুই কোটি' মেঘাটন TNT-র অকল্পনীয় ও ভয়ংকর বিষ্ফোরণের সমতুল্য। অথচ রাশিয়া সর্ববৃহৎ যে 'হাইড্রোজেন বোমার' বিষ্ফোরণ ঘটায় এর মাত্রা ছিল মাত্র ৫৮ মেঘাটন। সেই হিসেবে বৃহস্পতি গ্রহে ধূমকেতুর পতনে যে 'Collision' ঘটে, তাতে ধ্বংস যজ্ঞের মাত্রা দাড়ায় হাইড্রোজেন বোমার তুলনায় ৩,৪৪,৮২৮ গুণ বেশি। পৃথিবীর নগন্য প্রাণী হিসেবে আমরা যে ভয়াবহ অবস্থার কথা চিন্তাই করতে পারি না।

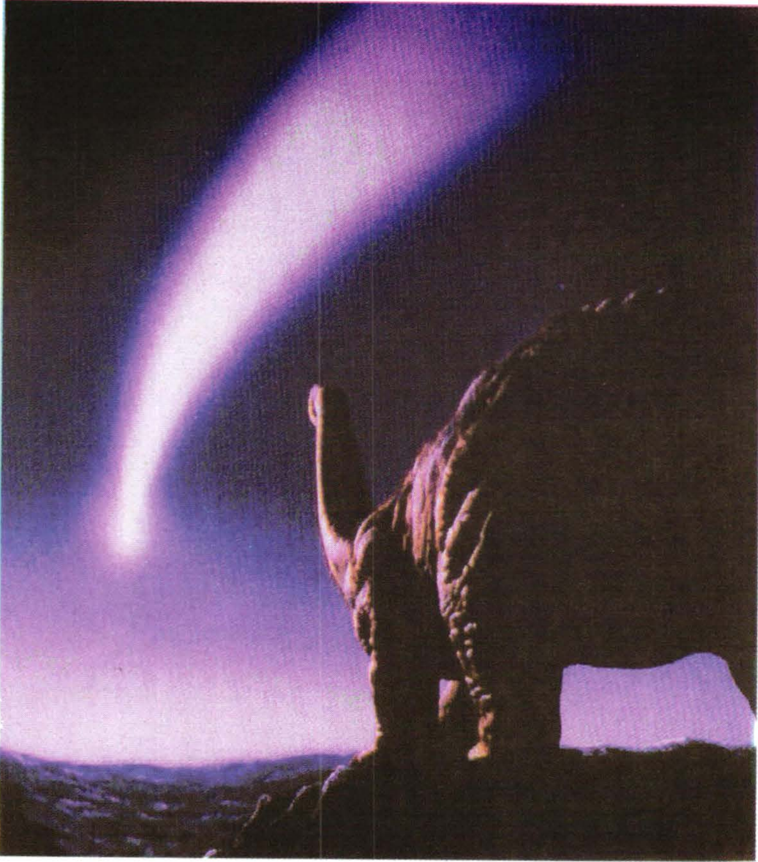
উক্ত ধূমকেতুর পতন যদি বৃহস্পতি গ্রহে না হয়ে দূর্ভাগ্যবশতঃ এই পৃথিবীতে হতো, তাহলে পৃথিবীর ইতিহাস চিরদিনের জন্য এখানেই ইতি টান্‌তে বাধ্য হতো। ভয়ংকর 'Collision' জনিত কারণে সৃষ্ট তেজস্ক্রীয়তায় পৃথিবী জ্বলে-পুড়ে ছাইপিন্ডে পরিণত হতো। পৃথিবী পৃষ্ঠের ধূলা-বালি ওপরে উঠে ছাতার ন্যায় ধূলি-মেঘ রচনা করে দীর্ঘ দিনের জন্য (বছরের পর বছর) পৃথিবীকে ঢেকে দিত। ফলে চন্দ্র-সূর্যের আলো আর পৃথিবীতে পৌঁছতে পারত না, সমগ্র পৃথিবী অন্ধকারে জমাট বরফের টুকরায়



চিত্রঃ ৫২

"ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাসী নহে।" (২৬ ঃ ১০৩)

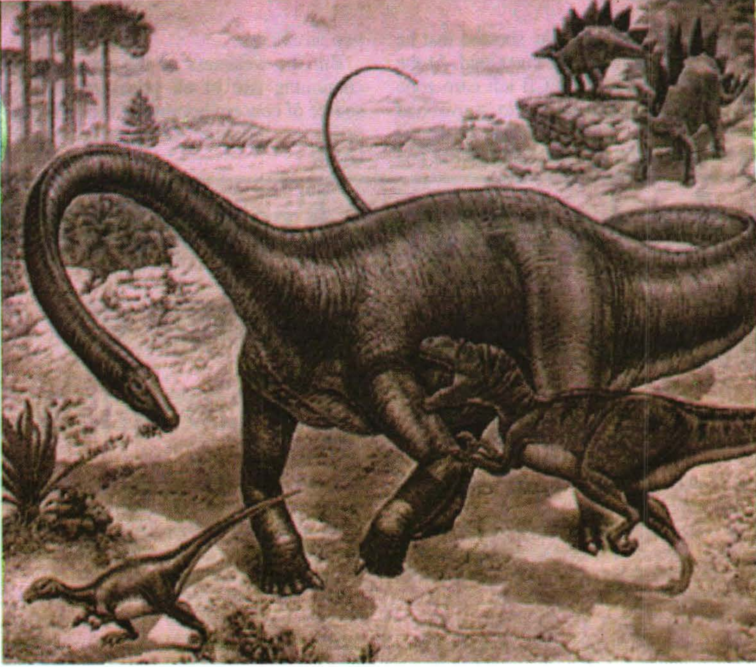
- ধূমকেতু উপবৃত্তাকারে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে থাকে নিজস্ব কক্ষপথে। তাদের এই কক্ষপথ কখনও কোন গ্রহের কক্ষপতের একই তলে নির্দিষ্ট হয়ে গেলে তখন উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে এবং তাতে ব্যাপ ধ্বংসযজ্ঞ সাধিত হয়ে থাকে।



চিত্রঃ ৫৩

"তাহাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর এমন কোন নিদর্শন তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হয় না যাহা হইতে তাহারা মুখ না ফিরায়।" (৬ ঃ ৪)

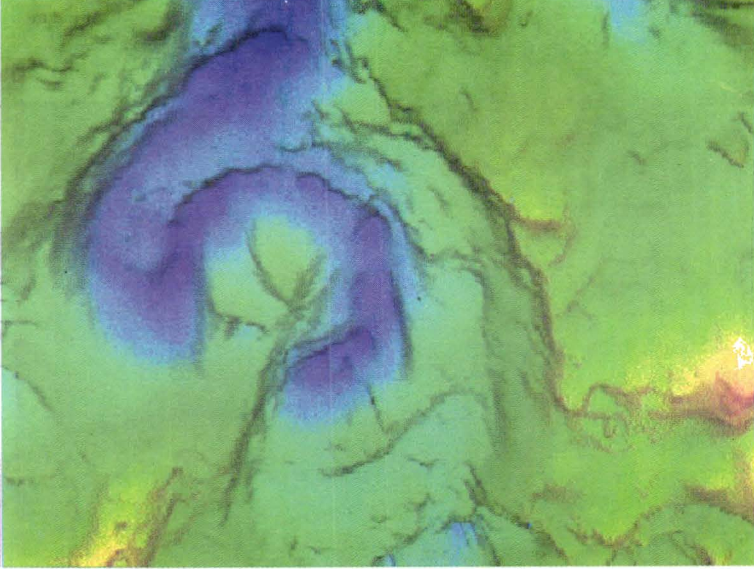
- প্রায় ৬৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে ১০ কিঃমিটার ব্যাস সম্পন্ন একটি ধূমকেতু মেক্সিকো সাগরে পতিত হলে তাতে সমগ্র পৃথিবীতে নেমে আসে ধ্বংসের কালো ছায়া এবং সকল প্রকার ডায়নোসরস তাতে মৃত্যুবরণ করে।



চিত্রঃ ৫৪

"মানুষের জন্য আমি এই সকল দৃষ্টান্ত দেই, কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই ইহা বুঝে।" (২৯ ঃ ৪৩)

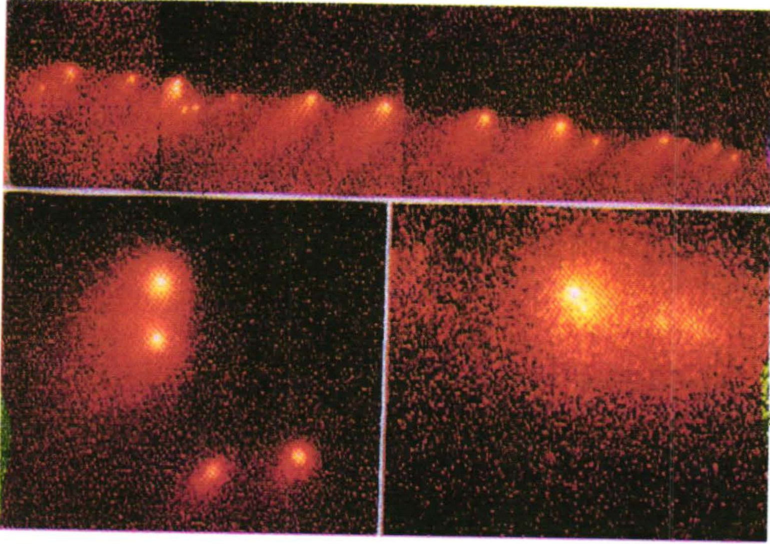
- প্রায় ৬৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে ১০ কিঃমিটার ব্যাস সম্পন্ন একটি ধূমকেতু মেক্সিকো সাগরে পতিত হলে তাতে সমগ্র পৃথিবীতে নেমে আসে ধ্বংসের কালো ছায়া এবং সকল প্রকার ডায়নোসরস তাতে মৃত্যুবরণ করে। বর্তমানে সে ঘটনা ইতিহাস হয়ে আছে।



চিত্রঃ ৫৫

"উহারাই তাহারা, আল্লাহ যাহাদিগের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষু মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং উহারাই গাফিল।" (১৬ ঃ ১০৮)

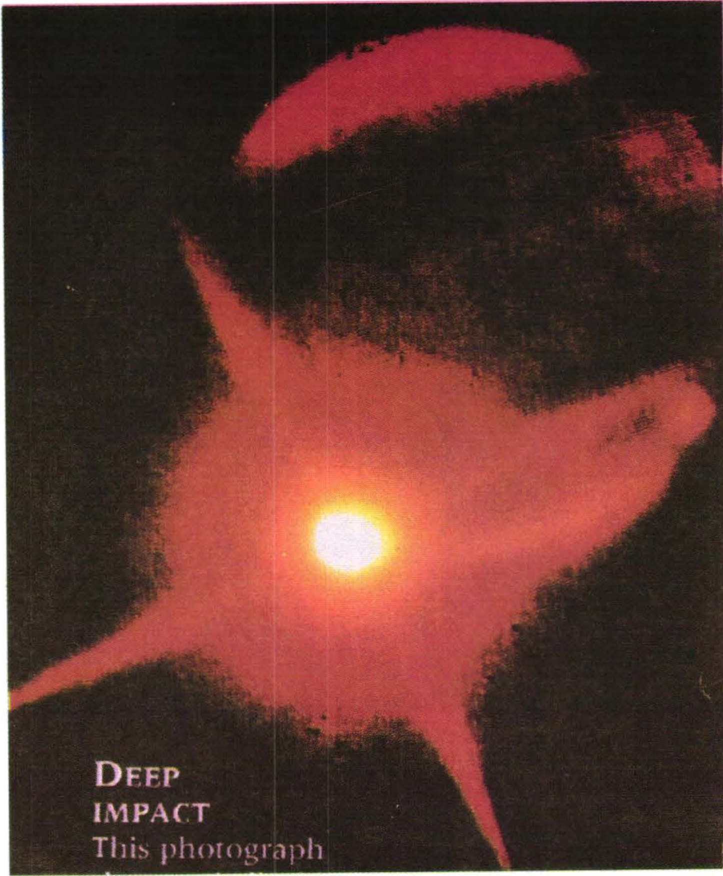
- ১৯৯০ সালে কসমোকেমিষ্ট (Cosmochemist) 'এ্যালন হিলডাবরেনডস' (Alan Hildebrand's) মেক্সিকোর ইউকাতান পেনিসুলা এলাকার (Yuchatan Penisula region) মাটির তলদেশে মধ্যাকর্ষন (Gravity) এবং চুম্বকীয় ক্ষেত্রের (magnetic field) ডাটার (Data) মাধ্যমে ১১২ মাইল প্রশস্ত রিং গঠনাকৃতি আবিষ্কার করেন। যা প্রায় ৬৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে প্রায় ১০ মাইল ব্যাসের ধুমকেতু পতনের কারনে সৃষ্টি হয়েছিল।



চিত্রঃ ৫৬

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রহিয়াছে। তাহারা এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু তাহারা এই সকলের প্রতি উদাসীন।" (১২ ঃ ১০৫)

- ১৯৯৪ সালে 'স্যু মেকার নেভী-৯' ধূমকেতুটি ২১টি খন্ডে ফেটে গিয়ে ঘন্টায় প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার মাইল বেগে তীব্র গতিতে বৃহস্পতি গ্রহে আঘাত হেনে কয়েকশত পৃথিবীর সমান আয়তনের এলাকা ধ্বংস্তুপে পরিণত করে। পৃথিবী থেকে বিজ্ঞানীগন টেলিস্কোপের সাহায্যে ঘটনাটি প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন করার সুযোগ পেয়ে যান। মানব ইতিহাসে এ এক বিরল ঘটনা। মানব সমাজের তবুও কি ঘুম ভাঙবেনা? পৃথিবীতে ওর ২১টি খন্ডের মাত্র ১টি খন্ডও যদি পতিত হতো তাহলে পৃথিবীর জীব-উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে হারিয়ে যেত।



চিত্রঃ ৫৭

"তিনিই তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনাবলী দেখান।" (৪০ ঃ ১৩)

- ১৯৯৪ সালের ১৬ই জুলাই ২.৫ মাইল ব্যাসের প্রথম খন্ডটি ঘন্টায় প্রায় ১২৫,০০০ মাইল গতিতে প্রচন্ডভাবে আঘাত হানে বৃহস্পতি গ্রহের ওপর। যার ধ্বংস সাধনের পরিমাণ প্রায় ৬০ লক্ষ মেগাটন TNT-র বিস্ফোরনে সমান। যা অসংখ্য পৃথিবীর ন্যায় গ্রহ ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট।



চিত্রঃ ৫৮

"যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী দেখিতে পাইয়াও তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়, তাহার অপেক্ষা অধিক জালিম আর কে?" (৩২ ঃ ২২)

- 'স্যু মেকার লেভী-৯' ধূমকেতুর আঘাতে জর্জরিত গ্রহরাজ বৃহস্পতি গ্রহ। পৃথিবী থেকে টেলিস্কোপ দিয়ে ছবিটি ধারনকৃত। ক্ষত চিহ্নিত অংশ অসংখ্য পৃথিবীর সমান আয়তন সম্পন্ন।

পরিণত হত। এক কথায় 'কিয়ামাত' সম্পর্কে যে ধারণা মানবজাতি তার চেতনায় অঙ্কিত করে আছে, অনেকটা তার সাক্ষাৎ লাভ করতো। ভাগ্যিস যে এ যাত্রায় পৃথিবী আপাততঃ সে অবস্থা থেকে রেহাই পেয়েছে।

অতএব, ধূমকেতুর (Comet) পতনও জীবনময় গ্রহের ইতিহাস গুটিয়ে দিতে পারে, ইতোমধ্যেই তা প্রমাণিত হয়েছে এবং পৃথিবীর মানব সমাজ তা বৃহস্পতি গ্রহের ওপর টেলিস্কোপ দিয়ে সরাসরি প্রত্যক্ষও করেছে।

গ্রহানু (Asteroid) পতনের মাধ্যমেঃ ১৮ শতকের পূর্বে বিজ্ঞানজগত আকাশরাজ্যে পাথরের ভাসমান মিছিল সম্পর্কে কোন প্রকার জ্ঞান-ই রাখতো না। চন্দ্র-সূর্যের পর ৫/৬টি গ্রহ এবং আকাশে মিট্-মিট্ করা তারকা সম্পর্কেই তারা মোটামোটি অবহিত ছিল। ১৮০১ সালে সর্বপ্রথম সিসিলির পালের্মো মান মন্দিরের ইটালীয় আকাশ বিজ্ঞানী 'Guispee Piazzi' আকাশে একটি নতুন জ্যোতিষ্কের সন্ধান লাভ করেন। পরের বছরও জ্যোতিষ্কটিকে একইভাবে দেখা গেল, কিন্তু বস্তুটি প্রায় ১০০০ (এক হাজার) কিলোমিটার ব্যাসসম্পন্ন হওয়ায় গ্রহ হিসেবে এটাকে মেনে নেয়া গেল না। 'সিরিস' (Ceres) নামে এটাকে নামকরন করা হলো। ১৮০২ সালেও অনুরূপ প্রায় ৬০০ কিলোমিটার ব্যাস সম্পন্ন আরেকটি বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেল এবং একে 'Pallas' নামকরন করা হলো। পরে অনবরত পাঁচ বছর চেষ্টা করে অনুরূপ আরও ২টি বস্তু উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হল। এদের নামকরণ করা হলো 'Juno' (২৫০ কিঃমিঃ ব্যাস) ও 'Vasta' (৫৪০ কিঃ মিঃ ব্যাস) নামে। এ অবস্থায় দীর্ঘ সময় পর ১৮৪৫ সালে আবিষ্কৃত হলো 'এ্যাষ্টে' (Astea)। ১৮৪৭ সালে 'Hebe', 'Iris' ও 'Flora' নামে আরও ৩টি একই ধরণের বস্তু আবিষ্কৃত হলো। পরবর্তীতে ১৯ শতকের শেষের দিক পর্যন্ত মোট ৩০০টি এবং ১৯৭১ সাল পর্যন্ত আরও ব্যাপক আবিষ্কৃত হয়ে এ সংখ্যা দাড়ালো ১৭৫০ টিতে। এদের আকার-আকৃতি ও চাল-চলনের কারণে বিজ্ঞানীগণ 'গ্রহ' হিসাবে স্বীকৃতি না দিয়ে বরং এদের নামকরন করলেন- 'গ্রহানু' (Asteroid) হিসাবে। বর্তমানে পৃথিবীর চারদিকে এদের সংখ্যা প্রায় চার হাজারের ওপর সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় দুইশতের ওপরে আছে যাদের গড় ব্যাস প্রায় ১০০ কিলোমিটারের ওপরে। এভাবে প্রায় প্রতিদিনই নিত্য-নতুন 'গ্রহানু' আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে।





চিত্রঃ ৫৯

"যখন কাওকাব (গ্রহানু) বিক্ষিপ্তভাবে নিক্ষিপ্ত হইবে।" (৮২ ঃ ২)

- বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীতে পতিত পাথর খন্ডসমূহ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হতে বৃহৎ অসংখ্য পাথর মহাশূন্যে প্রতিনিয়ত পরিভ্রমন করছে।



চিত্রঃ ৬০

"উহারা কোন নিদর্শন দেখিলে উপহাস করে।" (৩৭ ঃ ১৪)

- মহাশূন্যে ভাসমান উড়ন্ত পাথর যে কোন মুহূর্তে পৃথিবীর মধ্যাকর্ষনে বন্দী হয়ে তীব্র গতিতে নেমে আসতে পারে ভূ-পৃষ্ঠে এবং নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে জীবনের সমারোহ।



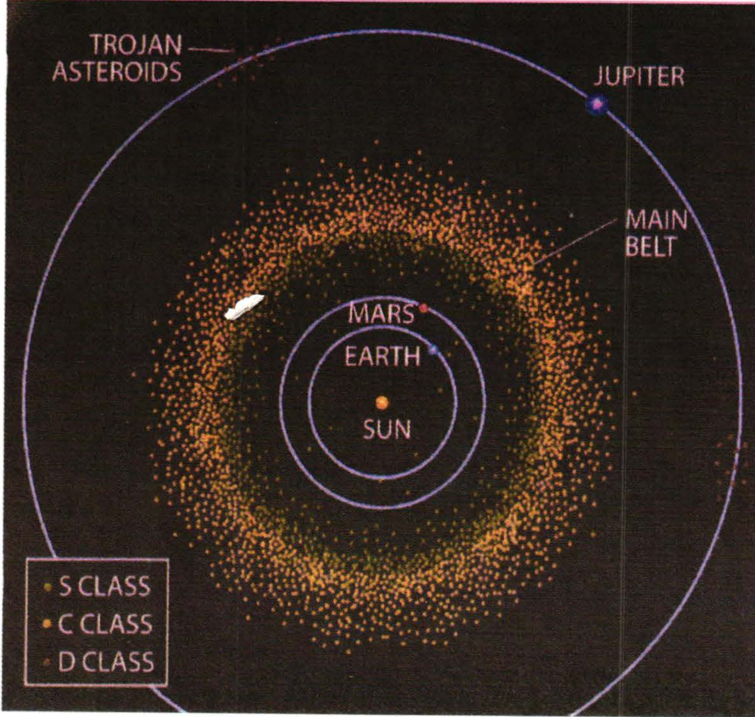
চিত্রঃ ৬১

"বল, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহার প্রতি লক্ষ্য কর। নিদর্শনাবলী ও ভীতি প্রদর্শন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপকারে আসে না।"
(১০ ঃ ১০১)

- পৃথিবীর চতুর্দিকে প্রায় ৪০০০-র ওপরে ভাসমান পাথরখন্ড উড়ে বেড়াচ্ছে। মাত্র এক কিলোমিটার ব্যাসের একটি পাথরের আঘাত-ই পৃথিবীকে ধ্বংসস্তুপে রূপ দিতে পারে।

বিজ্ঞানীগণ গ্রহানুদের উৎসের সন্ধান করতে গিয়ে 'মঙ্গল গ্রহ' এবং 'বৃহস্পতি গ্রহের' মাঝখানে বিরাট এক ভাসমান পাথরের বেল্ট (Belt) আবিষ্কার করেছেন। যে পাথরের 'বহর' গ্রহদের ন্যায় সরাসরি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে থাকে। এদের মধ্যে ছোট মার্বেল পাথরের সাইজ থেকে নিয়ে কয়েক হাজার মাইল ব্যাসের পাথরও বিদ্যমান আছে। এদের কক্ষপথগুলি বৃত্তাকার, উপবৃত্তাকার এবং এরা ক্রান্তিবৃত্তের সাথে সামান্য হেলানো। গ্রহদের মত এ 'গ্রহানুগুলি' সর্বদা একই কক্ষপথে আবর্তিত হয় না। নিকটবর্তী বড় বড় 'গ্রহানুদের' অভিকর্ষবলের প্রভাবে এবং পাশাপাশি অবস্থানের কারণে ঠোকাঠুকিতে প্রায়ই কক্ষপথ পরিবর্তন করে থাকে। আর সে কারণেই এরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের সীমানায় প্রবেশ করে সংশ্লিষ্ট গ্রহ বা উপগ্রহকে প্রচন্ড গতি-শক্তিতে আঘাত করে। ফলে 'গ্রহানুদের' গতিশক্তি প্রচন্ড সংঘর্ষে (Collision) ভয়ানক তাপ শক্তিতে রূপান্তরীত হয়ে ব্যাপকহারে ধ্বংসসাধন ঘটিয়ে থাকে। পতিত স্থানের চতুর্দিকে বিরাট এলাকা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে থাকে। বিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে হিসেব করে দেখেছেন যে মাত্র এক মাইল ব্যাস সম্পন্ন একটি গ্রহানুর প্রচন্ড আঘাতই এ 'পৃথিবী' নামক মায়াবী গ্রহের সমস্ত প্রাণীকুলকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। মাত্র এক কিলোমিটার ব্যাসের একটি পাথর খন্ড বা গ্রহানুর আঘাতে পৃথিবীতে যে ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি হতে পারে তার মাত্রা হবে জাপানের হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত পারমানবিক বোমার ৫৫০ লক্ষ গুণ বেশি, যা কল্পনাও করা যায় না। অথচ মাথার ওপর মহাশূন্যে প্রায় ১০০ কিঃ মিটার ব্যাস সম্পন্ন বিরাট-বিরাট গ্রহানুও অগনিত উড়ে বেড়াচ্ছে। ভাবতে পারেন এদের একটির আঘাতও কি পরিমান পৃথিবীর স্থায়ী ধ্বংস সাধন ঘটাতে পারে? শনিগ্রহের চতুর্দিকেও বিদ্যমান বিরাট পাথরের বেল্ট ইতোমধ্যেই বিজ্ঞানীগণ উদ্ঘাটন করতে সমর্থ হয়েছেন। উক্ত বেল্ট থেকেও ঘূর্ণায়মান ও ভাসমান পাথর পৃথিবীর জন্য ভয়ংকর বিপদের কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে।

আমাদের সৌরজগতের প্রতিটি গ্রহ এবং উপগ্রহের জন্যই পাথরের উক্ত বেল্টদ্বয় সত্যিই বড় বিপদজনক ও ভীতিপ্রদ। বিশেষ করে জীবনময় গ্রহ এ পৃথিবীর জন্য প্রতিটি মুহূর্তই আশংকাজনক, যে কোন মুহূর্তেই বিনা নোটিশে প্রচন্ড ধ্বংসের মুখে পতিত হতে পারে। পৃথিবীর এ নিদারুণ করুন অবস্থার কথা বিবেচনা করে আমেরিকান স্পেস সেন্টার 'NASA'-র কয়েকজন 'গ্রহানু বিজ্ঞানী' (A panel of Scientist) U. S.



চিত্রঃ ৬২

"তোমরা কি নিশ্চিত হইয়া গিয়াছ, যিনি আকাশে রহিয়াছেন তিনি তোমাদিগের উপর পাথরবাহী ঝঞ্জা প্রেরণ করিবেন না।" (৬৭ ঃ ১৭)

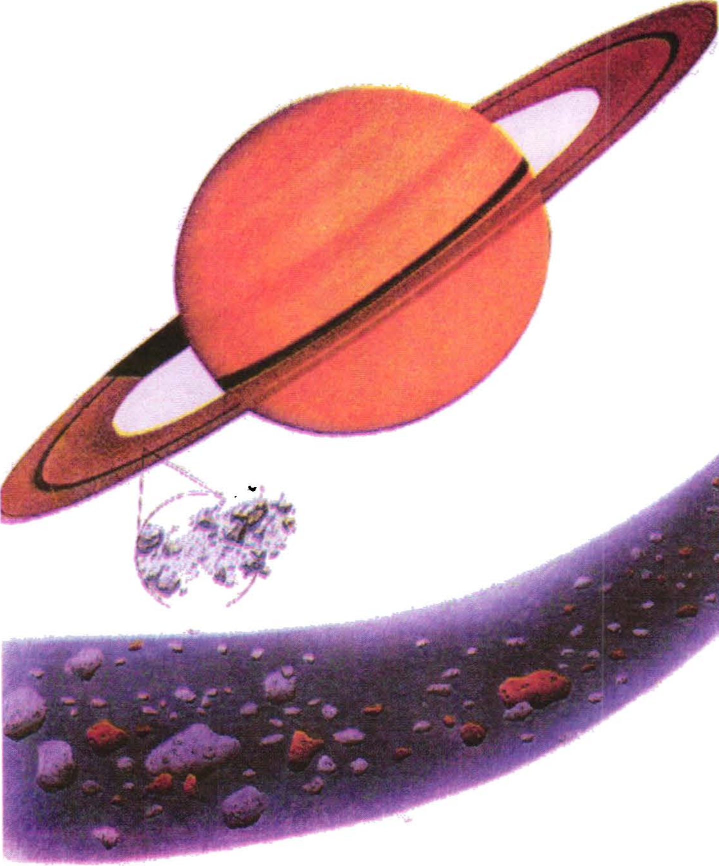
- পৃথিবীর খুবই নিকটে মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যবর্তী স্থানে বিশাল পাথরের বেল্ট আবিষ্কৃত হয়েছে, মহাজাগতিক কারনে ঐ পাথরখন্ড পৃথিবীর জন্য সমূহ বিপদের কারণ। যে কোন সময়-ই এরা পৃথিবীতে আঘাত হানতে পারে।



চিত্রঃ ৬৩

"তিনি তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শন দেখাইয়া থাকেন। অতঃপর তোমরা তাঁহার কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করিবে?" (৪০ ঃ ৮১)

- প্রায় ১ সেঃ মিঃ হতে ১ হাজার কিঃ মিঃ ব্যাস সম্পন্ন অগণিত ভাসমান পাথরের স্তুপ মহাশূণ্যে বৃহস্পতি ও মঙ্গল গ্রহের মাঝে পরিভ্রমণ করছে। মহাজাগতিক কারণে মাত্র ১ কিঃ মিঃ ব্যাস সম্পন্ন একটি পাথরের উড়ন্ত আঘাতেও পৃথিবীর ইতিহাসকে চিরদিনের জন্য মিটিয়ে দিতে পারে।



চিত্রঃ ৬৪

"আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন রহস্য নাই, যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই।" (২৭ ঃ ৭৫)

- সম্প্রতি শনি গ্রহের চতুর্দিকেও বিরাট পাথরের বেল্ট আবিস্কৃত হয়েছে। ঐ পাথরও পৃথিবীবাসীর জন্য আতংকের কারণ।



চিত্রঃ ৬৫

"পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হইবে এবং ধাক্কায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।" (৬৯ ঃ ১৪)

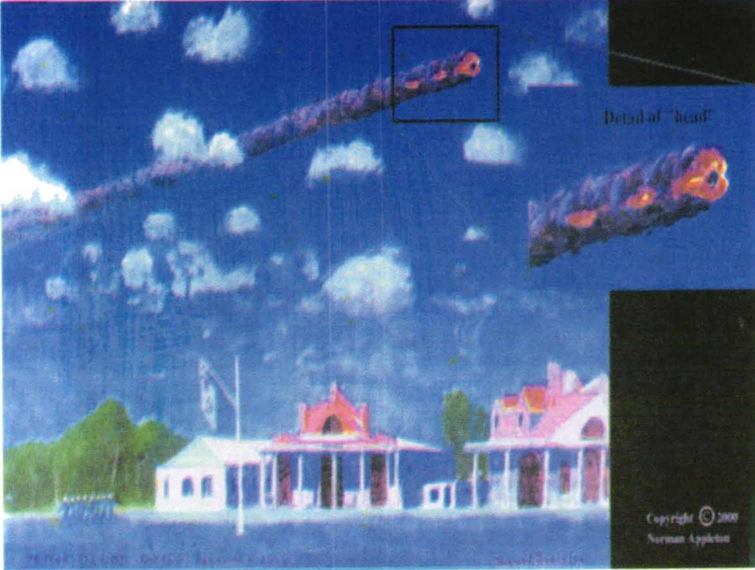
- মাত্র এক কিলোমিটার ব্যাসের একটি উড়ন্ত পাথরের আঘাত-ই মনোরম সাজে সাজানো পৃথিবীকে ধূলিকণায় পরিণত করবে। নিশ্চিহ্ন করে দিবে সকল প্রাণ। পৃথিবীর চতুর্দিকে এক সেন্টিমিটার হতে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার ব্যাস সম্পন্ন অসংখ্য পাথর প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে।



চিত্রঃ ৬৬

"শপথ আকাশের এবং (সহসা) আঘাতকারির, তুমি কি জান এই আঘাতকারি বস্তুটি কি? উহা একটি প্রজ্বলমান জ্যোতিষ্ক।" (৮৬ ঃ ১-৩)

- পৃথিবীর চতুর্দিকে ভাসমান পাথর কখনও পৃথিবীর মধ্যাকর্ষনে আবদ্ধ হলে প্রচন্ড জ্বলন্ত অগ্নিমূর্তীতে ভূ-পৃষ্ঠে আঘাত হেনে নিশ্চিহ্ন করে দিবে জীবনের স্পন্দন।



চিত্রঃ ৬৭

"মানুষের জন্য আমি এই সকল দৃষ্টান্ত দেই, কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই ইহা বুঝে।" (২৯ ঃ ৪৩)

- ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর, একদিন দিনের বেলায় হঠাৎ করেই সেন্ট্রাল আফ্রিকার আকাশে ছোট আকারের একটি পাথরখন্ড (meteor) জ্বলন্ত অগ্নিমূর্তীতে আবির্ভূত হয়। সেইদিনের অকস্মাৎ সেই দৃশ্যটি দর্শনে মানবসম্প্রদায় ভয়ে আঁৎকে উঠে। এ জাতিয় বৃহৎ পাথর খন্ডের আগমন ঘটলে মানবজাতি তার শেস প্রহর গুনতে বাধ্য হবে এই সুন্দর গ্রহটিতে।

Congress-কে অবহিত করেন যে, - 'There are about 1700 uncataloged asteroids that could hit earth at any time and wipe out civilization অর্থাৎ পৃথিবীর নিকটবর্তী কক্ষপথে প্রায় ১৭০০ মত অচিহ্নিত গ্রহানু উড়ে বেড়াচ্ছে, তারা যে কোন সময় পৃথিবীতে আঘাত হেনে বর্তমান সভ্যতাকে নির্মূল করে দিতে পারে। 'Scientist warned it would take on asteroid only of a thousand nuclear wars, fill the atmosphere with dust and chock out whatever life survived the blast অর্থাৎ, বিজ্ঞানীগণ সতর্ক করে দেন যে, মাত্র অর্ধমাইল ব্যাসের গ্রহানুর উড়ন্ত আঘাতই সহস্রাধিক পারমানবিক যুদ্ধের সমান শক্তি উৎপন্ন করে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটাতে পারে এবং এক মহাবিস্তার ধূলা-বালি দিয়ে পৃথিবীর আবহ্মন্ডল পরিপূর্ণ করে বেঁচে যাওয়া অবশিষ্ট প্রাণগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। তাদের আরও বক্তব্য হচ্ছে - 'Anyone of the potential killers out there could strike at any time, even this afternoon without warning, said Clark Chopman, a member of the imaging team for 'NASA' Galilio Space Probe, it could literally kill billions and send us back into the dark ages, অর্থাৎ, 'NASA'-র 'গ্যালিলীও স্পেস প্রুব' টিম সদস্য মিঃ ক্লার্ক চোপমান সতর্ক করে দেন যে, পৃথিবীর নিকটবর্তী মহাশূণ্যে অবস্থানরত গ্রহানুদের যে কোন একটি এই বিকেল বেলায়ই বিনা নোটিশে পৃথিবীতে হঠাৎ করে আঘাত হানতে পারে, যার প্রচন্ড তান্ডব তৎক্ষনাৎ-ই কোটি-কোটি প্রাণকে নির্মূল করে আমাদেরকে চির অন্ধকার যুগে পাঠিয়ে দিতে পারে।

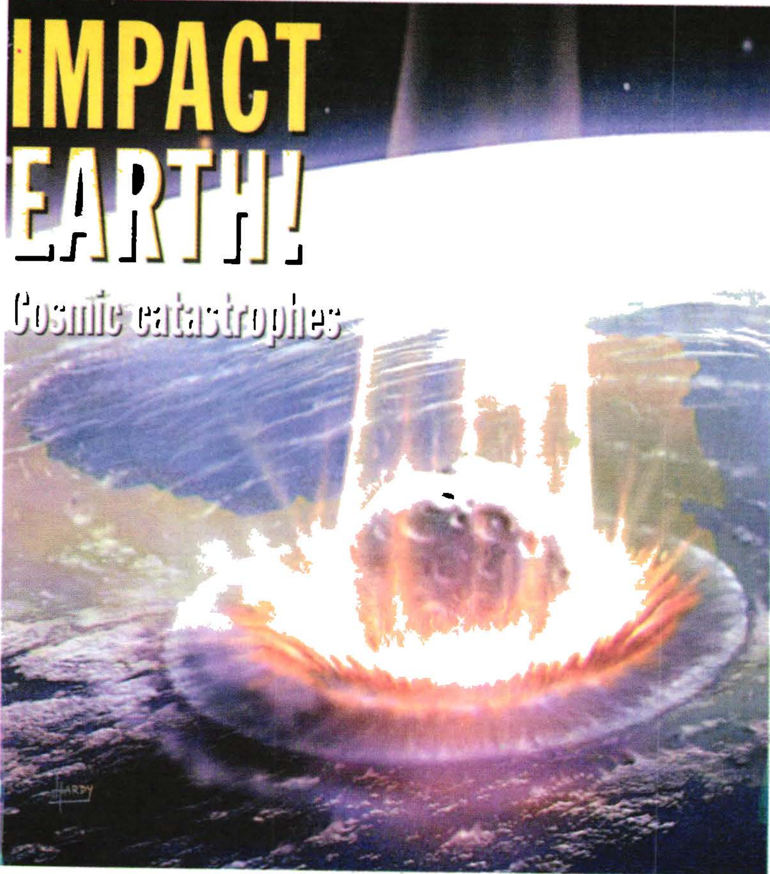
উক্ত বিষয়ে বিজ্ঞানী 'জন লিউইস' আরও পরিষ্কার করে পৃথিবী বাসীর সামনে তুলে ধরেন যে 'এ্যামুন' নামক মাত্র ২০০০ মিটার ব্যাস সম্পন্ন দ্বিপ্রান্ত বিশিষ্ট গ্রহানুর আঘাতে প্রায় ১০০০টি পারমানবিক বোমার বিষ্ফোরণের সমান তেজষ্ক্রীয়তা ছড়িয়ে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর ধ্বংসসাধন ঘটাতে পারে।

ফ্রান্সের বিজ্ঞানীগণ বিষয়টির গুরত্ব ও ভয়াবহতা উপলব্ধি করে তাদের সরকারকে সাবধান করেন এভাবে- Major asteroids big enough to inflict a global catastrophe are half as

numerous as feared, according to new research that however warn's governments to speed up effort to spot Space rock on a possible collision course with the earth.'

এবার ইংল্যান্ডের অবস্থা শুনুন- On the first working day of the new millenium, prime minister Tony Blair's government unveiled the threat of collision with what it called near earth objects (NEO'S). Scientist said, there were 5,000 objects crossing the earth orbit big enough to peak a devastating punch, if one kilometer wide asteroid landing in the Atlantic would trigger a tidal wave 28 kilometers high and cause a nuclear winter lasting for months, - অর্থাৎ- নতুন একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিনেই ইংল্যান্ডের প্রধান মন্ত্রী 'টনি ব্লেয়ার' তার কর্মদিবসে একটি প্যানেল তৈরী করে তাতে তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেন যেন তারা পৃথিবীর নিকটবর্তী 'গ্রহানু কর্তৃক' পৃথিবী আক্রান্ত হওয়ার কথিত বিপদের বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে দেখেন। বিজ্ঞানীগণ বলেন, প্রায় ৫০০০ গ্রহানু যারা আকারে বেশ বড় এবং পৃথিবীর কক্ষপথ ছেদ করে যায়, এদের একটির আঘাত-ই পৃথিবী ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। মাত্র এক কিলোমিটার ব্যাস সম্পন্ন 'গ্রহানু' যদি আটলান্টিক মহাসাগরে আঘাত হানতে পারে, তাহলে প্রায় ২৮ কিলোমিটার উচুঁ প্লাবনের সৃষ্টি করে গোটা পৃথিবীকে ডুবিয়ে দিয়ে মাসের পর মাস পারমানবিক শীতের আবির্ভাব ঘটাবে। তাতে পৃথিবী তার পৃষ্ঠে জীবনের সকল প্রকার স্পন্দন হারিয়ে তুষারযুগে প্রবেশ করবে।

আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী যে সত্যিকারভাবে বিরাট-বিরাট পাথর খন্ড বা গ্রহানু দিয়েই আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, তার কিছু কিছু আলামত ইতোমধ্যেই কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। লক্ষ্য করুন- ১৯৮৯ সালে ১৩০০ ফুট ব্যাসের গ্রহানু পৃথিবীর প্রায় চার লক্ষ মাইল দূর দিয়ে চলে গেছে। ১৯৯১ সালে ৫০ ফুট ব্যাসের 'ম্যাটিওরাইট' (উল্কা) প্রায় এক লক্ষ মাইল দূর দিয়ে উড়ে গেছে। এছাড়াও যে গ্রহানুগুলো অতীতে পৃথিবীর কক্ষপথকে ছেদ করে চলে গেছে তাদের মধ্যে ৩০ কিলোমিটার ব্যাস



চিত্রঃ ৬৮

"যখন সমুদ্র উদ্বেলিত হইবে।" (৮২ ঃ ৩)
"যখন সমুদ্র স্ফীত হইয়া যাইবে।" (৮১ ঃ ৬)

- 'গ্রহানু' সাগরে পতিত হওয়ার কারনে সাগরের পানি প্রচন্ড ধাক্কায় বেশ কয়েক কিলোমিটার উঁচু হয়ে প্লাবনের সৃষ্টি করে সমগ্র ভূ-ভাগকে ডুবিয়ে দিবে।

সম্পন্ন 'ইরোস' ১৯৩১ সালে পৃথিবী থেকে ২৭২০০,০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে প্রস্থান করেছে, ৫ কিলোমিটার ব্যাস সম্পন্ন গ্রহানু আল্‌বার্ট ১৯১১ সালে ৩,২০,০০,০০০ কিঃমিঃ দূর দিয়ে চলে গেছে। ৮ কিঃমিটার ব্যাস সম্পন্ন গ্রহানু 'অ্যামর' পৃথিবীর প্রায় ১,৬০,০০,০০০ কিলোমিটার, 'এ্যাপোলো' প্রায় ১,১২,০০,০০০ কিলোমিটার দূরত্বে চলে এসেছিল। এদের অনেকেই ছিল বেশ বড় গ্রহানু। গত বৎসরও একটি গ্রহানু চাঁদ এবং পৃথিবীর মাঝখান দিয়ে উড়ে গেছে। ২৩শে ডিসেম্বর ২০০০ সাল বরাবর লন্ডনের ওপর দিয়ে উড়ে গেছে প্রায় ৫০মিটার ব্যাসের 'গ্রহানু' প্রায় ৪ লক্ষ মাইল দূর দিয়ে। NASA-র গ্রহানু বিজ্ঞানীগণ প্রতিবছর প্রায় ৫০ থেকে ১১০টি নতুন গ্রহানুকে চিহ্নিত করে তালিকাভূক্ত করছেন, যাদের অধিকাংশই ১০০ মিটার থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার পর্যন্ত ব্যাস সম্পন্ন, এরা সবাই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে পৃথিবীর নিকটতম মহাশূন্য দিয়েই উড়ে যাচ্ছে।

১৯০৮ সালে মাত্র ৬০ মিটার ব্যাস সম্পন্ন গ্রহানু (Asteroid) রাশিয়ার সাইবেরীয় অঞ্চলের টান্‌গুষকারে (Tanguska) যে আঘাত হানে, তাতে যে শক্তি উৎপন্ন হয়ে আশেপাশের এলাকায় ধ্বংসের তান্ডব চালায়, তার মাত্রা ছিল হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত পারমাণবিক বোমার ক্ষমতার চেয়ে প্রায় ৬০০ গুণ বেশি। যার ফলে পতনস্থানের চতুর্দিকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার ব্যাপী সকল কিছু জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়। ৬০ কিলোমিটার দূরের মানুষের গায়ের পরিধানও পুড়ে যায়। উক্ত গ্রহানুটি বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করার সাথে সাথে সৃষ্ট অগ্নিগোলক প্রায় ১০০০ কিলোমিটার দূর থেকে লোকেরা দেখতে পায় এবং পতনের বিকট শব্দও শুনতে পায়। সাইবেরীয় টানগুষ্কার বাসিন্দারা ঐ মুহূর্তে সমগ্র পৃথিবীর ধ্বংসের কথাই শুধু ভাবছিল- এই বুঝি সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি সত্য সত্যই বড় বিপদসংকুল ও ভীতিপ্রদ যা অস্বীকার করার কোন পথ নেই।

অতীতে যা ঘটে গেছে ওপরে তারই একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ছিল, এবার শুনুন আগাম-ভবিষ্যৎ যা ঘটতে পারে এ ধরণের একটি ঘটনা বিজ্ঞানীগণ নিজেরাই প্রকাশ করে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি করেছেন। ১৯৯৭ সালে প্রায় এক মাইল ব্যাস সম্পন্ন একটি 'গ্রহানু' (Asteroid) আবিষ্কৃত হয়। এর নামকরণ করা হয় '১৯৯৭ XF 11.' এই গ্রহানুটি প্রতি ২১ মাসে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে থাকে। আমেরিকার 'Texas Medonald Observatory' থেকে মার্চ - ৯৯ ঘোষণা করা হয় যে

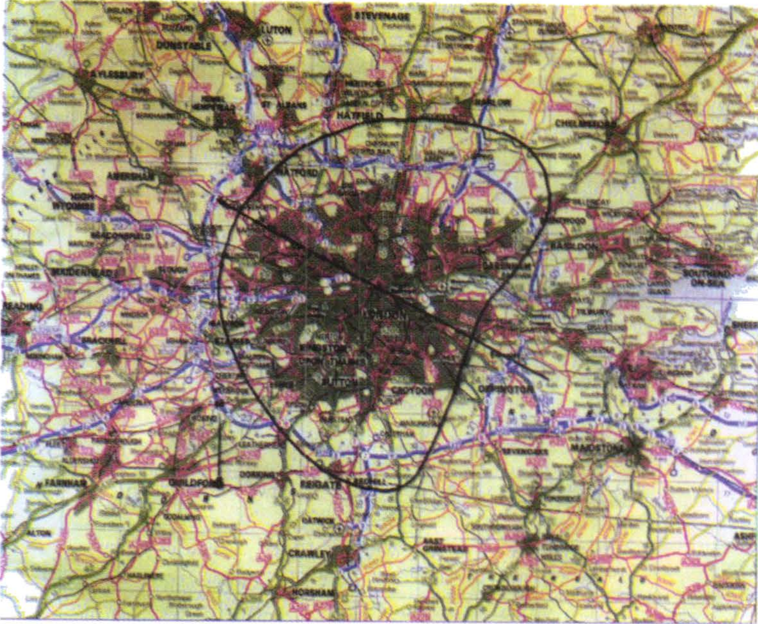




চিত্রঃ ৬৯

"তিনিই তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনাবলী দেখান।" (৪০ ঃ ১৩)

- ১৯০৮ সালে রাশিয়ার সাইবেরীর অঞ্চলের টাংগুস্কারে পতিত ৬০ মিটার ব্যাস সম্পন্ন গ্রহানুর ধ্বংসাবশেষ এবং পতিত স্থানের চিহ্ন দেখানো হল।

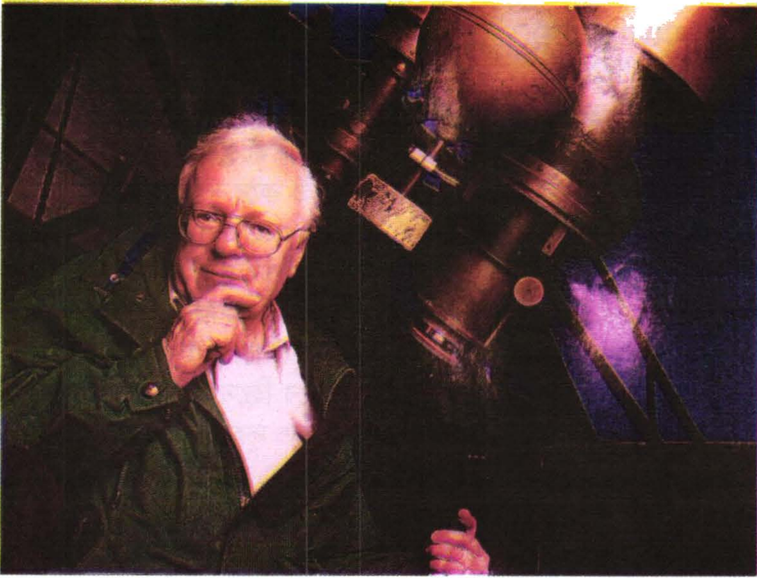


চিত্রঃ ৭০

"যেদিন তোমরা উহা প্রত্যক্ষ করিবে, সেইদিন প্রত্যেক স্তন্যদানকারী ভূলিয়া যাইবে তাহার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তাহার গর্ভপাত ঘটাইয়া ফেলিবে। মানুষকে দেখিবে মাতাল সদৃশ, যদিও উহারা নেশাগ্রস্থ নহে, বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তি কঠিন।" (২২ ঃ ২)

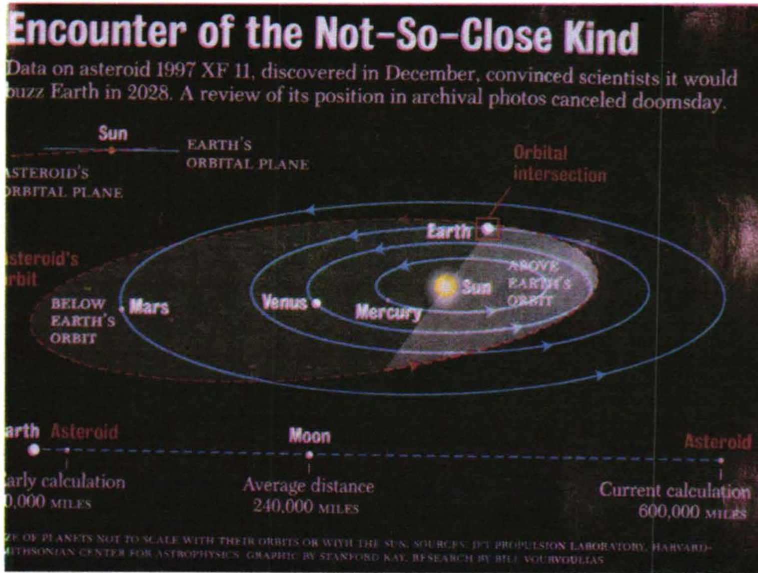
- মাত্র ৬০ ফুটের পাথরখন্ডটি টাংগুস্কার এলাকায় সম্পূর্ণরূপে যে ক্ষতি সাধন করেছে, তার পরিমাণ প্রায় লন্ডন শহরের সমান। আধা-আধি কিংবা আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা এই হিসেবের বাইরে, সুতরাং সকল সময়ই পৃথিবী উড়ন্ত পাথরের আঘাতের ব্যাপারে শংকিত।

২৬ শে অক্টোবর ২০২৮ সাল পূর্বাঞ্চলীয় সময় বিকাল ১-৩০মিঃ 'গ্রহানু ১৯৯৭ FX 11' পৃথিবী থেকে মাত্র ২৬,০০০ মাইল দূরত্বে চলে আসবে অথবা আরও নিকটেও চলে আসতে পারে। জাপানী দু'জন বিজ্ঞানী ১৯৯৮ সালের ৬-ই ডিসেম্বর ভবিষ্যৎবাণী করেন যে 'গ্রহানু ১৯৯৭ FX 11' ২০২৮ সালে পৃথিবী থেকে মাত্র ৫০,০০০ মাইল দূরত্বে চলে আসতে পারে- That would close enough to land and produce on explosion powerful enough to ignite fires and level buildings trees etc, over the earth surface, and to send civilization back into the dark ages. অর্থাৎ- সত্যিই যদি 'FX 11 – গ্রহানুটি' ঐ স্বল্প দূরত্বে চলে আসতে পারে তাহলে নির্ঘাত তা পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ বলের আকর্ষণে ছুটে এসে পৃথিবী পৃষ্ঠে আছড়ে পড়ে প্রচন্ড শক্তিতে বিষ্ফোরণ ঘটাবে এবং (প্রায় ৫ লক্ষ TNT শক্তি সম্পন্ন) বিরাট অগ্নিগোলক সৃষ্টি করে দন্ডায়মান দালান-কোঠা, গাছ-পালা সব কিছুই মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে এবং বর্তমান সভ্যতাকে অন্ধকার যুগে নিক্ষেপ করবে। সংবাদটি রীতিমত ভয়ংকর-ই বটে। উক্ত সংবাদ পরিবেশিত হওয়ার সাথে সাথে সমগ্র বিশ্বব্যাপী তুমুল হৈ-চৈ পড়ে যায়। বিভিন্ন মানমন্দিরে 'FX 11' গ্রহানু নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চলতে থাকে। অবশেষে বিজ্ঞানীগণ বহু পরিশ্রম করে হিসেব মিলিয়ে দেখাতে সমর্থ হন যে, 'FX 11' গ্রহানুটি ঐ তারিখে কথিত দূরত্বে না এসে বরং প্রায় ছয় লক্ষ (৬০০,০০০) মাইল দূরত্ব দিয়ে অতিক্রম করে চলে যাবে, যা চন্দ্রের প্রায় দ্বিগুণ দূরত্বেরও বেশি দূরত্ব (চন্দ্রের দূরত্ব গড়ে দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার মাইল)। এ সংবাদে মানব মন্ডলী আপাঃতত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সাময়িক প্রশান্তি লাভ করার সুযোগ পেয়ে যায়। কিন্তু বিজ্ঞানীগণ তারপরও সতর্ক করে দেন যে - That 'FX-11' could still be nudged onto a deadly path if it passed close enough to another asteroid whose gravity would alter its orbit and at that time it will be threatening earth disaster – অর্থাৎ, যদিও বা দূরত্বের কারণে আপাততঃ বিপদ কেটে গেছে ধরে নেয়া হয়, তথাপিও 'গ্রহানুটি' যে মৃত্যুপথ ধরে এগুচ্ছে, সে পথে যদি বড় ধরনের কোন গ্রহানুর নিকটবর্তী হয়ে পড়ে তাহলে ঐ গ্রহানুর অভিকর্ষের প্রভাবে তার কক্ষপথ পরিবর্তন ঘট্তে পারে তখন আবার পৃথিবী গ্রহানুটির নির্ঘাত হামলার শিকারে পরিণত হতে পারে। তাছাড়া বিজ্ঞানীদের বর্তমান হিসেব



চিত্রঃ ৭১

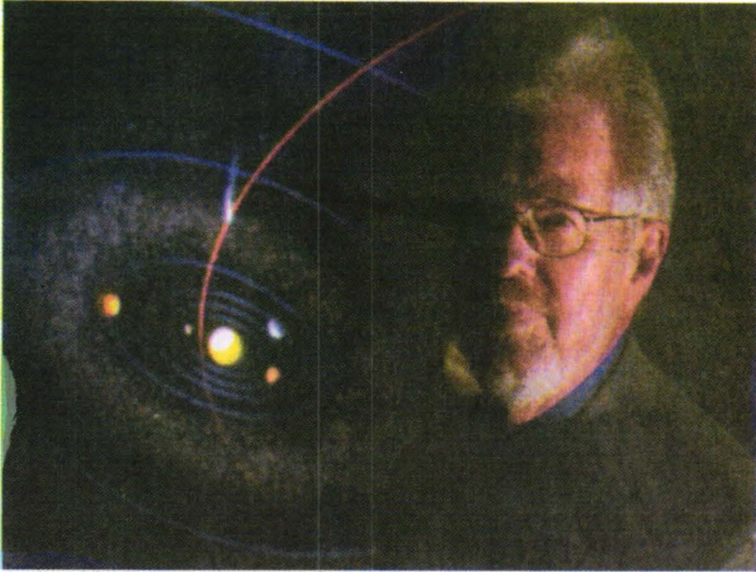
- ২০২৮ সালে কথিত '১৯৯৭ FX-11 গ্রহাণুটি' সত্যিই পৃথিবীতে আঘাত হানবে কি-না তা যাচাই করার জন্য বিশ্বের সকল মান-মন্দিরে টেলিস্কোপের মাধ্যমে আকাশ পর্যবেক্ষণ শেষে হিসেব-নিকেশ করার জন্য সর্বত্র আকাশ বিজ্ঞানীগণ তৎপর হয়ে উঠেন। ছবিতে একজন বিজ্ঞানীকে বিষয়টির মীমাংসার নিমিত্তে টেলিস্কোপ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখা যাচ্ছে।



চিত্রঃ ৭২

"শীঘ্রই আমি তোমাদিগকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাই; সুতরাং তোমরা আমাকে ত্বরা করিতে বলিও না।" (২১ ঃ ৩৭)

*- **FX 11.** গ্রহানুটি ২০২৮ সালে পৃথিবী থেকে প্রায় ছয় লক্ষ মাইল দূর দিয়ে চলে যাবে বলে বিজ্ঞানীগণ জানিয়েছেন। এই সংবাদে মানব সমাজে স্বস্তি ফিরে আসে।*



চিত্রঃ ৭৩

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছুই আছে তাহা তাঁহারই, সকলেই তাঁহার আজ্ঞাবহ।" (৩০ ঃ ২৬)

- ২০০১ সালের শুরুতে Near Earth Object Task Force-র চেয়ারম্যান Dv. 'Harry Atkinson' এক সাংবাদিক সম্মেলনে 'গ্রহানু' বা 'ধূমকেতুর' আঘাত খুবই অদূরে বলে পৃথিবীবাসীকে সতর্ক করে দিয়েছেন। বর্তমান বিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছেন যে গ্রহানুর আঘাতে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

অনুযায়ী প্রায় ৪০০০টি গ্রহানু (Asteroid) যুদ্ধের সদাপ্রস্তুত কামানের গোলার ন্যায় পৃথিবীর চারদিকে দারুন আক্রোষ নিয়ে পরিভ্রমনে রত আছে এবং পৃথিবীকে আঘাত করার মানসিকতায় আদেশ লাভের প্রত্যাশায় যেন প্রহর গুনছে।

মহাবিশ্বে গ্রহব্যবস্থা ধ্বংসের বিভিন্ন পরিস্থিতি ও পদ্ধতি চালু থাকা সত্বেও 'কুরআন মনীষার' বর্ণিত দৃষ্টিভঙ্গির অনুকুলেই বিজ্ঞানও তার মতামত প্রকাশে জোর দিচ্ছে বেশি- Earth assured this time, but thousands of potentially hazardous space object are still out there waiting- অর্থাৎ- এ বারের মত হয়তোবা পৃথিবী রক্ষা পেয়ে গেছে, কিন্তু মহাকাশীয় বস্তু হিসেবে বিবেচীত হাজার হাজার বস্তু মহাশূন্যে এখনো অপেক্ষায় অপেক্ষমান।

'পৃথিবী' নামক এই সুন্দর জীবনময় গ্রহ পৃষ্ঠে অবস্থানকারী মানবসমাজের জন্য সংবাদটি নিঃসন্দেহে এক গুরুতর ও বিপদ সংকুল অবস্থা-ই প্রকাশ করেছে।

সুপার নোভা (Super Nova) বিষ্ফোরণের কারণেঃ আমরা ইতোপূর্বে সংক্ষিপ্ত করে হলেও নক্ষত্রের জীবনচক্র (Life cycle) নিয়ে আলোচন করেছি। 'সুপার নোভা' শব্দটি এতে ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট। আমাদের সূর্যটি একটি মাঝারী ধরণের নক্ষত্র। এ ধরণের নক্ষত্রের জীবন চক্রের শেষ পর্যায়ে মৃত্যু ঘটলে ধ্বংসাবাশেষ থেকে জন্ম নেয় 'প্লেনেটারী নেবুলা' (Planetery nebula) এবং 'হোয়াইট ডোয়ার্ফ' (White Dwarf)। আমাদের সূর্য থেকে প্রায় ১০ গুন বড় নক্ষত্রের ধ্বংসাবশেষ থেকে সৃষ্টি হয় 'সুপার নোভা জঞ্জাল' এবং 'নিউট্রন ষ্টার' (Neutron Star)। আবার ৩০ থেকে প্রায় ৫০ গুন বৃহৎ হলে নক্ষত্র তার মৃত্যুকালীন ধ্বংসাবশেষ থেকে জন্ম দেয় 'সুপার নোভা জঞ্জাল' (Ramnent) এবং পিলে চমকানো, ভয়ংকর 'ব্ল্যাক-হোল' (Black hole)।

নক্ষত্রের জীবনচক্র বড় বিচিত্র, যে যত বড় তার আয়ুষ্কাল তত সংক্ষিপ্ত। এর কারণ হলো–মধ্যাকর্ষণ বল। বড় বড় বস্তুদের মধ্যাকর্ষণ বলের পরিমানও খুব বেশি, যার কারণে নক্ষত্রের আভ্যন্তরীণ কোর (Core) বা কেন্দ্রের দিকে এর ভিতরকার জ্বালানী হাইড্রোজেনকে ব্যাপক হারে প্রবাহিত হতে বাধ্য করায় পূর্বেই কোরে (Core) সৃষ্ট পারমানবিক চুল্লীতে



চিত্রঃ ৭৪

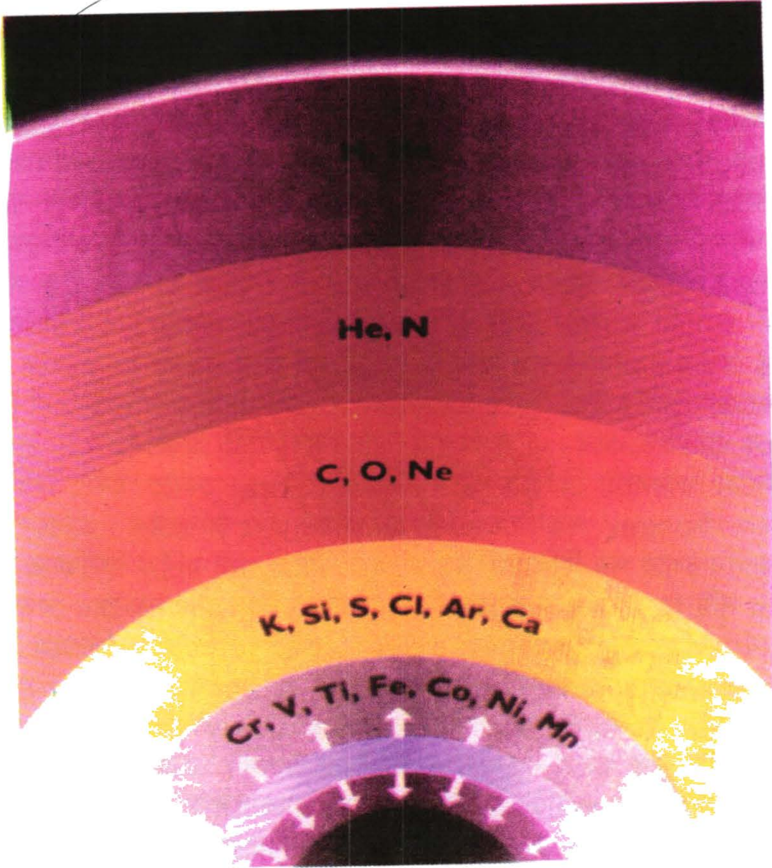
"যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হইয়া যাইবে।" (৭৭ ঃ ৮)

- আমাদের সূর্যের চেয়ে প্রায় ১০ গুণ বড় যে কোন নক্ষত্রের বিস্ফোরণ-ই সুপার নোভা বিস্ফোরণের অন্তর্ভূক্ত। এক্ষেত্রে বিস্ফোরনের পূর্বে নক্ষত্রের দেহ বিশালকার রূপ পরিগ্রহ করে সৌর পরিবারের গ্রহগুলোকে নিজ দেহের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে ধ্বংস সাধন করে।

(Neuclear Reactor) অধিক পরিমাণে জ্বালানী খরচ হয়ে তুলনামূলক স্বল্প সময়ের ব্যবধানেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

একটি নক্ষত্র সৃষ্টি হওয়ার মুহূর্তে মধ্যাকর্ষণ বলের কেন্দ্রমূখী প্রবল ঘনায়নের কারণে সৃষ্ট প্রচন্ডচাপ এবং তাপে কেন্দ্রে যে 'পারমানবিক রি-এ্যাকটর' চালু হয়, ঐ চুল্লীতেই পরবর্তীতে নিয়মিতভাবে হাইড্রোজেন 'Fusion' পদ্ধতিতে হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয় এবং ব্যাপকহারে 'রেডিয়েন্ট এ্যানার্জি' (Radient energy) সৃষ্টি হয়ে মধ্যাকর্ষণ বলের বিপরীতে অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে বহির্মূখী চাপ সৃষ্টি করে নক্ষত্রকে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় কর্মক্ষম রাখে। ব্যাপকহারে জ্বালানী পোড়াবার ফলে এক সময়ে যখন জ্বালানী মওজুদে ভাটা পড়ে, তখন ক্রমান্বয়ে পারমানবিক চূল্লী নিষ্ক্রীয় হয়ে পড়ায় মধ্যাকর্ষণ বল বিনা বাধায় ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং নক্ষত্রের চতুর্দিক হতে ধ্বংসপতনের মাধ্যমে হিলিয়ামকে পারমানবিক চূল্লীর দিকে প্রবাহিত করে। এতে আবার পারমানবিক চূল্লী প্রজ্জলিত হয়ে পুনরায় নক্ষত্রের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনে। নক্ষত্র (Core) কোরে এবার হিলিয়াম থেকে 'Fusion' পদ্ধতিতে তৈরী হয় কার্বন এবং অক্সিজেন। এভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর হিলিয়াম নিঃশেষ হয়ে গেলে পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতিতে নতুন করে সৃষ্টি হয় 'কার্বন-অক্সিজেন রি-এ্যাক্টর'। বৃহৎ বৃহৎ নক্ষত্রের বেলায় এ 'কার্বন-অক্সিজেন পারমানবিক চুল্লীতে' একই পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে তৈরী হয় ম্যাগনেসিয়াম অথবা নিওন এবং সিলিকন অথবা সাল্ফার। এভাবে পর্যায়ক্রমে একের পর এক নতুন কোর (Core) স্থলাভিষিক্ত হতে থাকে এবং সৃষ্টি হতে থাকে নতুন নতুন মৌলিক পদার্থ। আমাদের পৃথিবীতে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত ১১২টি মৌলিক পদার্থের সবগুলোই নক্ষত্রের অভ্যন্তরে বর্ণিত পদ্ধতিতে রান্না হয়ে সৃষ্ট এবং পরবর্তী পর্যায়ে নক্ষত্রের 'সুপারনোভা' বিষ্ফোরণের মাধ্যমে নিকটবর্তী সৌরজগতের বাসিন্দা গ্রহ-উপগ্রহ পর্যন্ত পৌঁছে তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করে দেয়। আমাদের পৃথিবীর ন্যায় জীবনময় গ্রহদের প্রানচাঞ্চল্যের পিছনে বড় অবদান হলো 'নক্ষত্র বিষ্ফোরণ'।

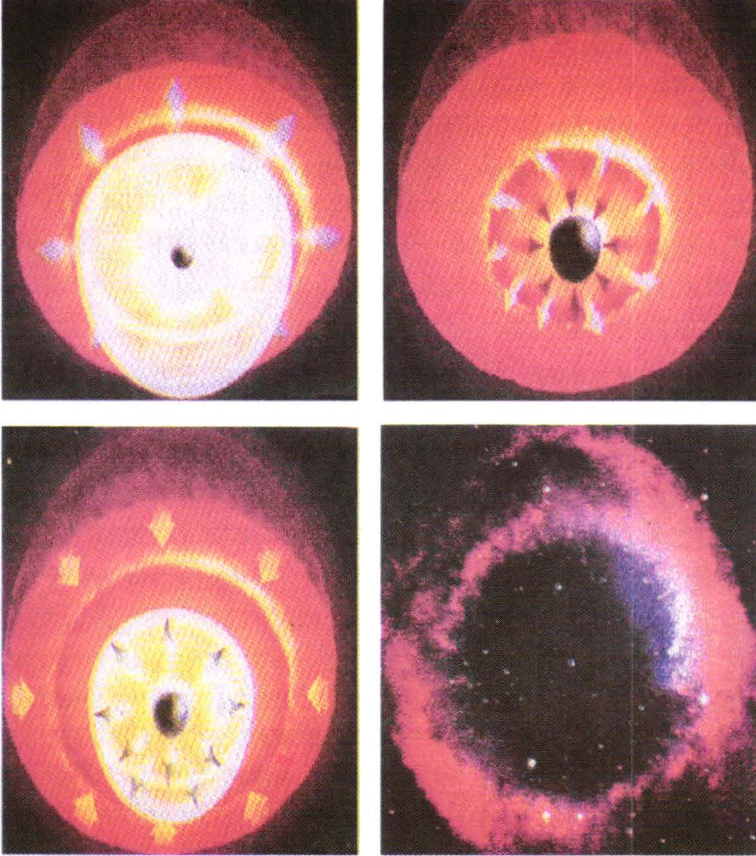
যাই হোক, এই নতুন নতুন মৌলিক পদার্থের সৃষ্টির ধারাবাহিকতা পর্যায়ক্রমে চলতেই থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত 'লৌহ মৌল' সৃষ্টি না হয়। লৌহ-মৌল সৃষ্টি হয়েই নক্ষত্র কোরের সৃষ্ট তাপ আর নির্গত হতে না দিয়ে নিজেই শোষণ করে নেয়, ফলে 'Fusion' পদ্ধতি বন্ধ হয়ে পারমানবিক চুল্লীও নিষ্ক্রীয় হয়ে যায়। লৌহ - মৌলের এই অনাকাঙ্খিত আচরণের সাথে সাথে



চিত্রঃ ৭৫

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কথাই আমার প্রতিপালক অবগত আছেন এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (২১ ঃ ৪)

- 'সুপার নোভা' বিস্ফোরণ ঘটার পূর্বে মৃত্যুপথযাত্রী নক্ষত্রের অভ্যন্তরে জ্বালানী সংকটের কারনে বার বার পারমানবিক চুল্লী চালু হওয়া ও বন্ধ হওয়ার মাধ্যমে মৌলিক পদার্থসমূহ সৃষ্টি হয়ে থাকে।



চিত্রঃ ৭৬

"তিনিই সূর্যকে করিয়াছেন তেজস্কর।" (১০ ঃ ৫)

- ওপরে বামদিক দিক থেকে clock wise সুপর নোভা বিস্ফোরণ পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন পর্যায় দেখানো হয়েছে। বিস্ফোরণটি ঘটতে সময় নেয় মাত্র 0.01 Second অতঃপর সমগ্র সৌর পরিবার প্রচন্ড ধ্বংসে নিপতিত হয়ে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। হারিয়ে যায় সকল বস্তুর আদি অস্তিত্ব।

নক্ষত্র কোরে (Core) মধ্যাকর্ষন বলের প্রভাবে পূর্বের সকল রেকর্ডকে ছাড়িয়ে কল্পনাতীত বেগে ধ্বংসপতন শুরু হওয়ায় প্রচন্ড ঘনায়ণকৃত চাপে তাপমাত্রা প্রায় ১৮ বিলিয়ন ডিগ্রিতে উপনীত হয়। ফলে– The process goes out of control within milliseconds a fantastically short time for a star that has lived for millions and millions of years–the inner core collapses and heats up catastrophically. This sends out a shock Waves that cause heavy elements to form and that throw off the outer layers. The shock waves leaves the core and starts the titanic explosion in less than O.01 second and a Supernova is born.

উক্ত 'সুপার নোভা' বিষ্ফোরণ এত বিকট ও ভয়ংকর রূপ নিয়ে সংঘটিত হয়ে থাকে যে, এটা সংশ্লিষ্ট পুরো গ্যালাক্সীকেও প্রকম্পিত করে তোলে। বিষ্ফোরণের প্রচন্ডতায় নক্ষত্র দেহ থেকে নিক্ষিপ্ত ধূলা-বালি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১০,০০০ মাইল বেগে মহাশূন্যে চতুর্দিকে ছড়িয়ে যেতে থাকে। বিজ্ঞানীগণ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন যে, উক্ত 'সুপারনোভা' বিষ্ফোরণ পরবর্তী এর জঞ্জাল (Ramnent) কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় ২০,০০০ বৎসর থেকে এখনও প্রবল বেগে মহাশূন্যে অজানার উদ্দেশ্যে কেবলই ছুটে যাচ্ছে (The Supernova ramnent expansion shows that matter had been flowing outword for about 20,000 years)। শত-সহস্র বছর এই প্রচন্ড উত্তাপ এবং গতি ধরে রেখে সুপারনোভা বিষ্ফোরণজাত জঞ্জাল হাজার-হাজার কোটি মাইল পথ অতিক্রম করে ছুটে যাওয়ার পথে যদি কখনও আমাদের এই জীবনময় সবুজ পৃথিবীর মত সভ্যতার ধারক কোন গ্রহ বা উপগ্রহকে পেয়ে যায় তাহলে ঐ উত্তপ্ত ধূলি-মেঘ (Ramnent) গ্রহ বা উপগ্রহের মধ্যাকর্ষনের টানে বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করামাত্র বিপুল উত্তাপ এবং গতির মাধ্যমে বায়ুমন্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন ও নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে। গোটা আকাশ পরিপূর্ণ হয়ে যাবে আগুনঝরা উত্তাপের 'সুপারনোভা' ধূলি-মেঘ দিয়ে, যা দেখতে ধূসর-তামাটে বা লালচে রঙের দেখাবে। মনে হবে যেন আকাশ গলিত তামা দিয়ে তৈরী হয়েছে। চন্দ্র, সূর্য, কিংবা নক্ষত্রের কোন প্রকার আলো বছরের পর বছর আর সংশ্লিষ্ট গ্রহ কিংবা উপগ্রহে পৌঁছবে না। ফলে প্রথম দিকে দীর্ঘদিন সুপারনোভার উত্তপ্ত ধূলা-বালি জঞ্জালের অগ্নিঝরা

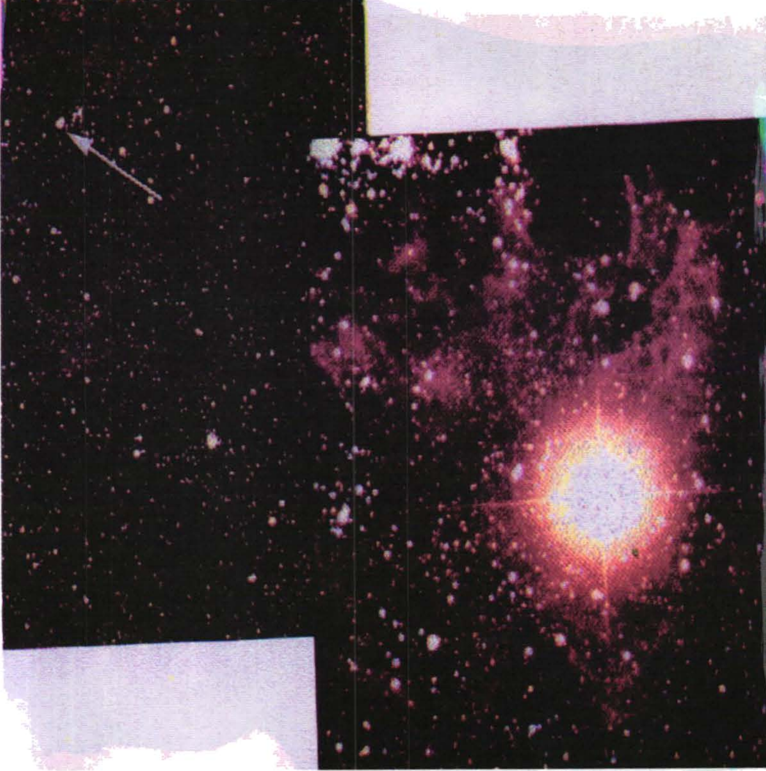
তাপে গ্রহ বা উপগ্রহপৃষ্ঠ জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, দীর্ঘদিন পর এ অবস্থা কেটে গিয়ে শুরু হবে বিপরীত অর্থাৎ আলোহীন অন্ধকার তুষার যুগ। এভাবে গ্রহ বা উপগ্রহে চিরদিনের জন্য জীবনের স্পন্দন হারিয়ে যাবে। বর্তমান সময় পর্যন্ত বিজ্ঞান প্রায় ১০০টি সুপারনোভা-র অস্তিত্ব উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে।



চিত্রঃ ৭৭

"যেইদিন আকাশ বিদির্ণ হইবে, সেইদিন উহা রক্তে-রংগে রঞ্জিত হইবে।" (৫৫ ঃ ৩৭)

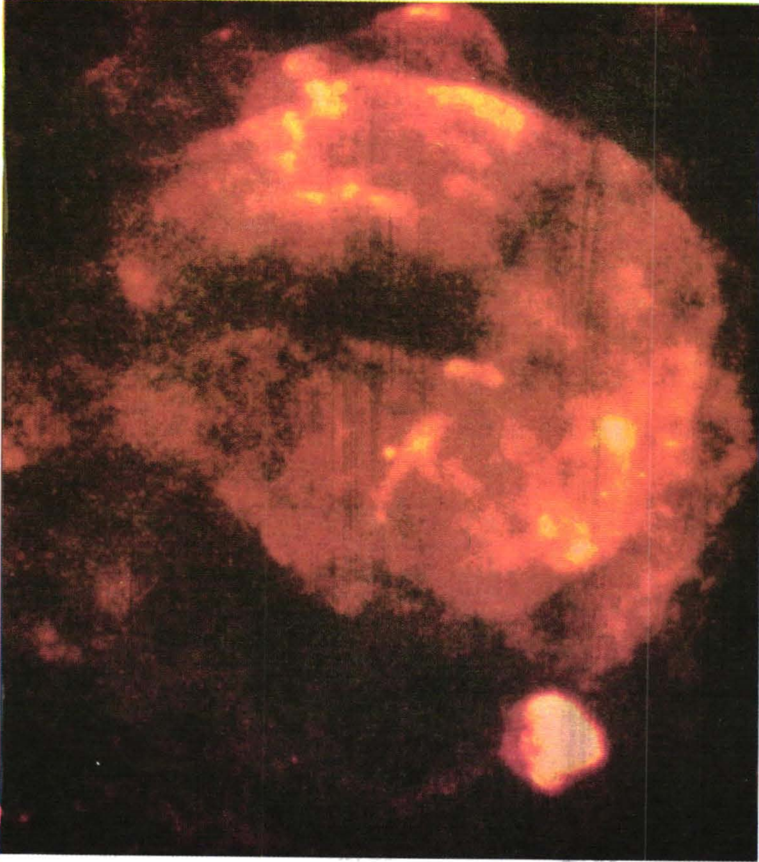
- 'সুপার নোভা' বিষ্ফোরণে চতুর্দিকে নিক্ষিপ্ত উত্তপ্ত ধূলা-বালি, অগ্নিশিখা ও গলিত বিভিন্ন পদার্থ চলার পথে জীবনময় কোন গ্রহ পেলে তা নির্ঘাত ধ্বংসে মধ্যে নিমজ্জিত হবে।



চিত্রঃ ৭৮

"আর যখনই উহাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলীর কোন নিদর্শন উহাদিগের নিকটে আসে তখনই উহারা তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়।" (৩৬ ঃ ৪৬)

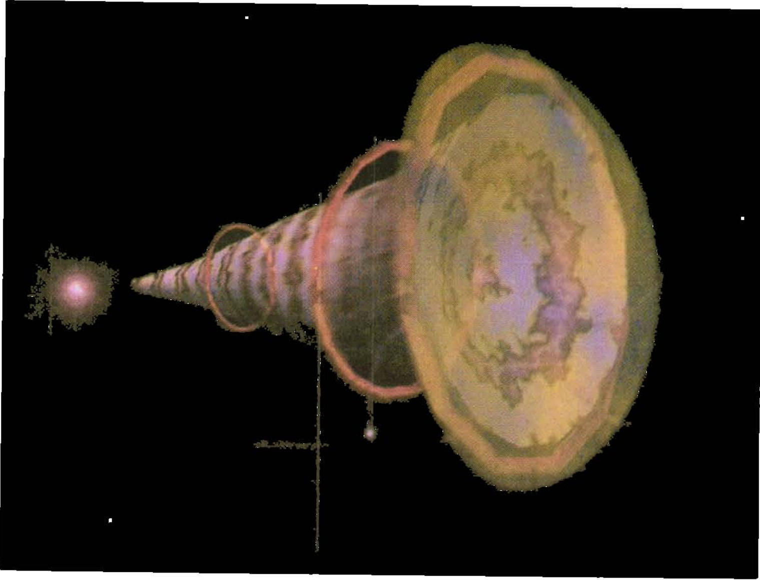
- ১৯৮৭ সালে আমাদের নিকটবর্তী গ্যালাক্সীতে সুপার নোভা বিস্ফোরণ বিজ্ঞানীগন সরাসরি প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য লাভ করেন।



চিত্রঃ ৭৯

"তিনিই তোমাদিগকে তাঁহার নিদর্শনাবলী দেখান।" (৪০ ঃ ১৩)

- Rosat Satellite থেকে ধারণকৃত Vela Supernova explosion। প্রায় ১১,০০০ বৎসর আগে ঘটে যাওয়া বিস্ফোরণজাত অগ্নিময় জঞ্জাল এখন প্রায় ২৩০ আলোকবর্ষব্যাপী এলাকায় চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে (এক আলোকবর্ষ = ১০ ট্রিলিয়ন মাইল)। জীবনময় গ্রহের জন্য এ মরণ ফাঁদ।



চিত্রঃ ৮০

"অবিশ্বাসীরাই আল্লাহর নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক করে। সুতরাং দেশে দেশে তাহাদিগের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে।" (৪০ ঃ ৪)

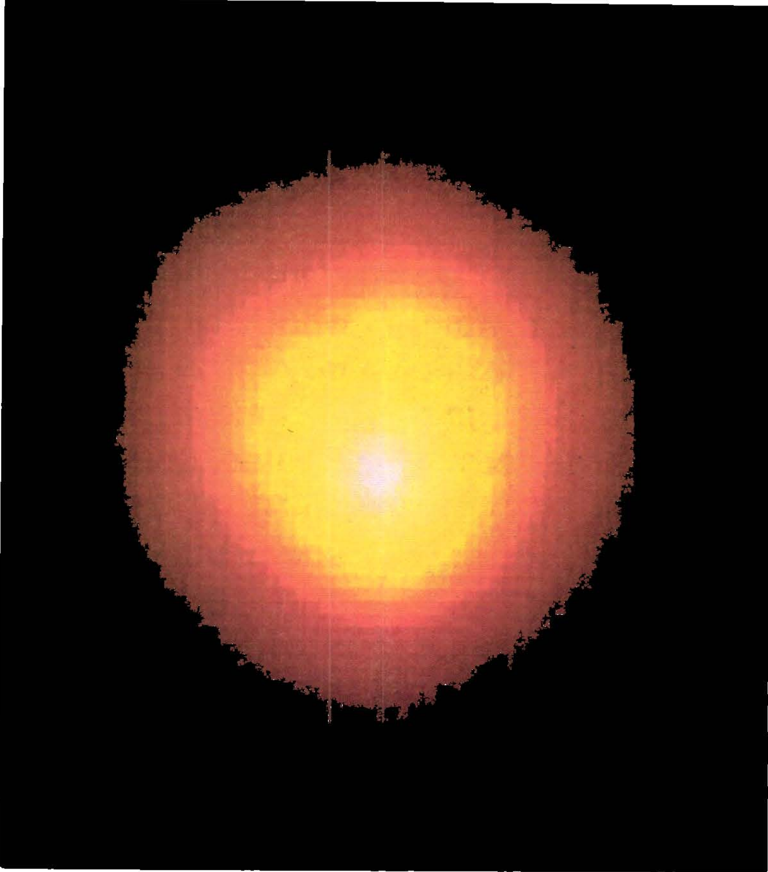
- 'সুপার নোভা ১৯৮৭ A' থেকে নির্গত Shock Waves Cosmic dust এবং Cosmic rays (X-rays) দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে কোন জীবনময় গ্রহ চলার পথে সম্মুখে পড়লে আর রক্ষা নেই। জ্বলে পুড়ে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে। থেমে যাবে সকল প্রাণের স্পন্দন।



চিত্রঃ ৮১

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তিনি জানেন।" (৬৪ ঃ ৪)

- রাতের বেলায় আমাদের মাথার ওপর Orion nebula-র সাথেই বড় লাল বর্ণের উজ্জ্বল নক্ষত্রটি (Betelgeuse Star) 'সুপার নোভা' পথযাত্রী। এখন Red giant অবস্থায় মৃত্যুর (বিস্ফোরণের) প্রহর গুনছে, যা ছবিতে ওপরে বাম কোনায় দেখা যাচ্ছে।



চিত্রঃ ৮২

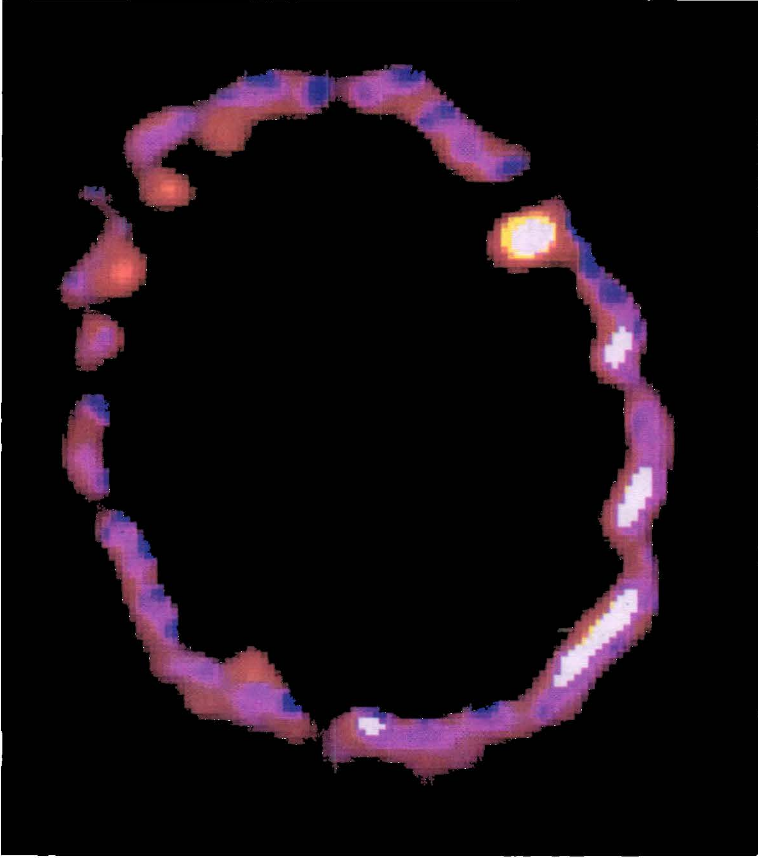
"যাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে আমি তাহাদিগকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে লইয়া যাই যে, তাহারা জানিতেও পারিবে না।"
(৭ ঃ ১৮২)

- আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী Betelgeuse Star এখন Red giant Star রূপ নিয়ে সুপার নোভা বিষ্ফোরণ ঘটাবার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। যে কোন সময় প্রচন্ড বিষ্ফোরণ ঘটিয়ে চতুর্দিকে নিক্ষিপ্ত ধ্বংসাবশেষ দিয়ে একসময় পৃথিবীর মত গ্রহকে ঢেকে দিতে পারে। যার ফলে জীবনময় গ্রহ ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত হতে পারে।

ব্ল্যাক হোলের (Black hole) মাধ্যমেঃ আমাদের এই মহাবিশ্বে মহাজাগতিক বস্তুসমূহের ধ্বংসসাধনের জন্য জানামত যতগুলি ব্যবস্থা চালু আছে, তার সবকয়টি ব্যবস্থার মধ্যে ব্ল্যাক-হোল (Black hole) ব্যবস্থাও রীতিমত আতঙ্কজনক বা ভীতিপ্রদ। এই 'ব্ল্যাক-হোল' এমন এক সাংঘাতিক ধরনের মৃত্যুকুপ, যার আভ্যন্তরীণ ভয়ংকর ধ্বংসসাধন ব্যবস্থা সম্পর্কে মানবসম্প্রদায় সম্ভবত কখনোই জানতে পারবেনা– 'Because beyond the event horizon all the ordinary law of science break down' কারণ ব্ল্যাক হোলের Event horizon-এর পর থেকে নিয়ে পতিত বস্তুর ভাগ্যে সত্যিকার অর্থে যে কি ঘটে তা জানার জন্য বর্তমান বিজ্ঞানের সকল নিয়ম-পদ্ধতি-ই ভেংগে খান-খান হয়ে যায়। নতুন কোন পদার্থ বিজ্ঞান আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত ব্ল্যাক হোলের আভ্যন্তরীণ রহস্য রহস্যপূর্ণই থেকে যাবে।

আমরা ইতোপূর্বে নক্ষত্রদের জীবন প্রবাহ এবং এদের শেষ পরিনতির ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেছি। আমরা জানতে পেরেছি– আমাদের সূর্যের ন্যায় সাইজের নক্ষত্র ধ্বংস হওয়ার পর–ধ্বংসবাশেষ হিসেবে অবশিষ্ট থেকে যায় ক্ষুদ্র 'হোয়াইট ডোয়ার্ফ' (White Dwarf)। সূর্যের চেয়ে কয়েকগুণ বড় নক্ষত্রের ধ্বংসাবশেষে থেকে যায় ক্ষুদ্র 'নিউট্রন ষ্টার' বা 'পালসার'। আর যে সকল নক্ষত্র আমাদের সূর্যের তুলনায় প্রায় ৩০ থেকে ৫০ গুণ বড়, বৃহৎ-বৃহৎ সেই সকল নক্ষত্র জীবনচক্র শেষ করে বিস্ময়কর এক অবস্থার ভিতর দিয়ে সুপারনোভা বিষ্ফোরণ ঘটিয়ে সমগ্র গ্যালাক্সীকে আলোড়িত করে এবং ধ্বংসাবশেষ হিসেবে নক্ষত্র কোরটিকে (core) রেখে যায়, যে কোরটি পরবর্তীতে মধ্যাকর্ষণ বলের অপ্রতিরোধ্য তান্ডবলীলার কেন্দ্র হিসেবে স্বাক্ষর বহন করে চলতে থাকে ধ্বংসাত্মক এক নতুন জীবন পথে।

বর্তমান বিজ্ঞানের বক্তব্যে এর সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা হচ্ছে– Consider a star which is too massive even to explode as



চিত্রঃ ৮৩

"সূর্য এবং চন্দ্র (তোমার প্রভুর) গণনায় নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে।" (৫৫ ঃ ৪)

- বৃহৎ-বৃহৎ নক্ষত্রসমূহ সুপার নোভা বিষ্ফোরণের মাধ্যমে ধ্বংস হয় বটে, তবে প্রবল মধ্যাকর্ষন বল সম্পন্ন 'কেন্দ্র' বা 'কোরটি' (Core) অক্ষত থেকে গিয়ে Black hole-এ রূপ নেয়, ছবিতে সুপার নোভার মাঝখানে সৃষ্ট Black hole-টি অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

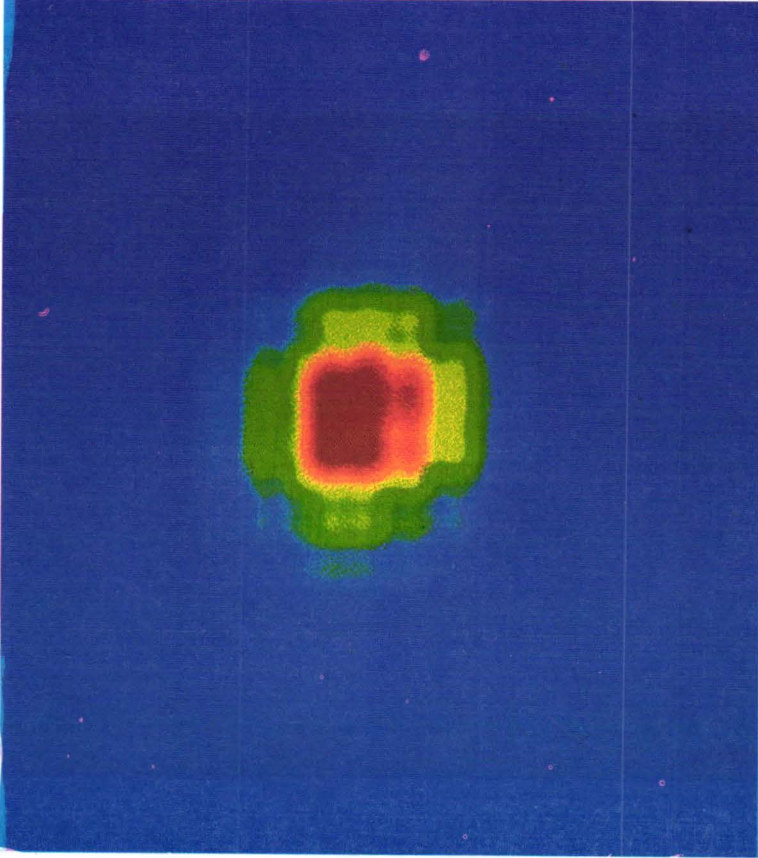
a Supernova, when its energy runs out Gravity will takeover and it will start to collapse. The process is remarkably rapid, there is no out burst, the star simply goes on becoming smaller and smaller, denser and denser. As it does so, the escape velocity rises and there comes a time when the escape velocity reaches 300,000 Km / See, this is the speed of light. So that not even light can escape from the strunken star and if light can not do so, then certainly nothing else can, because light is as first as anything in the universe up to now. The old star centre (core) has surrounded it self with a 'Forbidden area' from which absolutely nothing can escape. It has created a 'Black hole',– অর্থাৎ, একটি বৃহৎ আকৃতির নক্ষত্র 'সুপারনোভা' বিস্ফোরণের মাধ্যমে ধ্বংসের বিষয়টি বিবেচনা করুন, যখন এর আভ্যন্তরীণ জ্বালানী নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন এর মধ্যাকর্ষণ বল পুরো নক্ষত্রের উপর প্রচন্ড প্রভাব বিস্তার করে। ফলে কেন্দ্রমুখী তীব্রগতির মাধ্যমে পুরো নক্ষত্রে ধ্বংসপতনের তান্ডবলীলা শুরু হয়ে যায়। পদ্ধতিটি খুবই দ্রুত সংঘটিত হতে থাকে, কিন্তু কোন বহির্মূখী তৎপরতা থাকে না। প্রচন্ড ঘনায়নে নক্ষত্রটি ক্রমান্বয়ে ছোট হতে থাকে এবং ঘনত্ব বাড়তে থাকে। ফলে কেন্দ্রে 'মুক্তিগতি' (Escape velocity) বাড়তে বাড়তে আলোর গতির সমান অর্থাৎ, ৩০০,০০০ কিঃ মিঃ /সেঃ-এ পৌঁছে যায়। অতএব, তখন ধ্বংসপথের যাত্রী উক্ত নক্ষত্রের ভিতর থেকে আলো পর্যন্ত আত্মরক্ষা করতে পারে না। আর যেহেতু মহাবিশ্বে বর্তমান সময় পর্যন্ত আলোই হচ্ছে সবচেয়ে দ্রুততম বস্তু, তাই অন্য কোন বস্তুর আত্মরক্ষার চিন্তাই করা যায় না। এ অবস্থায় নক্ষত্রটি (প্রচন্ড চাপ এবং তাপের কারণে) ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং এর কেন্দ্রের চতুর্দিকে নিষিদ্ধ এলাকা তৈরী করে 'ব্ল্যাক হোলের' জন্ম দিয়ে থাকে। সৃষ্ট 'ব্ল্যাক হোলের' আকৃতি নির্ভর করে ধ্বংসপ্রাপ্ত নক্ষত্রের ভরের উপর। 'ব্ল্যাক হোলকে' সরাসরি দেখা যায় না, তবে তা থেকে নির্গত 'X-ray'-র চিহ্ন ধরে অনুমান করা হয় এর সঠিক অবস্থান। প্রায় প্রতিটি গ্যালাক্সীর কেন্দ্রেই 'ব্ল্যাক হোলের' অস্তিত্ব বিজ্ঞানীগণের কাছে ধরা পড়েছে। ইতোমধ্যে অসংখ্য বিরাট-বিরাট 'ব্ল্যাক হোলের' সম্ভাবনাময় ছবিও বিজ্ঞান মানবসমাজের হাতে তুলে দিতে সমর্থ

হয়েছে। কোন কোন গ্যালাক্সীর কেন্দ্রে অবস্থিত এক একটি ব্ল্যাক হোলের ভর মিলিয়ন-মিলিয়ন নক্ষত্রের সমষ্টিগত ভরের চেয়েও বেশি, যা প্রমাণ করে রাক্ষসী মৃত্যুকুপ 'Black hole' অগনিত-অসংখ্য নক্ষত্র এবং তাদের পরিবারকে ছিন্ন-ভিন্ন করে প্রতিনিয়ত ধ্বংসসাধন করে চলেছে। বর্তমান বিজ্ঞানীগণ এই ভয়ানক 'মৃত্যুকুপের' (Massive black hole) চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, যদি আমাদের এই প্রায় ৮ হাজার মাইল ব্যাসের পৃথিবীকে কোন 'Black hole'-এ পড়তে দেয়া যায় বা পৃথিবী কোন 'Black hole'-র আওতায় চলে যায়, তাহলে মুহূর্তের মধ্যেই গোটা পৃথিবী 'Black hole tunnel'-এ পতিত হয়ে প্রচন্ড ঘনায়নে মাত্র ১ সেঃমিঃ ছোট্ট একটি মার্বেল পাথরে পরিণত হবে। ভাবতে গেলে ভয়ে শরীর শিউরে উঠে, কি ভয়ানক অবস্থা। 'ব্ল্যাক হোলের' এই ভয়ানক অবস্থার কারণে এর পার্শ্ববর্তী কোন মহাজাগতিক বস্তুই তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না। ব্ল্যাক হোল তার ঐশ্বরিক শক্তির টানে নিকটবর্তী সকল বস্তুদের ছিঁড়ে-ফেঁড়ে গলাধঃকরণ করে সাবাড় করে থাকে।

অতি সম্প্রতি (জানুয়ারী-২০০০) Hubble Space Telescope এবং Ground base Telescope দিয়ে অষ্ট্রেলিয়া ও চিলির মান-মন্দির (Observatory) সমূহে আমাদের পৃথিবীর খুবই নিকটে মাত্র ১৬০০ আলোকবর্ষ দূরত্বে মহাশূন্য এলাকায় একটি ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্ব বিজ্ঞানীগণ আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছেন। আমরা এখনও জানি না আমাদের একেবারে নিকটবর্তী মহাকাশীয় এলাকায় প্রতিবেশী কাদের সর্বনাশ করে চলেছে উক্ত 'Black hole', সময়ের ব্যবধানে হয়তোবা পৃথিবীর মানুষ একদিন তা জানতে পারবে।

ওপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমাদের নিকট একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মহাশূন্যে মহাকাশীয় ব্যবস্থায় সৃষ্ট 'ব্ল্যাক-হোল' সবসময়ই নক্ষত্রসহ এর সৌর-ব্যবস্থার এক অব্যর্থ মরন ফাঁদ, যার হস্তক্ষেপ শুধু ধ্বংসই সাধন করে থাকে। দ্রুতগতিতে চলমান আলোসহ সকল কিছুই এর হাত থেকে রক্ষা পায় না।

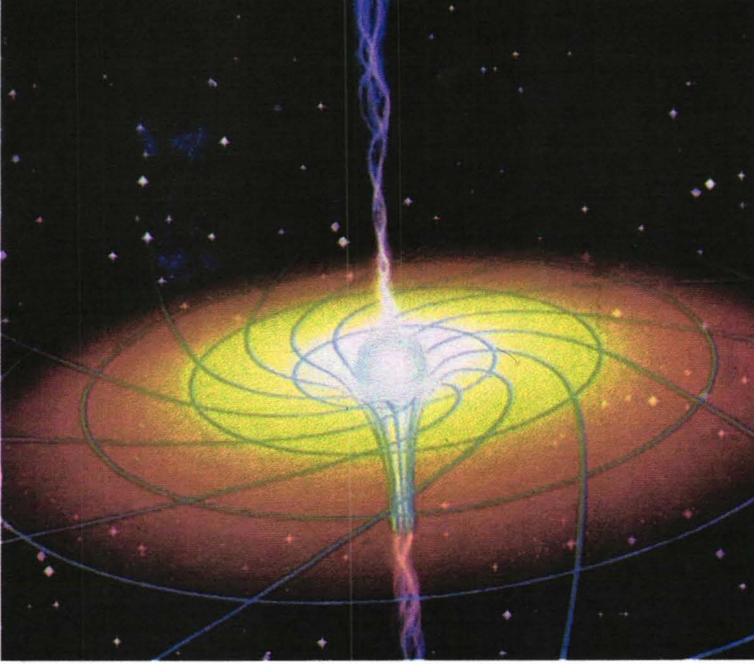
একাধিক নক্ষত্রের পারস্পরিক সংঘর্ষের (Collision) কারণেঃ বিজ্ঞানের বদৌলতে বর্তমানে মানবসম্প্রদায় মহাবিশ্বে মহাজাগতিক বিস্ময়কর বস্তু ও তাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করছে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি। অতিসম্প্রতি দুটি



চিত্রঃ ৮৪

"মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু উহারা উদাসীনতায় মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে।" (২১ ঃ ১)

- পৃথিবী থেকে মাত্র ১৫০০ আলোকবর্ষ দূরত্বে সুপার নোভা বিষ্ফোরণ থেকে জন্ম নিচ্ছে Black hole V4641। অতি সম্প্রতি বিজ্ঞানীগণ তা আবিষ্কার করেন। ফলে পৃথিবী ভয়ংকর এক প্রতিবেশীর নির্দয়থাবার আওতায় এসে গেছে। Black hole-টি কালক্রমে বৃহৎ রূপ নিলে পৃথিবী ঐ ব্ল্যাক হোলের ঐশ্বরিক টানে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যেতে পারে।



চিত্রঃ ৮৫

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহার প্রতি লক্ষ্য কর। নিদর্শনাবলী ও ভীতি প্রদর্শন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপকারে আসে না।" (১০ ঃ ১০১)

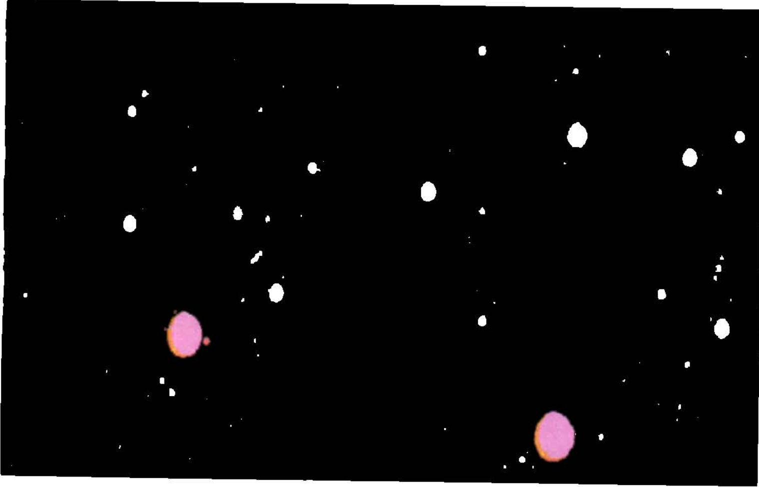
- মূলতঃ মধ্যাকর্ষনবলের (gravity) প্রচন্ড ঘণায়নকৃত ভয়ংকর তান্ডব-ই হচ্ছে Black hole-র মূল রহস্য। এই বল সমস্ত বস্তুকে Black hole Tunnel-এর মধ্যে ভেংগে ভেংগে মহাসুক্ষ্ম বিন্দুতে (Singulanity-তে) জমিয়ে দেয়। জীবনময় জগতের জন্য সত্যিই তা এক মহাবিপদ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।



চিত্রঃ ৮৬

"জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছি।" (৬ ঃ ৯৭)

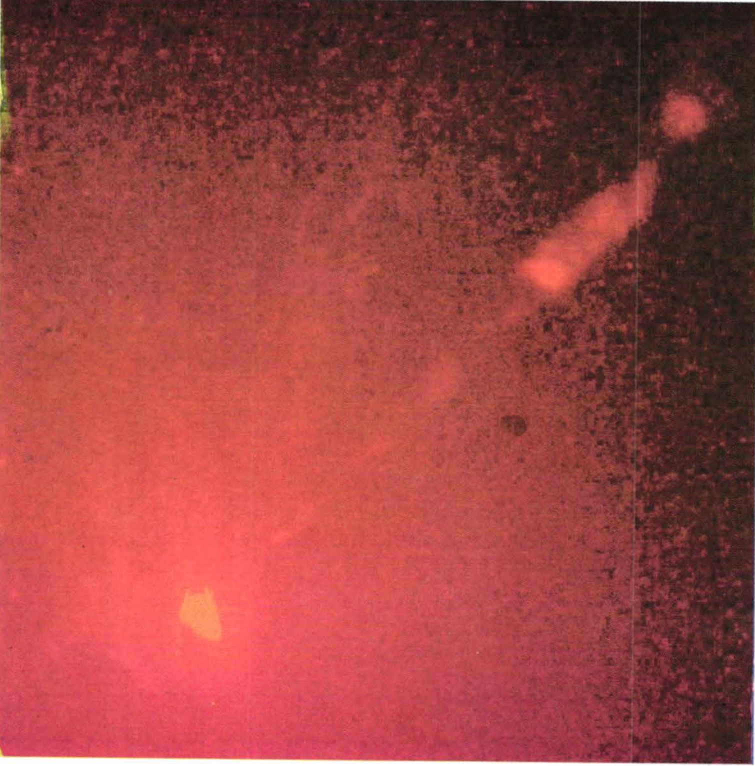
- মহাকাশে দূর্ধর্ষ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরিবেশে বিরাজ করছে অগণিত Black hole। যাদের নির্দয় থাবার ভয়ে জীবনময় জগতসমূহ সর্বদা সন্ত্রস্ত। শত বিস্ময়ের বিস্ময় হচ্ছে এই 'ব্ল্যাক হোল'।



চিত্রঃ ৮৭

"আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং যখন তিনি কিছু করিতে সিদ্ধান্ত করেন তখন শুধু বলেন, 'হও' আর অমনি তাহা হইয়া যায়।" (২ ঃ ১১৭)

- কম্পিউটার সিমুলেশন-এ একদিকে নক্ষত্র সম্বলিত স্বাভাবিক আকাশ এবং অপরদিকে একই স্থানে সৃষ্ট Black hole সম্বলিত আকাশকে (উভয় চিত্র 'Orion belt'-র) দেখানো হয়েছে। যেখানে স্বাভাবিক আকাশে নক্ষত্রসমূহ সর্বত্র বিরাজিত, কিন্তুঅপর ছবিতে ব্ল্যাক হোলের আগমন ঘটায় মধ্যস্থানে এক বিরাট এলাকার নক্ষত্রসমূহ গিলে খাওয়ায় শূন্য আকাশে পরিণত হয়েছে। এতে Black hole-এর ভয়াবহতা প্রকাশ পেয়েছে।



চিত্রঃ ৮৮

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তিনি জানেন।" (৬৪ ঃ ৪)

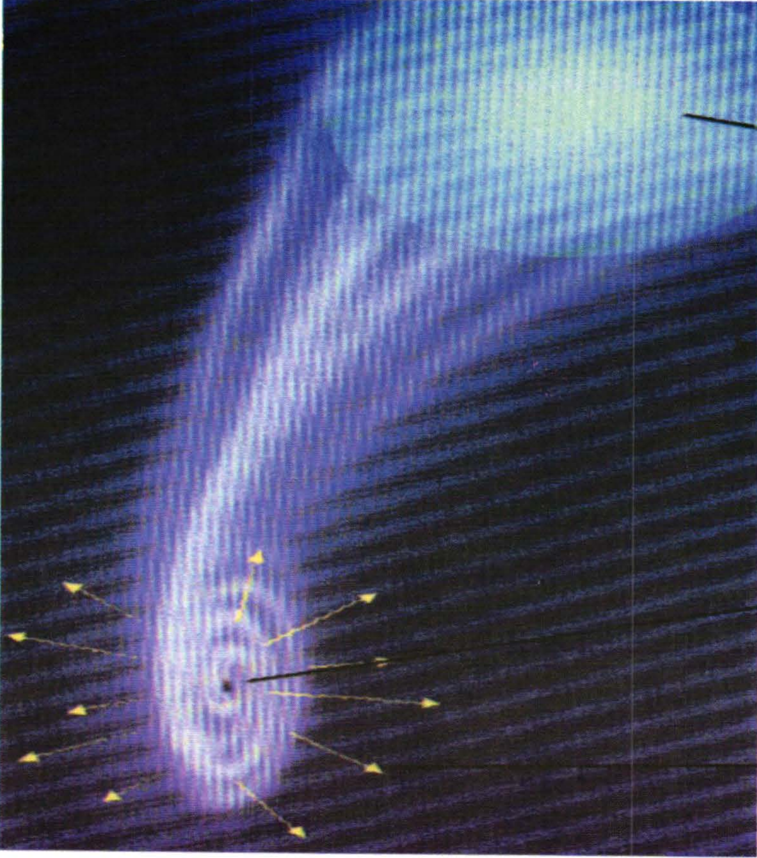
- ১৯৯৪ সালে 'হাবল স্পেস টেলিস্কোপ' দিয়ে ধারণকৃত M87 ইলেপটিক্যাল গ্যালাক্সীর কেন্দ্রের ছবি। যেখানে বিরাট এক ব্ল্যাকহোল অসংখ্য নক্ষত্র গিলে খেয়ে বৃহৎ আকৃতি ধারণ করে আছে। বিজ্ঞানীদের ভাষ্য হচ্ছে এই জাতীয় ব্ল্যাক হোল মিলিয়ন-মিলিয়ন নক্ষত্রকে খেয়ে সাবাড় করে গ্যালাক্সীদের কেন্দ্রে বসে আছে। পৃথিবীর ন্যায় গ্রহদের জন্য এই জাতিয় পরিবেশ কতইনা ভয়ংকর ও বিপদ সংকুল তা কি কল্পনা করা যায়?



চিত্রঃ ৮৯

"উহারা কোন নিদর্শন দেখিলে উপহাস করে। (৩৭ ঃ ১৪)

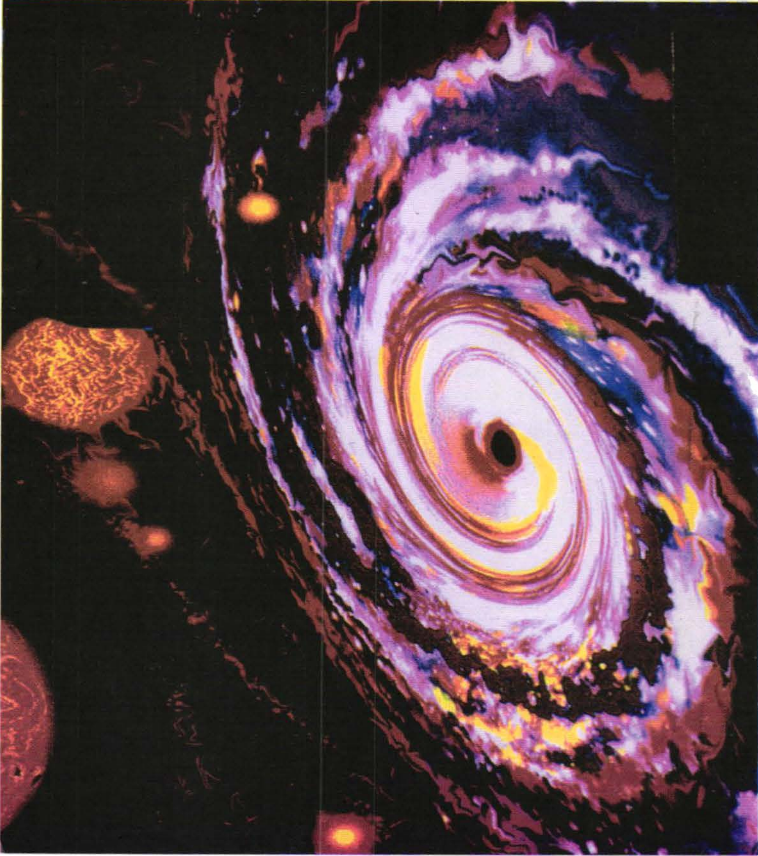
- ছবিটি অতি সম্প্রতি Huble Space Telescope দিয়ে Elleptical galaxy NGC 7052-র কেন্দ্র থেকে নেয়া। যেখানে ব্ল্যাক হোল মিলিয়ন মিলিয়ন নক্ষত্র ভক্ষণ করে বৃহদাকার (massive) Black hole-এ রূপ নিয়েছে। যার ধ্বংস সাধন ক্ষমতা বর্ণনা করার মত নয়। এই জাতিয় বৃহৎ ব্ল্যাক হোলের আওতায় জীবনময় গ্রহের অস্তিত্ব কল্পনা-ই করা যায় না।



চিত্রঃ ৯০

"যাহাদিগের চক্ষু ছিল অন্ধ আমার নিদর্শনের প্রতি এবং যাহারা শুনিতেও ছিল অক্ষম।" (১৮ ঃ ১০১)

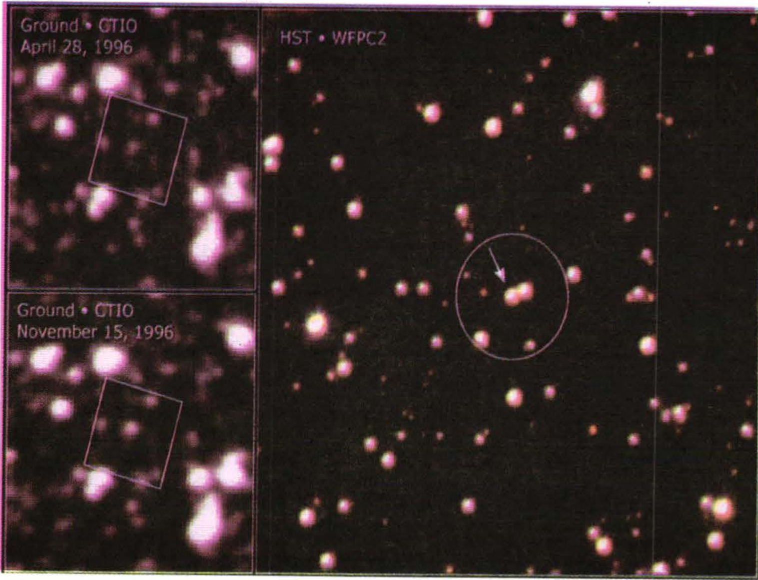
- ছবিতে একটি ব্ল্যাক হোল (Balck hole) তার নিকটবর্তী নক্ষত্রকে কিভাবে ছিঁড়ে ফেঁড়ে গলাধঃকরণ করছে, তা দেখানো হয়েছে। নক্ষত্রের যদি এই দূর্গতি ঘটে Balck hole-র আওতায়, তাহলে তার সৌর পরিবারের সদস্য গ্রহদের পরিণতির করুণ চিত্র কি ভাবা যায়?



চিত্রঃ ৯১

"আমি শপথ করিতেছি নক্ষত্র সমূহের ধ্বংসপতন স্থানের। অবশ্যই ইহা এক মহা শপথ যদি তোমরা বুঝিতে পারিতে।" (৫৬ ঃ ৭৫, ৭৬)

- মহাকাশে মহাবিস্ময়ের বিস্ময় রাক্ষসী Black hole। শত সহস্র সৌর ব্যবস্থা অভিকর্ষন বলের প্রচন্ড ঐশ্বরিক টানে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্ল্যাক হোল চোঙে (Tunnel) প্রবেশ করতে বাধ্য হয়ে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়। ভয়ংকর নয় কি? বর্তমান বিজ্ঞানের প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বে 'কুরআন' কি একই তথ্য পেশ করেনি?



চিত্রঃ ৯২

"আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করিয়াছি নির্ধারিত পরিমাপে, আমার আদেশতো একটি কথায় নিস্পন্ন 'চক্ষুর পলকের মত'।" (৫৪ ঃ ৪৯, ৫০)

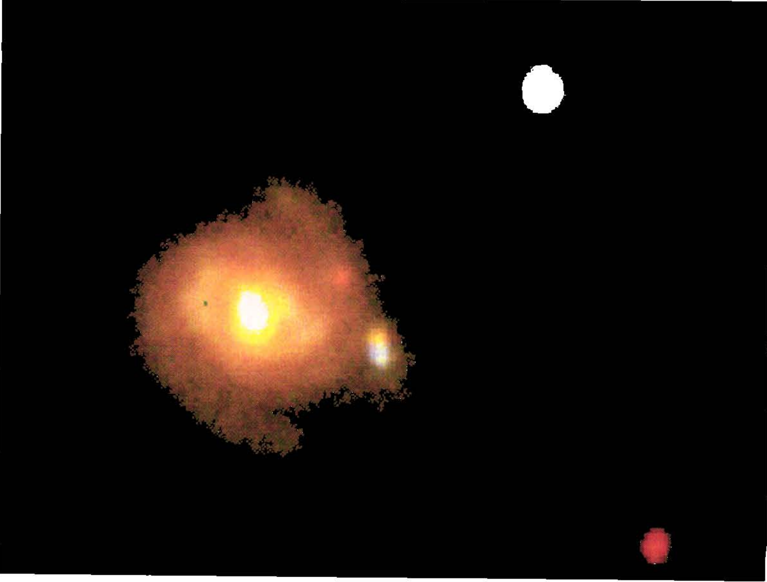
- পৃথিবী থেকে মাত্র ১৬০০ আলোকবর্ষ দূরে আবিস্কৃত Black hole যা সূর্যের চেয়ে প্রায় ছয়গুণ বড়। পৃথিবীর জন্য এটিও একটি বড় ধরনের বিপদ বৈকি! মহাজাগতিক কোন কারণে যদি উল্লেখিত ব্ল্যাক হোল ও পৃথিবী পরস্পরের কাছে চলে আসে তাহলে মূহুর্তেই পৃথিবী ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে ব্ল্যাক হোলের মধ্যে হারিয়ে যাবে চিরদিনের জন্য।

একাধিক নক্ষত্রের পারস্পরিক সংঘর্ষের (Collision) কারণে ঃ বিজ্ঞানের বদৌলতে বর্তমানে মানবসম্প্রদায় মহাবিশ্বে মহাজাগতিক বিস্ময়কর বস্তু ও তাদের কর্মাকন্ড সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করছে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি। অতিসম্প্রতি দুটি 'নক্ষত্রের' পারস্পরিক সংঘর্ষের কারণে এদের ধ্বংসের বিষয় আবিষ্কৃত হয়েছে বাস্তব ছবিসহ, যে বিষয়ে পূর্বে বিজ্ঞানীদের কোন ধারণা ছিল না।

প্রায় ৩০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বে 'গ্যালাক্সী NGC 664'-র মধ্যে দুটি নক্ষত্রের মধ্যে অভিকর্ষবলের প্রভাবে যে ভয়ংকর সংঘর্ষ ঘটে, তাতে উভয় নক্ষত্র-ই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে 'সুপার নোভা' (Super Nova)-র ধূলা-বালিতে রূপান্তরিত হয়ে পড়েছে। ফলে উভয়ের সৌর ব্যবস্থাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ছবিতে তুলনামূলক কম উত্তপ্ত সূর্যটি একটু হলদে দেখাচ্ছে এবং বেশি উত্তপ্ত সূর্যটি একটু নীলাভ দেখাচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে মহাবিশ্বের মাঝে মহাজাগতিক সকল বস্তুই ভাসমান এবং গতিশীল, কেউ স্থির নেই, আবার সে গতি পথ নির্ভর করছে বস্তুদের পারস্পরিক অভিকর্ষবলের প্রভাবের উপর। তাই কখনও কোন কারনে একটি নক্ষত্র তার চলার পথে অপর কোন নক্ষত্রের মধ্যাকর্ষণের আওতায় ঢুকে পড়লে প্রচন্ড গতিতে উভয়ে মুখোমুখী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে নিজেদের ধ্বংসসাধন ঘটিয়ে থাকে, তাতে উভয় নক্ষত্রের সৌর পরিবারও ধ্বংস হয়ে যায়। পর্যবেক্ষণে প্রমাণিত হয়েছে যে আমাদের সূর্যটি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২৫০ কিঃ মিটার গতিতে মহাশূন্যে পরিভ্রমন করছে। অতএব সংঘর্ষের ভয়াবহতা সহজেই অনুমেয়। তাই বলা যায় জীবনময় জগত ধ্বংসের ব্যাপারে এটিও একটি বড় ধরনের কারণ হতে পারে।

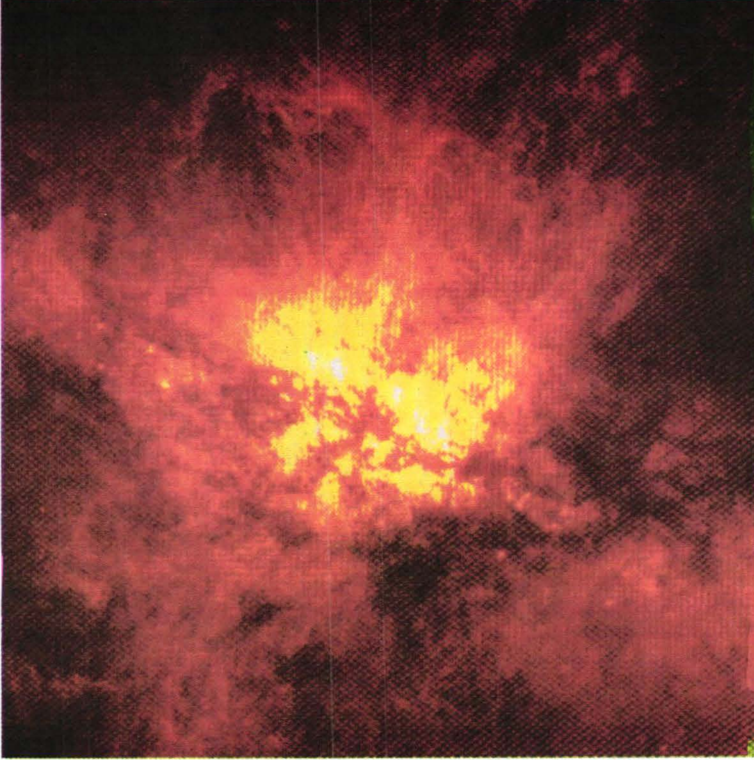
আমাদের সূর্যের চলার পথে যদি নিকটবর্তী নক্ষত্র প্রক্সিমা সেঞ্চুরী (Proxima Century) কোন কারণে এর মধ্যাকর্ষনের আওতায় ঢুকে পড়ে তাহলে সে অবস্থায় উভয় নক্ষত্র পারস্পরিক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়বে এবং তাতে জীবনময় গ্রহ এই পৃথিবীও ধ্বংস্তুপে পরিণত হবে। পূর্বে বিষয়টি বিজ্ঞানের অজানা থাকলেও বর্তমানে ব্যাপক অগ্রগতির ফলে মহাকাশে অনুরূপ সংঘর্ষে জড়িত একাধিক নক্ষত্রের ধ্বংসাবশেষ টেলিস্কোপের মাধ্যমে চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছে। ধারণকৃত ছবি বিশ্লেষণ সাপেক্ষে বিজ্ঞানীগণ জানাচ্ছেন যে, সংঘর্ষের ফলে উভয় নক্ষত্রের সৌর ব্যবস্থাও সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়েছে।



চিত্রঃ ৯৩

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রহিয়াছে। তাহারা এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তাহারা এই সকলের প্রতি উদাসীন।" (১২ ঃ ১০৫)

- ছবিতে NGC 664 স্পাইরেল গ্যালাক্সীর ভিতর দুটি নক্ষত্রের মধ্যে সংঘর্ষের কারণে তাদের উভয়ের সৌর ব্যবস্থাও যে ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে তা পর্যবেক্ষণের পর বিজ্ঞানীগণ একমত হয়েছেন। কেননা তাতে ধ্বংসের তান্ডবের পরিমাণ ছিল $১০^{৩০}$ মেঘাটন (এক লিখে তার পিঠে ৩০টি শূন্য বসবে) TNT-র সমান। পৃথিবী থেকে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে বিধায় ঘটনাটি ছোট দেখাচ্ছে। সুতরাং নক্ষত্র যুদ্ধ বা একাধিক নক্ষত্রের সংঘর্ষের কারনেও জীবনময় জগত নিশ্চিহ্ন হতে পারে। মহাকাশে আবিষ্কৃত ঘটনাসমূহ তারই প্রমান বহন করছে।



চিত্রঃ ৯৪

"উহারাই তাহারা (অবিশ্বাসী), আল্লাহ্ যাহাদিগের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষু মোহর করিয়া দিয়াছেন এবং উহারাই গাফিল।" (১৬ ঃ ১০৮)

- একাধিক নক্ষত্রের সংঘর্ষ মহাকাশে মহাপ্রলয়ের এক বিভৎস রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে যেখানে জীবনের সকল স্পন্দন চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে। এমনকি সেখানে গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্র সবাই সংঘর্ষের প্রচন্ডতায় উড়ন্ত ধূলা-বালিতে ও পদার্থেল গলিত রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ এক ভয়ংকর সর্বনাশা ধ্বংসীয় পদ্ধতি যা ভাবা যায় না।

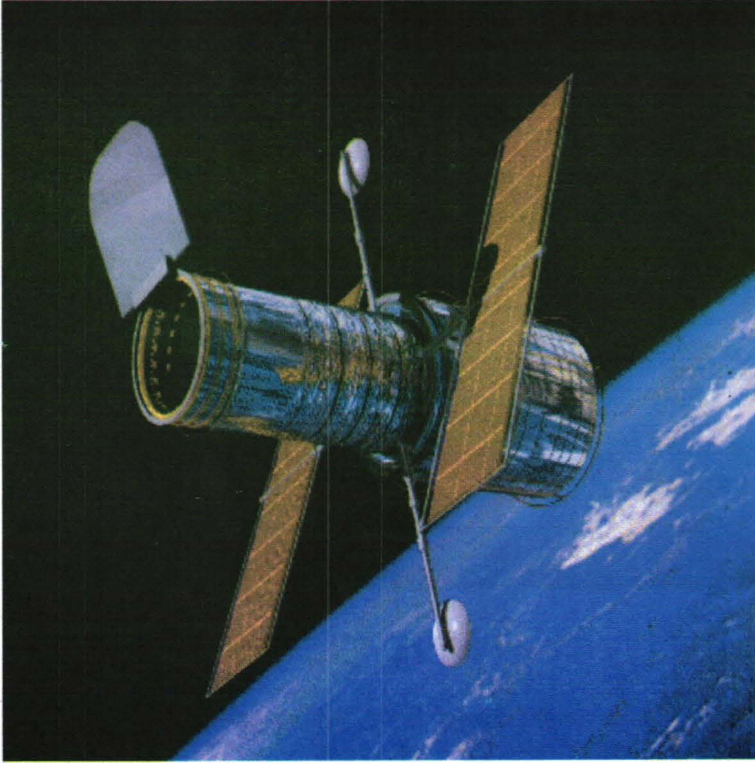


চিত্রঃ ৯৫

"আমার নিদর্শন সম্পর্কে যাহারা বিতর্ক করে, তাহাদিগের জানা উচিত যে, তাহাদিগেরও কোন নিস্কৃতি নাই।" (৪২ ঃ ৩৫)

- আমাদের সূর্যের নিকটবর্তী নক্ষত্র Proxima Century Star মাত্র গড়ে ৪ আলোকবর্ষ দূরত্বে আছে। তাই উভয়ের মাঝে যদি সংঘর্ষ ঘটে তাহলে সুন্দর এই পৃথিবী মূহুর্তেই ধ্বংসের মধ্যে তলিয়ে যাবে। কেননা আমাদের সূর্যের ব্যাস প্রায় ৮৬ লক্ষ মাইল এবং প্রক্সিমা সেঞ্চুরী নক্ষত্রটিও অনুরূপ ব্যাস সম্পন্ন প্রায়। তাই অত বিশার-বিশাল দু'টি নক্ষত্রের মাঝে প্রচন্ড গতিতে সংঘর্ষ ঘটলে অনুল্লেখযোগ্য গ্রহ এই পৃথিবী সেই ভয়ংকর প্রলয়ে চিরদিনের জন্য ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাওয়ার-ই কথা।

একাধিক গ্যালাক্সীর পারস্পরিক (Collision) সংঘর্ষের কারণেঃ এ মহাবিশ্বে ব্যাপকভাবে একই সাথে বহু সৌরজগত কিংবা গ্রহ ব্যবস্থা ধ্বংস হওয়ার যে ভয়ংকর পদ্ধতিটি ইতোমধ্যেই আবিষ্কৃত হয়ে সমগ্র বিজ্ঞান জগতকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে, তাহলো বিলিয়ন-বিলিয়ন নক্ষত্র নিয়ে গঠিত গ্যালাক্সীদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক 'সংঘর্ষ'। ১৯৯০ সালে হাবেল স্পেস্ টেলিস্কোপ মহাশূন্যে স্থাপন করে আকাশ পর্যবেক্ষণ করার পূর্বে এ



চিত্রঃ ৯৬

"আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন রহস্য নাই, যাহা সুস্পষ্ট কিতাবে নাই।" (২৭ ঃ ৭৫)

- 'বিজ্ঞান' আকাশে লুকায়িত গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটনে সাফল্যের সাথে 'হাবল স্পেস টেলিস্কোপ'কে ব্যবহার করে কুরআনের পক্ষে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

সম্পর্কে মানবসম্প্রদায় তেমন একটা জ্ঞান লাভ করতে পারেনি। অধূনা হাবেল স্পেস টেলিস্কোপ পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৬০০ কিঃ মিটার ওপরে মহাশূন্যে অবস্থান করে মহাকাশের হাজারো অজানা-অচেনা বিষয়ের ওপর থেকে এক এক করে পর্দা সরিয়ে তাদের সম্পর্কে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য এবং ছবি সরবরাহ করে মিথ্যা অহংকারে গর্বিত মানবমন্ডলীর চিন্তার রাজ্যকে দোলা দিয়ে যাচ্ছে। এমন এমন সব আশ্চর্য করার মত বিষয় হাবেল স্পেস টেলিস্কোপ উদ্‌ঘাটন করতে সমর্থ হচ্ছে–যে এই বিষয়ে ভাবতে গেলে মানুষ স্বভাবতই খেই হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হচ্ছে।

সম্প্রতি NASA-র 'Goddard Space Flight Centre' – এ Mr. 'Kirk Borne' একটি বিজ্ঞানী দলকে নিয়ে প্রায় তিন বিলিয়ন লাইট ইয়ার দূরে অবস্থিত ১২৩টি 'Ultra luminous infrared galaxy'-র উপরে তিন বৎসর থেকে গবেষণা চালিয়ে দেখতে পান যে এদের ৩০% গ্যালাক্সীর গঠন এবং আচরণের জটিলতা প্রমান করে যে এরা পূর্বে একাধিক সংঘর্ষে (Collision) জড়িত ছিল। শুধু তাই নয়, উক্ত সংঘর্ষে একই সাথে ৩টি, ৪টি, এমনকি ৫টি গ্যালাক্সী পর্যন্ত জড়িয়ে পড়েছিল। অথচ এই সেদিনও বিশ্বাস করা হতো এ ধরণের Galaxy collision-এ মাত্র ২টি Galaxy-ই জড়িত হয়ে থাকতে পারে।

মহাকাশে গ্যালাক্সীদের এই জাতীয় পারস্পরিক সংঘর্ষ এদের মধ্যস্থিত মহাকর্ষবলের জন্যই সাধারণতঃ ঘটে থাকে, উক্ত সংঘর্ষে গ্যালাক্সীদের অভ্যন্তরে পূর্বেই সৃষ্টি হয়ে থাকা শত-সহস্র-লক্ষ-কোটি সৌরজগত প্রচন্ড ধ্বংসের তান্ডবে উড়ন্ত ধূলিকণার মেঘে পরিণত হয়ে যায়। প্রতি সেকেন্ডে প্রায় হাজার-হাজার মাইল বেগে গ্যালাক্সীদের ভিতর ধাবিত হতে থাকে উক্ত ধূলিকণা। লক্ষ-লক্ষ আলোকবর্ষব্যাপী এই বর্ণনাতীত ভয়ংকর ধ্বংসযজ্ঞ চলতে থাকে দীর্ঘ সময় ধরে। কখনও কখনও এই জাতীয় সংঘর্ষে একাধিক গ্যালাক্সিকে ক্রমান্বয়ে ভেংগে চুরে একটি গ্যালাক্সীতেও পরিণত করে দেয়। সৃষ্টিতে এই জাতীয় একাধিক গ্যালাক্সীর সাংঘর্ষিক অবস্থা সত্য-সত্যই মানব মনে এক ভাবনার বিষয়, যা দূর দূরান্তে (Far distance)-বেশি সংঘটিত হয়ে নতুন এক চিন্তায় জগত যেন উম্মুক্ত করে যাচ্ছে। আগামী দিনগুলোতে আমরা আশা করি আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করতে হয়তোবা সমর্থ হবো।



চিত্রঃ ৯৭

"শপথ তাহাদিগের, যাহারা নির্মমভাবে উৎপাটন (ধ্বংসযজ্ঞ) ঘটায়।" (৭৯ ঃ ১)

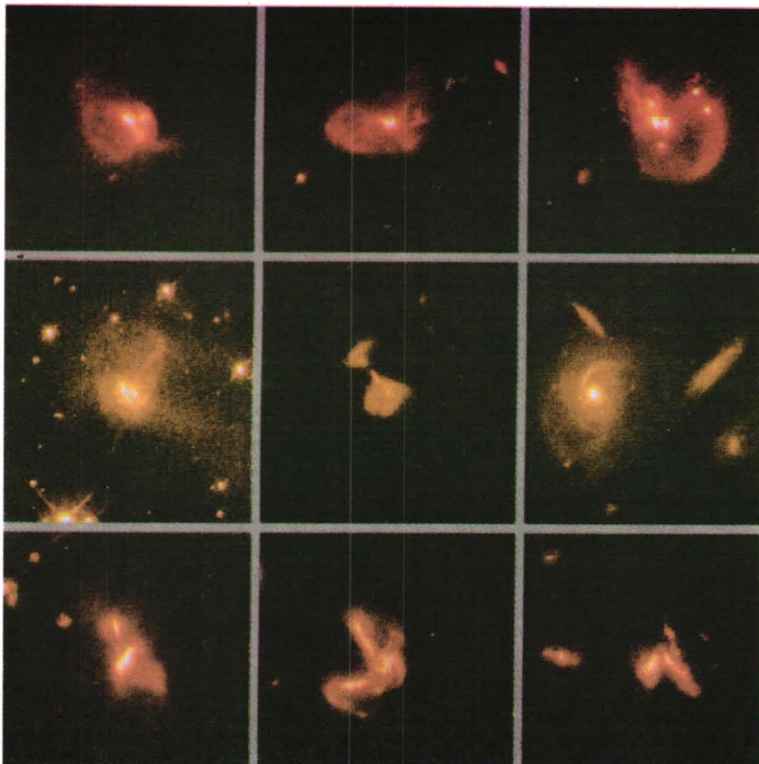
ছবিতে ৪টি গ্যালাক্সী নিজেদের মধ্যাকর্ষন বলের প্রভাবে পারস্পারিক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে। ফলে তাদের মধ্যকার অসংখ্য সৌরজগতও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।



চিত্রঃ ৯৮

"তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের কোন্ সতর্কবাণীকে অস্বীকার করিবে?"
(৫৫ ঃ ৩৮)

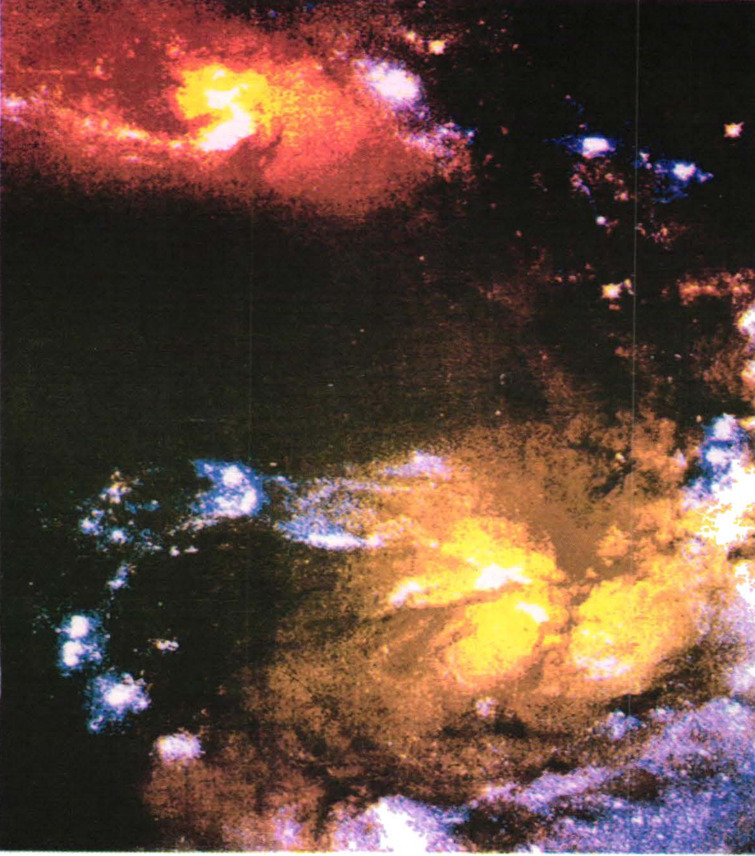
- মহাকাশের প্রান্তসীমানায় প্রতিনিয়ত অসংখ্য গ্যালাক্সী পারস্পরিক মহাসংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে ধ্বংস করছে বহু জীবনময় জগত, বহু নক্ষত্র ও তাদের সৌর ব্যবস্থা। 'ব্ল্যাক হোল' থেকেও এই ধ্বংসীয় পদ্ধতি খুবই ভয়ংকর ও ধ্বংসশীল।



চিত্রঃ ৯৯

"উহারা আকাশের কোন খন্ড ভাঙ্গিয়া পড়িতে দেখিলে বলিবে, ইহাতো এক পঞ্জীভূত মেঘ।" (৫২ ঃ ৪৪)

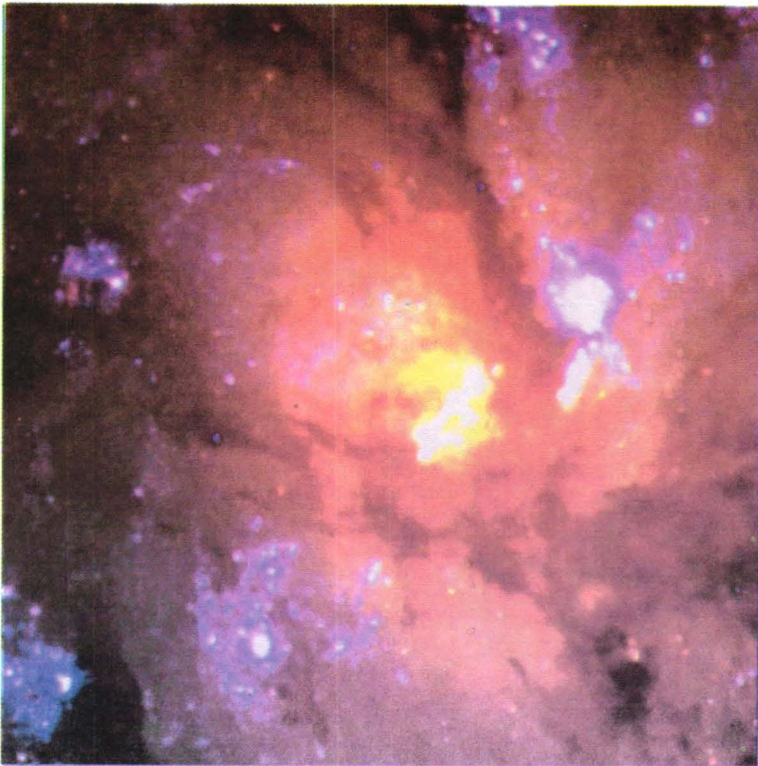
- গড়ে প্রায় ২০ হাজার কোটি নক্ষত্র অধ্যুষিত গ্যালাক্সী একসাথে ৫টি, ৬টিও পারস্পরিক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে, যে সংঘর্ষের ভয়াবহতা মানবজ্ঞানে ব্যাখ্যা করা খুবই দুরূহ ব্যাপার বৈকি!



চিত্রঃ ১০০

"উহারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে না। কিয়ামাতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকিবে তাঁহার হাতের মুষ্ঠিতে এবং আকাশমন্ডলী থাকিবে তাঁহার করায়ত্ত।"
(৩৯ ঃ ৬৭)

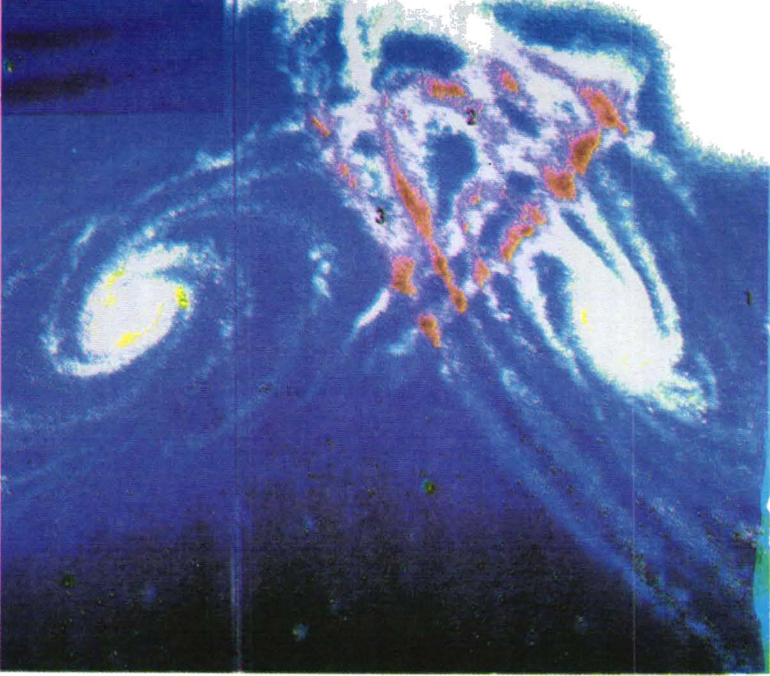
- পারস্পরিক সংঘর্ষে জড়িত হয়ে অসংখ্য জগত ধ্বংস করছে 'এ্যানটেনা গ্যালাক্সী' (Antena galaxy)। পৃথিবী থেকে বিজ্ঞানীগণ টেলিস্কোপ দিয়ে সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করছেন সে ভয়াবহ দৃশ্য। সংঘর্ষে সহস্র-সহস্র নক্ষত্র তাদের সৌর পরিবারসহ বাস্তবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে জ্ঞানবান মানব সমাজের চোখের সামনেই। আশ্চর্য হবার মত নয় কি?



চিত্রঃ ১০১

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর চাবি-কাঠি তাঁহারই নিকট।" (৩৯ ঃ ৬৩)

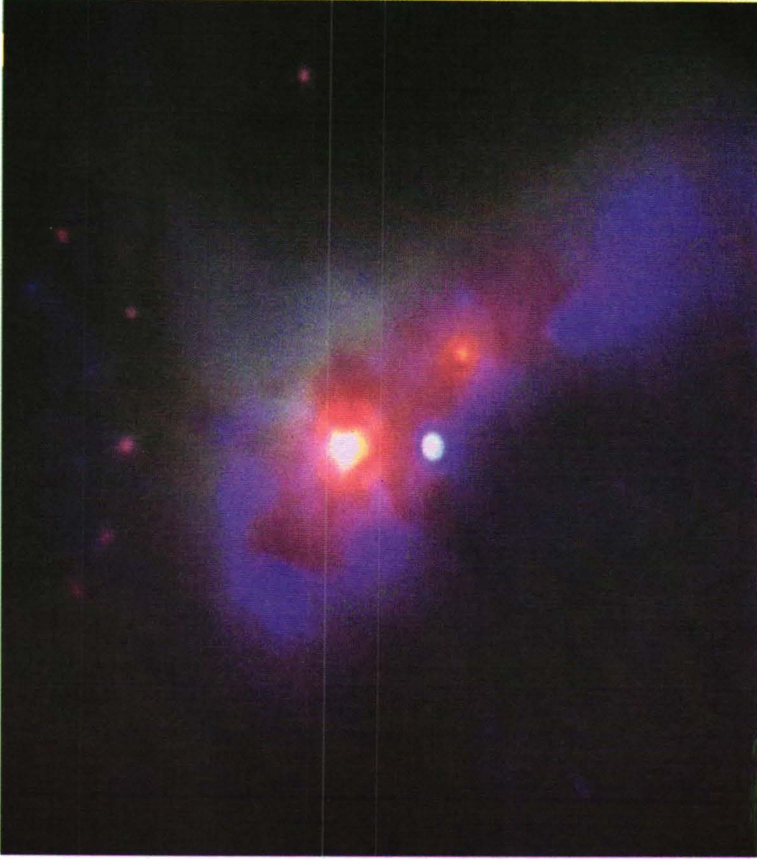
- গ্যালাক্সীদের মাঝে পারস্পরিক সংঘর্ষের তান্ডবলীলা চলতে থাকে শত-সহস্র বৎসর ধরে এবং ঘটতে থাকে জীবনময় অসংখ্য জগতের পরিসমাপ্তি। জীবনময় কোন গ্রহ ব্যবস্থা তাতে জড়িয়ে গেলে এর পরিণতি কি ভেবে ভেবে কুল করা যায়? এই জাতিয় ধ্বংসে অবশিষ্ট রূপে যা থাকে তা হলো উড়ন্ত ধূলা-বালি।



চিত্রঃ ১০২

"আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর কর্মবিধায়ক।" (৩৯ ঃ ৬২)

- গ্যালাক্সীদের পারস্পরিক সংঘর্ষে যে ভয়ংকর মহাধ্বংসের তান্ডব মেতে উঠে মহাকাশে তা ছবিতে ধারণ করা হয়েছে। ছবির অংশটুকু কয়েক লক্ষ আলোকবর্ষব্যাপী বিস্তৃত Antenae galaxies 'collision'। যেখানে কোটি কোটি সৌর ব্যবস্থা ধ্বংসের প্রচন্ডতায় ছিন্ন-ভিন্ন ও জ্বলে-পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।



চিত্রঃ ১০৩

"যেইদিন উহারা ইহা (কিয়ামাত) প্রত্যক্ষ করিবে, সেইদিন উহাদিগের মনে হইবে যেন উহারা পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা বা এক সকাল অবস্থান করিয়াছে।"
(৭৯ ঃ ৪৬)

- ESO 202 – G23 দুটি গ্যালাক্সীর মাঝে কয়েক হাজার মিলিয়ন বছর ধরে সংঘটিত হয়ে আসা ব্যাপক সংঘর্ষ ছবিতে ধারণ করা হয়েছে। গ্যালাক্সী দু'টির গড়ে ৪০,০০০ কোটি সৌর ব্যবস্থার অধিকাংশই সংঘর্ষের প্রচন্ডতায় জ্বলে-পুড়ে ও ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কি সাংঘাতিক-ই না সে পরিস্থিতি!

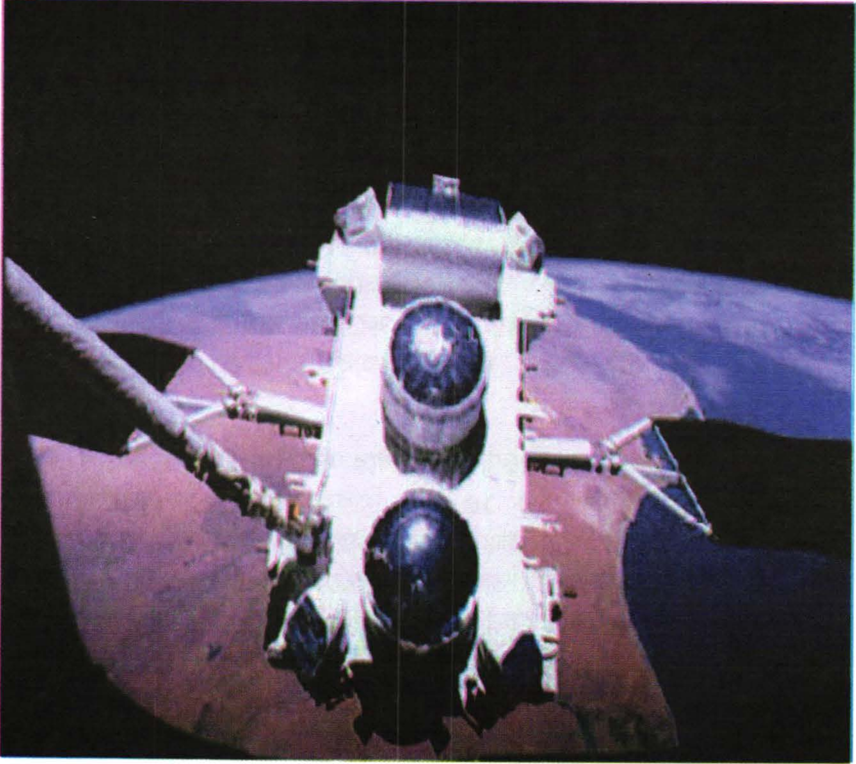
সমগ্র গ্যালাক্সী শূন্যের কোঠায় (Singularity) গমনেঃ উক্ত বিষয়টি মানবজ্ঞানের আওতায় সবচেয়ে বেশি বিপদ সঙ্কুল ও হতাশাময়, যার সাথে অন্যকোন বিষয় বা ঘটনা তুলনারও যোগ্য নয়। পূর্বে বিজ্ঞান বিষয়টি আমলে না আনলেও বর্তমানে কিন্তু উল্লেখিত বিষয়ে বিজ্ঞানের-ই ভাবনা সবার চেয়ে বেশি হয়ে দেখা দিয়েছে। সুক্ষ্ম-সতর্কতার সাথে জ্ঞানপূর্ণ ভাবনার মাধ্যমে বিষয়টির অভ্যন্তরে প্রবেশ না করলে শুধুমাত্র হাল্কা দৃষ্টিকোণ দিয়ে মূল ব্যাপারটি বোধগম্যের সীমানায় আনতে পারা অনেক পন্ডিত ব্যক্তির পক্ষেও যে কঠিন হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

চরম উৎকর্ষীত প্রযুক্তির হীরন্ময় কিরণে উদ্ভাসিত বর্তমান বিজ্ঞান জগত তার সর্বোচ্চ অগ্রযাত্রায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সাফল্যজনকভাবে পদচারনার সাথে সাথে মহাকাশ বিজ্ঞানেও এনেছে এক নতুন দিগন্ত। অধূনা আবিষ্কৃত অত্যাধূনিক টেলিস্কোপ বিভিন্ন প্রকার স্যাটেলাইটে সংস্থাপন করে মহাশূন্য থেকে মহাবিশ্বের প্রায় প্রান্তসীমানা পর্যন্ত দর্শন সীমা সম্প্রসারিত করতে সমর্থ হয়েছে। যে সাফল্যকে ছোট করে দেখার কারও কোন অবকাশ নেই। মহাশূন্যে কর্মরত উল্লেখিত ধরণের কয়েকটি নাম করা উদ্যোগ হচ্ছে- 'হাবেল স্পেস টেলিস্কোপ, কম্পটন্ অব্জারভেটরী, চন্দ্র এ্যাক্স-রে অবজারভেটরী ইত্যাদি।

ভূ-পৃষ্ঠ থেকে শত শত কিলোমিটার ওপরে মহাশূন্যে উক্ত টেলিস্কোপ সমূহ ব্যবহার করে বিজ্ঞানীগণ প্রায় ১৫,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের অর্থাৎ আনুমানিক বস্তু জগতের প্রায় প্রান্ত সীমানায় মহাজাগতিক বস্তু - 'গ্যালাক্সী' ও 'কোয়াসার' পর্যবেক্ষণ করছেন। তাদের সেই পর্যবেক্ষণে ধারণকৃত উক্ত বস্তুসমূহ থেকে আগত 'আলোককে' স্পেকট্রোস্কোপিতে (Spectroscopy)পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে ঐ বস্তুগুলো প্রায় আলোর গতির কাছাকাছি গতিতে মহাবিশ্বের অজানা পথে হারিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি 'গ্যালাক্সী' এবং 'কোয়াসার' ঐ দূরত্বের মাঝে যেভাবে ক্রমান্বয়ে তাদের গতি বৃদ্ধি করছে ঠিক তেমনিভাবে বিপরীত দিকে তাদের আকৃতি ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে এবং তাদের নির্গত আলোও ব্যাপক থেকে ব্যাপকহারে হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে।

আমেরিকান মহাকাশ বিজ্ঞানী 'মিঃ ইডুইন হাবেল পাওয়েল' স্পেকট্রোস্কোপির (Spectroscopy) সাহায্যে দূরবর্তী অঞ্চলের দিকে ধাবমান ঐ সকল গ্যালাক্সীর 'রেড শিফট' পর্যবেক্ষণ করে প্রমাণ করেন যে, প্রতিটি 'গ্যালাক্সী' এবং 'কোয়াসার' প্রতি ৩.২৬ মিলিয়ন আলোক বর্ষ দূরত্বের পর প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৫০ মাইল হারে

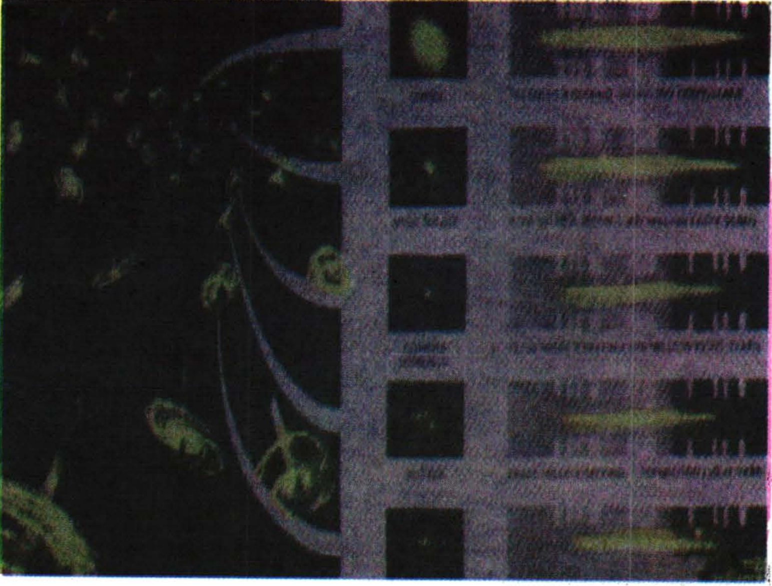
গতিবেগ বাড়িয়ে ক্রমান্বয়ে দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে মহাবিশ্বের প্রান্ত সীমানার দিকে হারিয়ে যাচ্ছে। উক্ত হিসেবে আবিষ্কৃত 'রেডিও গ্যালাক্সী 3C-295' প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৯০,০০০ মাইল গতিবেগে আমাদের নিকট থেকে বস্তুজগতের শেষপ্রান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। একই হিসেবে আবিষ্কৃত '06-172 কোয়াসারটি'ও প্রায় আলোর গতির কাছাকাছি (৯০%) গতিবেগপ্রাপ্ত হয়ে ক্ষুদ্রাকৃতি ধারণ করে চূড়ান্ত সীমানায় পৌঁছে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীগণ হিসেব করে দেখেছেন যে



চিত্রঃ ১০৪

"তিনিই মানুষকে জ্ঞাত করাইয়াছেন ইতিপূর্বে মানুষ যাহা জানিত না।"
(৯৬ ঃ ৫)

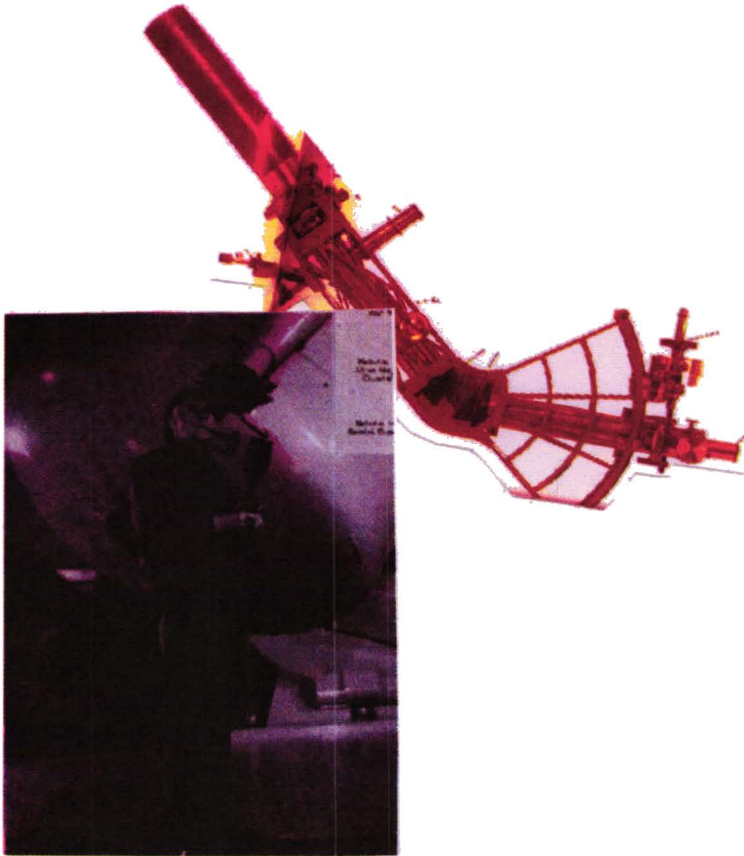
- Compton Gamma Ray Observatory বিংশ শতাব্দির বিজ্ঞানের বড় ধরনের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। এর মাধ্যমে বিজ্ঞান বস্তুজগতের অদৃশ্য হাজারো মহাকাশীয় আশ্চর্যজনক সংবাদ মানব সমাজের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছে।



চিত্রঃ ১০৫

"শপথ নক্ষত্র সমষ্টির (গ্যালাক্সীর) যাহারা পশ্চাদপসারনে নিরত এবং যাহারা ভাসিয়া বেড়ায় ও অদৃশ্য হইয়া যায়।" (৮১ ঃ ১৫, ১৬)

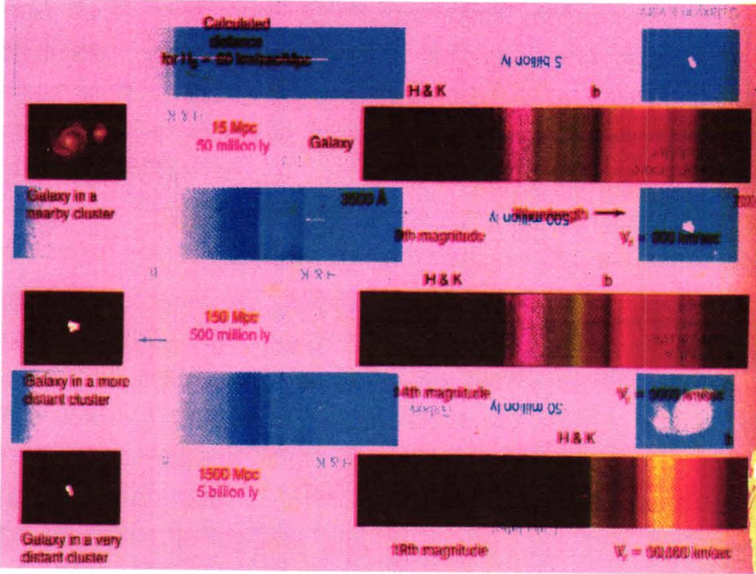
- গড়ে প্রায় ২০,০০০ কোটি নক্ষত্র সমৃদ্ধ হচ্ছে এক একটি গ্যালাক্সী। মহাকাশের মহাশূন্যতায় উক্ত গ্যালাক্সীসমূহ উড়তে গিয়ে ক্রমান্বয়ে যে হারে গতি বাড়িয়ে দেয়, তদ্রুপ গতিমুখের বিপরীতে চাপ বৃদ্ধি জনিত কারণে(তাতে)আদি আকৃতির হ্রাস ঘটতে থাকে।



চিত্রঃ ১০৬

"বস্তুতঃ চক্ষুতো অন্ধ নয়, অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়।" (২২ ঃ ৪৬)

- আমেরিকান মহাকাশ বিজ্ঞানী 'মিঃ ইডুইনি হাবেল পাওয়েল' মহাকাশে গ্যালাক্সীদের রহস্যপূর্ণ আচরণ সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন।



চিত্রঃ ১০৭

"শপথ ঐ তারকা পুঞ্জের (গ্যালাক্সীর) যখন উহারা অদৃশ্য হইয়া যায়।"
(৫৩ ঃ ১)

- বর্তমান বিজ্ঞান বর্নালী বীক্ষণ যন্ত্রের (Spectroscopy) সাহায্যে দূরবর্তী গ্যালাক্সীসমূহ থেকে আগত আলোকরশ্মির red shift ও blue shift পরীক্ষা করে তাদের গতি, অবস্থান ও উপাদানসহ অনেক তথ্যই যথাযথভাবে লাভ করতে সমর্থ হন। ছবিতে বস্তুজগতের প্রায় শেষ প্রান্তের দিকে পৌছে যাওয়া সঙ্কুচিত ক্ষুদ্র গ্যালাক্সী চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রচন্ড গতির কারণে আর স্বল্প সময় পরেই মহা সূক্ষ্ম বিন্দুতে জমে যাবে।

পৃথিবী থেকে প্রায় ১৩,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বের পরে মহজাগতিক বস্তুসমূহ প্রায় আলোর গতিপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে বাহ্যিক আকৃতি হারিয়ে (আকৃতি হবে প্রায় শূন্যের কোঠায়) মহাকাশের প্রান্তসীমানায় মহাশূন্যে উড়ে যাচ্ছে।

বর্তমান বিজ্ঞান প্রমাণ সাপেক্ষে জানাচ্ছে যে, যে সকল বস্তু (গ্যালাক্সী, কোয়াসার) মহাজাগতিক নিয়মে মহাকাশের মহাশূন্যে পরিভ্রমন করতে গিয়ে যখন প্রায় আলোর গতির সমান গতি অর্জন করে, তখন তাদের আকৃতি ও ভরে এক অভাবনীয় পরিবর্তন সূচীত হয়। 'ফিট্ জিরাল্ড কন্ট্রাকশান্' (Fitez Gerald Contraction) ও আইনষ্টাইনের 'ভরবেগ তুল্যতার' সমীকরণ ($E=mc^2$) হতে আমরা জান্তে পারি যে, চলন্ত বস্তুর গতিবেগ যদি ক্রমাগতভাবে বাড়ানো যায়, তাহলে বস্তুটির মূল আকৃতি গতির দিকে ক্রমান্বয়ে ছোট হতে থাকে। উল্লেখিত সমীকরণ হতে প্রমাণিত হয় যে, কোন বস্তু যদি ৭ মাইল/সেকেন্ড গতিতে সামনের দিকে ধাবিত হতে পারে, তাহলে এর গতি মূখের অনুকুলে মূল আকৃতি এক বিলিয়ন ভাগের প্রায় দু'ভাগ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। এ হিসেবে ৯৩,০০০ মাইল/সেকেন্ড গতিতে চলমান বস্তুটি সঙ্কুচিত হবে এর মূল আকৃতির প্রায় ১৫ ভাগ, গতি বাড়িয়ে যদি বস্তুটিকে ১৬৩,০০০ মাইল/সেকেন্ড গতিতে ধাবিত করা যায়, তাহলে চলমান বস্তুটি আদি আকৃতির প্রায় ৫০ ভাগ সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। এরপর আরো গতি বাড়িয়ে যদি ১৮৬,২৮২ মাইল/সেকেন্ড করা যায় তাহলে আলোর ঝলকের ন্যায় গতিপ্রাপ্ত বস্তুটি চূড়ান্তরূপে সঙ্কুচিত হবে এবং চলার অনুকুলে তার আকৃতি প্রায় 'শূন্যের কোঠায়' দাড়াবে। যার সমীকরণটি হচ্ছে- $L = Lo\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$

প্রাথমিক পর্যায়ে বিজ্ঞানের উক্ত তথ্যে সঙ্কোচনের সাথে ভরের বিষয়টি উল্লেখিত না হওয়ায় পরবর্তীতে ওলন্দাজ পদার্থ বিজ্ঞানী 'হ্যান্ডরিক এ্যানটোন লরেন্টজ' (Hendrik Antoon Lorentz) পূর্বের আবিষ্কারকে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান, তিনি দেখান যে, অস্বাভাবিক গতির মাধ্যমে গতির দিকে বস্তুর দৈর্ঘ্য সঙ্কুচিত হওয়ার কারণে তার আকৃতি কমতে থাকলেও 'ভর' বৃদ্ধি পায় গতির অনুপাতে $m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$ তিনি প্রমান করেন ৯৩,০০০ মাইল/সেকেন্ড গতিতে বস্তুর ভর সরাসরি ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। বস্তুর গতি আরও বেড়ে ১৬৩,০০০ মাইল/সেকেন্ড-এ উন্নীত হলে এর 'ভর' আদি 'ভরের' দ্বিগুণ হয়ে যায়, অর্থাৎ তখন 'ভর' বৃদ্ধি ঘটে প্রায়



চিত্রঃ ১০৮

"আল্লাহত্ম বাণীর কোন পরিবর্তন নাই। ইহা এক মহা সাফল্য।" (১০ ঃ ৬৪)

- মহাকাশের সবচেয়ে বড় সংগঠন গ্যালাক্সী ও কোয়াসার মহাজাগতিক নিয়মে বাধ্য হয়ে তাদের উড়ন্ত গতি একদিকে বৃদ্ধি ঘটিয়ে বস্তুজগতের প্রান্ত সীমানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আবার অপরদিকে গতিবৃদ্ধির কারনে আকৃতি সঙ্কুচিত করে কোনঠাসা হয়ে ক্ষুদ্রত্বে (Singularity) প্রবেশ করছে।

১০০ ভাগ, অতঃপর যদি বস্তুর গতি আলোর গতির সমান হয়ে পড়ে তাহলে, বস্তুটির ভর বৃদ্ধি পেয়ে মানবীয় জ্ঞানের অবোধগম্য এক অসীম স্কেলে (Infinite Scale) চলে যায়। বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব বরেণ্য বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনসহ অনেকেই নিরেট বাস্তবতার কারণেই এ তত্ত্বটিকে স্বীকৃতি দান করেছেন। 'লরেন্ট্জ ফিট্জ জিরাল্ড' সমীকরণটি $L=L_o\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$ বর্তমান বিজ্ঞান বিশ্বে তাই সুপ্রতিষ্ঠিত আসনে সমাসীন হতে পেরেছে। বিজ্ঞান বর্তমানে খুবই সুক্ষ্ম-সতর্কতা এবং প্রচুর আবেগ নিয়ে প্রায় ১৩,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের আকৃতি হ্রাসপ্রাপ্ত বস্তুর উপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছে। কারণ এ মহাবিশ্বের প্রথম সৃষ্টির শুভক্ষণটিও 'বিগ্-ব্যাংগ' নামক এমনি ধরনের এক অতি ক্ষুদ্র আশ্চর্য রকমের মহাসুক্ষ্ম বিন্দুবত চেহারায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। অবাক করার মত মাত্র 10^{-32}cm. অতি সুক্ষ্ম বিন্দুতে বর্তমান তাবৎ মহাবিশ্বের বস্তুভর সমষ্টি একত্রিত ও মহাসঙ্কোচন অবস্থায় আট্কা ছিল। অতিক্ষুদ্র মাত্র 10^{-43} sec–সময়ে 'বিগ-ব্যাংগ' নামক এক প্রচন্ড বিষ্ফোরণের মাধ্যমে সেই 10^{-32}cm. মহাসুক্ষ্ম বিন্দুটি অবিশ্বাস্য তার মহাসম্প্রসারণ ঘটিয়ে বর্তমানে প্রায় ১০০ কোটি গ্যালাক্সী সমৃদ্ধ ২০,০০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ (প্রায়) ব্যাপী বিস্তৃত আমাদের মহাবিশ্বের আকার ধারণ করেছে।

চলতি একবিংশ শতাব্দীর শুভলগ্নে (জানুয়ারী-২০০০) আমেরিকান স্পেস সেন্টার 'NASA' পৃথিবীর কক্ষপথে আবর্তনরত 'The Compton Gamma-ray Observatory' কর্তৃক ১১,০০০ মিলিয়ন লাইট ইয়ার (আলোকবর্ষ) দূরত্বের পরে আবিষ্কৃত 'কোয়াসার- 4C.71.07' সম্পর্কে এক বড় আশ্চর্যজনক সংবাদ গোটা বিশ্বময় প্রচার করেছে। বিগত কয়েক বছর থেকেই বিজ্ঞানীগণ দৃষ্টির প্রায় প্রান্তসীমায় আবিষ্কৃত এই কোয়াসারের ওপর উক্ত স্যাটেলাইটের মাধ্যমে নজর রাখছিলেন। ১৯৯৫ সালের ২০শে নভেম্বর এই 'কোয়াসারের' উজ্জলতা ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়। এর ৫৫ দিন পর এই অস্বাভাবিক উজ্জলতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে। অতঃপর প্রায় ৩ মাস পরে এর উজ্জলতা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়। বর্তমানে কোয়াসারটির নির্গত উজ্জলতা এবং গামা-রে (Gamma-ray) পূর্বের সর্বোচ্চ রেকর্ড তো দূরের কথা পূর্বের স্বাভাবিক স্কেল থেকেও অনেক অনেক নীচে নেমে গেছে। আমাদের সৌর জগতের দেড়গুণ সমান আকৃতির এই কোয়াসারটি বিলিয়ন-বিলিয়ন (কোটি কোটি) নক্ষত্র প্যাক্ট অবস্থায় বুকে ধারণ করে সম্ভবত আলোর গতির কাছাকাছি



চিত্রঃ ১০৯

"তিনি তোমাদিগকে বহু নিদর্শন দেখাইয়া থাকেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহ্র কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করিবে?" (৪০ ঃ ৮১)

- এক একটি কোয়াসারের উজ্জল্য গড়ে ১০০টি গ্যালাক্সীর উজ্জল্যের সমান হওয়া সত্ত্বেও বস্তুজগতের প্রান্ত সীমানার দিকে (প্রায় ১৫০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বে) মহাজাগতিক নিয়মে কোনঠাসা হয়ে ক্ষুদ্র হয়ে সকল উজ্জল্য হারিয়ে ফেলছে এবং এক মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। কি ভয়ংকর ঘটনা।



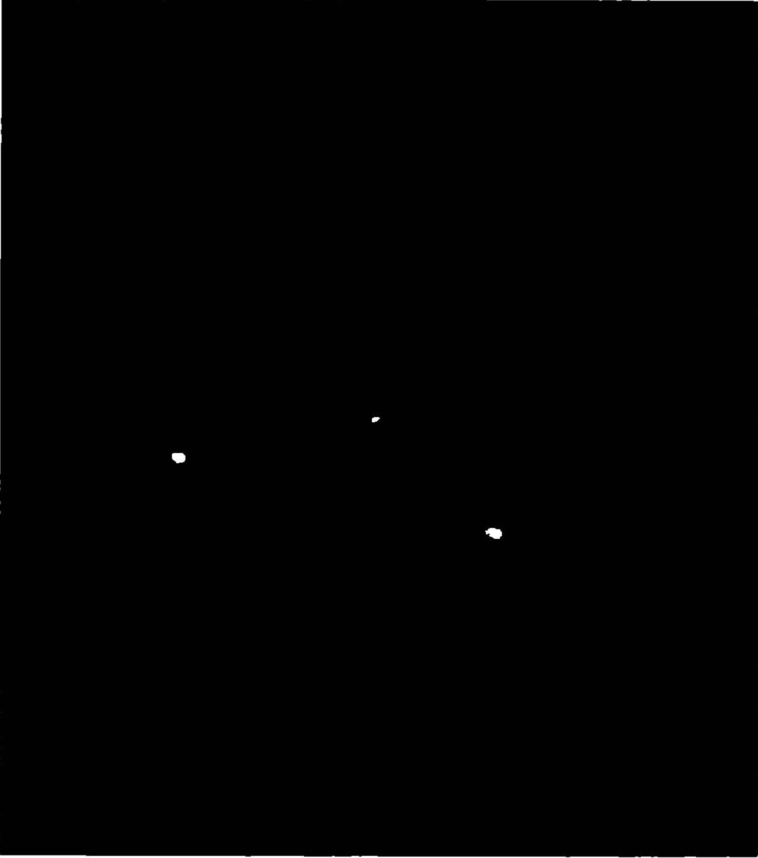
চিত্রঃ ১১০

"প্রত্যেক সংবাদ প্রকাশের নির্দিষ্ট সময় রহিয়াছে।" (৬ ঃ ৬৭)

- জানুয়ারী ২০০০ইং The Compton Gamma-Ray observatory-র তথ্য প্রকাশিত হয় যে, ১১০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বে 'কোয়াসার' 4C.71.07 এখন মৃত্যু পথযাত্রী এবং খুবই মৃদুভাবে হালকা গামা-রে নির্গত করছে। এখন আর তার পূর্বে ন্যায় প্রচন্ড তেজস্ক্রিয়তাও নেই এবং আকৃতিও নেই। সবই নিঃশেষ হয়ে গেছে। বাকী আছে ধ্বংস তথা মহাসূক্ষ্ম এক বিন্দুতে (Singularity) উপনীত হওয়া।

গতিতে উড়ন্তবস্থায় ভ্রমনে রত থাকায় আদি আকৃতির ব্যাপক সঙ্কোচনের মধ্য দিয়ে মহাসুক্ষ্ম বিন্দুর দিকে (Singularity) দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে নির্গত 'গামা-রে'-এর উৎস কোটি-কোটি নক্ষত্র দিয়ে ঠাসাঠাসিভাবে পূর্ণ 'কোয়াসার' মহাজাগতিক কঠিন এক ব্যবস্থার (মহাসংকোচন ও ব্ল্যাক হোল) মধ্য দিয়ে কোনঠাসা হয়ে ক্রমান্বয়ে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেল্‌ছে। আর সে কারনেই সম্ভবতঃ চূড়ান্ত ধ্বংসের মুহূর্তেই সর্বোচ্চ বিকীরণসহ উজ্জলতা প্রদর্শন করেছিল। এখন শেষ পরিণতির লক্ষণ হিসেবে যতসামান্য গামা-রে নির্গত (Gamma-ray emission) হচ্ছে। আর স্বল্প সময়ের ব্যবধানে হয়তোবা মহাসংকোচনের চূড়ান্ত চাপে মহাসুক্ষ্ম বিন্দুতে (Singularity) প্রবেশ করে 'কোয়াসারটি' (Radio galaxy-টি) তার দৃশ্যমান অস্তিত্বের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করবে। গামা-রে নির্গত হওয়াও চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। বিষয়টি বড়ই চমৎকার, তাই নয় কি? মহাকাশে মহাবিস্ময়কর অবস্থা দর্শন করে তার ব্যাখ্যা দিতে দিতে বিজ্ঞান একেবারে ধর্মের পদতলেই যে দাড়িয়ে গিয়েছে! বর্তমান বিজ্ঞান যে নির্ভীক, সত্যপ্রিয় ও সত্যভাষী উল্লেখিত বক্তব্য থেকে তা প্রমাণ হয়েছে।

ওপরের গুরুত্বপূর্ণ ও হতবাক করার মত আলোচনায় বিজ্ঞান তার উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের মহাবিশ্বের প্রায় প্রান্তসীমানার দিকে দ্রুত গতিতে উড়ে যাওয়া 'গ্যালাক্সী' এবং 'কোয়াসারের' মহাবিপদ সঙ্কুল অবস্থার যে চিত্র-চরিত্র তুলে ধরেছে তাতে আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি যে, মহাজাগতিক ঐ বস্তুগুলো মহাসুক্ষ্ম বিন্দুতে (Singularity) উপনীত হওয়ার বহু পূর্বেই এদের অভ্যন্তরে ব্যাপক ধ্বংসের তান্ডব লীলা শুরু হয়ে যায়। গ্যালাক্সী বা কোয়াসার ৯৩,০০০ মাইল/সেকেন্ড গতি প্রাপ্ত হওয়া মাত্র এদের আকৃতি ১৫ ভাগ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ফলে 'গ্যালাক্সী' বা 'কোয়াসারের' চতুর্দিকে প্রান্তসীমানার নক্ষত্রসমূহ প্রচন্ড চাপে এদের অবস্থানে আর স্থির থাকতে না পেরে ভিতরের দিকে চাপতে থাকে। ফলে এদের নিজেদের মধ্যে মহাকর্ষবলের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে পারস্পরিক বাধ্যতামূলক সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায় এবং ঐ অবস্থায় এরা ক্রমাগত প্রচন্ড ঘনায়ণের কারণে চতুর্দিক হতে ভেংগে-চুরে 'গ্যালাক্সী' বা 'কোয়াসারের' কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হতে থাকে। ফলে আভ্যন্তরীণ ভারসাম্যের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হওয়ায় সমগ্র গ্যালাক্সীর অভ্যন্তরেই বর্ণনাতীত এক মহাধবংসযজ্ঞ শুরু হয়ে এর মূল অস্তিত্ব-ই ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়। যেহেতু ক্রমান্বয়ে গতি কেবলই বাড়তে থাকে তাই তাদের আভ্যন্তরীণ ধ্বংসের তান্ডবলীলাও সঙ্কোচনের কারণে শুধু বাড়তেই থাকে।



চিত্রঃ ১১১

"তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর লুকায়িত বা অদৃশ্য বস্তুকে প্রকাশ করেন।"
(২৭ ঃ ২৫)

- বস্তুজগতের প্রান্তসীমানায় চূড়ান্ত ধ্বংসের নিকটবর্তী মৃত্যুপথযাত্রী কোয়াসার RD J30117 + 002025 প্রায় ১৩০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বে (Constellation Cetus-এ) অতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং পৃথিবীবাসীকে শেষ অভিভাদন জানিয়ে বিদায় নিতে যাচ্ছে। ছবিতে মাঝখানে লাল ক্ষুদ্র বিন্দুটি হচ্ছে উক্ত কোয়াসার। এ তথ্য উদঘাটনে আজ বিজ্ঞানী মহলেও হতাশা ছেয়ে গেছে এবং তাদের মুখে উচ্চারিত হচ্ছে 'Where are we going?'

এ অবস্থায় 'গ্যালাক্সী' বা 'কোয়াসারের' আওতায় কোন নক্ষত্র বা সৌরজগতই আর নিরাপদ থাকতে পারে না। সবাই ভেংগে-চুরে, ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে ধূলা-বালির মেঘে পরিণত হয়। আর সেই নক্ষত্র ধ্বংসবাশেষকে মহাসঙ্কোচনের অনিবার্য পথে দ্রুত থেকে দ্রুততর সঙ্কোচন কাজে সহায়তা করে সমগ্র গ্যালাক্সীকে মহাসুক্ষ্ম বিন্দুতে (Singularity) পৌঁছাবার নিমিত্তে বৃহৎ বৃহৎ ব্ল্যাক হোল (Massive black hole) যারা পূর্ব থেকেই প্রতিটি গ্যালাক্সীর কেন্দ্রে অবস্থান করছে, সক্রিয় থেকে সব গিলে-গিলে ওদের চৌঙের ভেতর শেষপ্রান্তে মহাসুক্ষ্ম বিন্দুতে জমাতে থাকে।

বর্তমান বিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য রকমের উল্লেখিত রিপোর্ট জীবনময় গ্রহ তথা সৌরজগত ধ্বংসের আপাততঃ আবিষ্কৃত ৮টি ব্যবস্থার মধ্যে এ সর্বশেষ ব্যবস্থাটি সবচেয়ে বেশি ভয়াবহ এবং কার্যকর, বাকী ৭টি ব্যবস্থা ভিন্ন-ভিন্ন বৈশিষ্ট সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও উক্ত সর্বশেষ ব্যবস্থাটি এমনি এক মহাজ্ঞানের সর্বোচ্চ কৌশলগত পরিকল্পনায় রচিত যে, উক্ত পদ্ধতিতে মহাপ্রলয় চলাকালে আবিষ্কৃত ৮টি ব্যবস্থাকেই এখানে কার্যরত দেখা যায়। ঘূর্ণনরত অবস্থায় প্রবল বেগে গ্যালাক্সীসমূহ উড়তে গিয়ে চতুর্দিক থেকেই যখন প্রচন্ড চাপে আকৃতিতে ছোট হতে থাকে তখন গ্যালাক্সীর অভ্যন্তরে ব্যাপক বিশৃংখলার কারণে–গ্রহানু, ধূমকেতু, সুপার নোভা জঞ্জাল ও নক্ষত্র সব এলোপাথাড়ী চলতে গিয়ে পরস্পর-পরস্পরের সাথে ব্যাপক সংঘর্ষে জড়িয়ে গিয়ে ধ্বংসজজ্ঞকে লক্ষ-কোটি গুণে বর্ধিত করে তোলে। এদিকে গ্যালাক্সীর কেন্দ্রে ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকা বৃহৎ-বৃহৎ 'ব্ল্যাক হোল'গুলোও ভয়ংকর চেহারায় আবির্ভূত হয়ে সব গলাধঃকরণ করে সাবাড় করতে থাকে। ফলে গোটা গ্যালাক্সীকে (গড়ে প্রায় বিশ হাজার কোটি নক্ষত্রসহ) 'ব্ল্যাক হোল চৌঙের' ভিতর দিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে পরিচালিত করে মহাসুক্ষ্ম এক বিন্দুতে (Singularity) নিয়ে জড়ো করে। পরবর্তীতে যে বিন্দুটি (প্রায় 10^{-32}cm বিন্দুটির মত) আবার নতুন করে 'বিগ-ব্যাংগ'-র ন্যায় নতুন জগত সৃষ্টির জন্য প্রচন্ড বিস্ফোরণ ঘটাবার অপেক্ষায় প্রহর গুণতে থাকে।

জীবনময় জগতসহ সৌরজগত এবং অন্যান্য মহাজাগতিক ব্যবস্থা ধ্বংস সাধনের ব্যাপারে 'সমগ্র গ্যালাক্সী শূন্যের কোঠায় গমন' ব্যবস্থাটি আবিষ্কৃত ৮টি ব্যবস্থার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভয়ংকর ও কার্যকর।

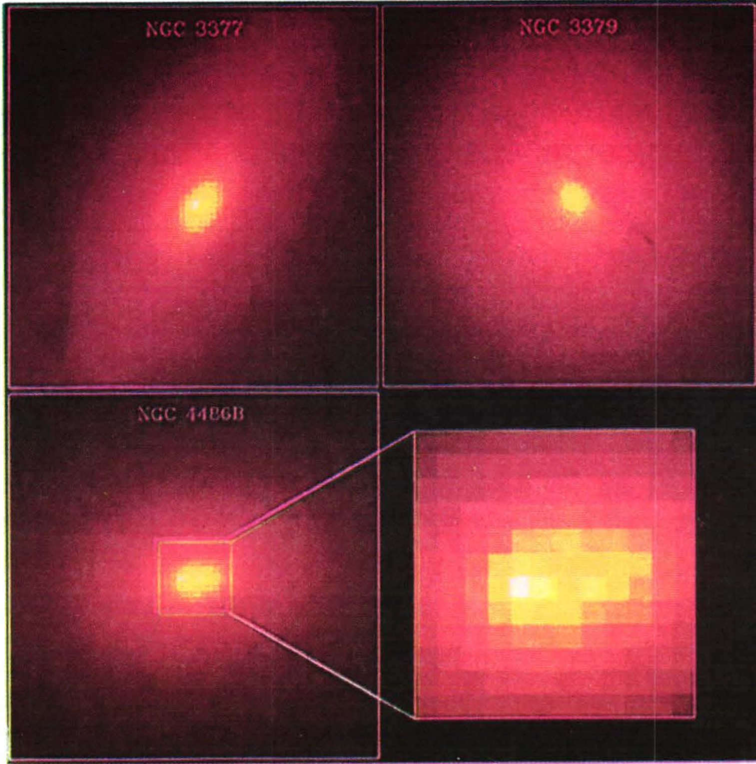
'কুরআনে' বর্ণিত 'মহাপ্রলয়' বা 'কিয়ামাত দিবস' সম্পর্কিত আলোচনা এবং বর্তমান বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত উদ্‌ঘাটিত পৃথিবীর ধ্বংসবিষয়ক বাস্তব



চিত্রঃ ১১২

"সেইদিন সংঘটিত হইবে মহাপ্রলয় এবং আকাশ বিদীর্ণ হইয়া বিশ্লিষ্ট (ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন) হইয়া পড়িবে।" (৬৯ ঃ ১৩-১৬)

- প্রচন্ড গতির কারণে ঘূর্ণনরত এগিয়ে চলা গ্যালাক্সীসমূহ চতুর্দিকের প্রান্ত হতে সঙ্কুচিত হয়ে ছোট হতে থাকায় ক্রমান্বয়ে কেন্দ্রের দিকে মহাজাগতিক বস্তুদেরকে ছুটে যেতে বাধ্য করবে এবং তাতে বিশৃংখল পরিবেশের সৃষ্টি করবে ফলে ধূমকেতু, গ্রহানু, উল্কা, উপগ্রহ, গ্রহ এমনকি নক্ষত্রও ব্যাপক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়বে এবং তাতে ধ্বংস হবে জীবনময় জগতগুলো। উক্ত পদ্ধতিতে সকল প্রকার বর্ণিত ধ্বংসীয় তান্ডব-ই পরিলক্ষিত হবে।



চিত্রঃ ১১৩

"আমি শপথ করিতেছি নক্ষত্র পতনস্থানের, ইহা এক গুরুতর শপথ যদি তোমরা জানিতে।" (৫৬ ঃ ৭৫, ৭৬)

- অতি সম্প্রতি প্রমানীত হয়েছে প্রায় প্রতিটি গ্যালাক্সীর কেন্দ্রে সৃষ্টি হয়ে আছে বৃহৎ বৃহৎ ব্ল্যাক হোল (Massive Black hole)। সমগ্র গ্যালাক্সীর বস্তুভরকে সুড়ঙ্গ পথে মহাসঙ্কোচনের মাধ্যমে মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে (Singularity) জমিয়ে দিতে অদ্বিতীয় এক মোক্ষম ব্যবস্থা যা মানবীয় কল্পনাকেও হার মানায়।

তথ্য ও ছবি অবহিত হওয়ার পরও কি 'কিয়ামাত' নিয়ে আর হাস্যরস করার কিংবা উপহাস করার সুযোগ আছে ? প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্ব থেকে যে 'মহাধ্বংসের' ব্যাপারে 'কুরআন' ভূ-পৃষ্ঠের মানবমন্ডলীকে সাবধান-সতর্ক করে আসছে, আজকের গর্বিত বিজ্ঞান কি তা হাতে-কলমে প্রমাণ করেনি ? তাহলে 'কুরআন' যে 'সত্য-সঠিক' এবং 'বিজ্ঞানময়' তা অকপটে স্বীকার করতে আপত্তি কোথায় ?

এবারে দীর্ঘ আলোচিত 'কিয়ামাত' বিষয়ে উপস্থাপিত 'কুরআনিক ও বৈজ্ঞানিক' বক্তব্যকে সংক্ষিপ্তাকারে এক নজরে দেখে নিই।

এক নজর

আল্-কুরআন	বর্তমান বিজ্ঞান
(১) " উহারা কি নিজদিগের অন্তরে ভাবিয়া দেখে না যে, আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও উহাদিগের অন্তরবর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন যথাযথভাবে এবং এক নির্দিষ্ট কালের জন্য ? কিন্তু মানুষের মধ্যে অনেকেই তাহাদিগের প্রতিপালকের সাক্ষাতে অবিশ্বাসী।" (৩০ ঃ ৮) "উহারা আল্লাহ্র যথোচিত সম্মান করে না। কিয়ামাতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকিবে তাঁহার হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমন্ডলী থাকিবে তাঁহার করায়ত্ব।" (৩৯ ঃ ৬৭) **"শপথ মহাধ্বংস দিবসের।" (৭৫ ঃ ১)** "নিশ্চয় বিচারের দিন নির্দিষ্ট রহিয়াছে।" (৭৮ ঃ ১৭) "হে মানুষ ভয় কর তোমাদিগের প্রতিপালককে,	(১) বিজ্ঞানের শৈশবকালে আমাদের এ মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং ধ্বংস নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে কাল্পনিক ও অবাস্তব একাধিক প্রস্তাব দীর্ঘদিন থেকে আসন গেড়ে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হলেও বর্তমান কিন্তু উৎকর্ষীত বিজ্ঞান যুগে তা পুরোপুরি তিরোহীত হয়েছে। (দেখুন 'আল-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স সিরিজ-১') ১৯৬৫ সালে সৃষ্টিতত্ত্বঃ 'বিগ-ব্যাংগ' প্রমানীত হওয়ায়, আমাদের মহাবিশ্বটি পর্যায়ক্রমে যে ধ্বংস হবে সে ব্যাপারে বর্তমান বিজ্ঞানীগণ দ্বিমত করছেন না। কারন যার সৃষ্টি রয়েছে, তার একসময় ধ্বংস অনিবার্য। আবিষ্কৃত থার্মোডায়নামিক্স (Thermodynamics) বা 'তাপ গতিবিদ্যার' দ্বিতীয় আইনও প্রমান করেছে যে মহাবিশ্বে তাপীয় বস্তু

কিয়ামাতের প্রকম্পন এক ভয়াবহ ব্যাপার।" (২২ ঃ ১)

"তখন চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে।" (৭৫ ঃ ৭)

"কিয়ামাত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে।" (৫৪ ঃ ১)

থেকে তাপ বা উষ্ণতা অনবরত তুলনামূলক কম তাপীয় বস্তুতে স্থানান্তরীত হচ্ছে। এতে প্রমানীত হয় যে, মহাবিশ্বে যত প্রকার তাপীয় উৎস রয়েছে তারা একদিন তাপ বিতরন করতে করতে নিঃশেষ হয়ে গিয়ে মহাবিশ্ব কে ধ্বংসের গহব্বরে নিক্ষেপ করবে। ফলে চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র এবং এ পৃথিবী একদিন নির্ঘাত ধ্বংসের মধ্যে নিপতীত হবে।

এটা ছাড়াও বর্তমান বিজ্ঞান-বিশ্ব টেলিস্কোপ প্রযুক্তির উৎকর্ষতার কারনে ইতোমধ্যেই মহাকাশ পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে বিজ্ঞানীগণ সরাসরি সুপার নোভা বিস্ফোরন, একাধিক সূর্যের মধ্যে সংঘর্ষ, একাধিক গ্যালাক্সীর মধ্যে সংঘর্ষ (Collision), ব্ল্যাক হোলের রাক্ষসী টান, গ্রহানু বা ধূমকেতুর পতনে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটবার দৃশ্য স্বচোখে দর্শন লাভ করেন এবং এদের বাস্তব ছবি ধারণ করে প্রমান করেছেন মহাবিশ্বে প্রতিটি মহাজাগতিক বস্তুই পর্যায়ক্রমে বিভিন্নভাবে ধ্বংসের তান্ডবে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে এক এক করে বিপর্যস্ত হবে।

এ যাবৎ আবিষ্কৃত ধ্বংসীয় ব্যবস্থাসমূহ হচ্ছেঃ-

(১) সৌরপরিবারের কেন্দ্র 'সূর্য'

	বিস্ফোরনের মাধ্যমে, (২) 'ধুমকেতু' পতনের মাধ্যমে, (৩) 'গ্রহানুর' উড়ন্ত আঘাতের মাধ্যমে, (৪) 'সুপার নোভা' বিস্ফোরনের কারনে, (৫) 'ব্ল্যাক হোলের' মাধ্যমে, (৬) 'একাধিক নক্ষত্রের' সংঘর্ষের কারনে, (৭) 'একাধিক গ্যালাক্সীর' পারস্পরিক সংঘর্ষের মাধ্যমে, (৮) সমগ্র 'গ্যালাক্সী শূন্যের কোঠায় গমনের' কারনে, উল্লেখিত প্রতিটি বিষয়ে বর্তমানে যথেষ্ট পরিমানে তথ্য এবং বাস্তব ছবি বিজ্ঞানীদের হাতে মওজুদ রয়েছে।
(২) "যখন সিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে এবং একটি মাত্র ফুৎকার।" (৬৯ ঃ ১৩) "ইহাতো কেবল একটি মাত্র বিস্ফোরনের শব্দ।" (৭৯ ঃ ১৩) "যখন কর্ণ বিদারী মহানিনাদ উপস্থিত হইবে।" (৮০ ঃ ৩০) "এবং সিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, ফলে যাহাদিগকে আল্লাহ্	(২) আমাদের এ পৃথিবী যদি বড় আকারের গ্রহানু বা ধূমকেতু পতনে, কিংবা একাধিক নক্ষত্র বা একাধিক গ্যালাক্সীর সংঘর্ষের কারনে অথবা সমগ্র গ্যালাক্সীর শূন্যের কোঠায় গমনের কারনে ধ্বংসের মুখে পতিত হয়, তাহলে এদের যে কোন একটির কারনেই পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে অসংখ্য উড়ন্ত পাথর ও ধূমকেতু আগমন করে প্রতি সেকেন্ডে

ইচ্ছা করিবেন তাহারা ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মুর্ছিত হইয়া পড়িবে।" (৩৯ ঃ ৬৮)	প্রায় কয়েক শত কিঃমিঃ প্রচন্ড গতিতে ছুটে আসায় বাতাসের বাধার মুখে তীব্র শব্দ-নিনাদের সৃষ্টি করে থাকবে। বায়ুমন্ডেলে প্রবেশ মুহূর্তে সৃষ্ট শব্দটি প্রচন্ড বিষ্ফোরনের শব্দের মতই মনে হবে। ঐ প্রচন্ড শব্দে ভূ-পৃষ্ঠের প্রানীকুল দিশেহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে। 'একাধিক গ্যালাক্সীর সংঘর্ষে' কিংবা 'গ্যালাক্সীর শূন্যের কোঠায় গমনে উল্লেখিত শব্দ-নিনাদ হবে কল্পনাতীত এক ভয়াবহ ও ব্যাপক পরিবেশে।
(৩) "তোমরা কি নিশ্চিত হইয়া গিয়াছ, যিনি আকাশে রহিয়াছেন তিনি তোমাগিদের উপর পাথরবাহী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করিবেন না ?" (৬৭ঃ১৭) "শপথ আকাশের এবং (সহসা) আঘাতকারীর তুমি কি জান এই আঘাতকারী বস্তুটি কি ? এটি একটি প্রজ্বলমান জ্যোতিষ্ক।" (৮৬ ঃ ১-৩)	(৩) ১৯৫০ এর দশকে Mr. Opick এবং Mr. Jan Oort যৌথভাবে আবিষ্কার করেন 'Opick Oort cloud', যা আমাদের সৌরজগতের চতুর্দিকে প্রায় (৩.৫ X ২.৫) আলোক বর্ষ ব্যাপী ট্রিলিয়ন-ট্রিলিয়ন পাথর, ধূমকেতু ও উল্কা দিয়ে পরিপূর্ণ। প্রতি বৎসর কমপক্ষে ৫টি ধূমকেতু ঐ এলাকা থেকে সূর্য্যের অভিকর্ষের টানে ছুটে এসে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলে যায়। এছাড়াও মঙ্গল গ্রহ ও বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যবর্তী স্থানে লক্ষ-লক্ষ পাথর সমৃদ্ধ বেল্ট এবং শনি গ্রহের চতুর্দিকেও পাথরের বেল্ট আবিষ্কৃত হয়েছে।

	উল্লেখিত যে কোন স্থান থেকেই পাথর খন্ড 'মহাকর্ষ বল' কিংবা মহাজাগতিক নিয়মে স্থানচ্যুত (displaced) হয়ে পৃথিবীর দিকে আসতে পারে এবং বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে অগ্নিমূর্তি ধারন করে পৃথিবীকে আঘাত করতে পারে।
(৪) "পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হইবে এবং যখন উহা আপন ভার বাহির করিয়া দিবে।" (৯৯ ঃ ১-২) "জমিন এবং পাহাড় গুলোর মধ্যে সংঘর্ষ বাধাইয়া দেওয়া হইবে এবং একই আঘাতে তাহার চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।" (৬৯ ঃ ১৪) "সেই দিন সংঘটিত হইবে মহাপ্রলয়।" (৬৯ ঃ ১৫) "মহাপ্রলয় ! মহাপ্রলয় কি ? মহাপ্রলয় সম্পর্কে তুমি কি জান ? সেই দিন মানুষ হইবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত এবং পর্বত সমূহ ধূনীত হইবে রঙ্গীন পশমের মত।" (১০১ ঃ ১-৫) "পৃথিবীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইবে।" (৮৯ ঃ ১১) "আর যখন পর্বতমালা উম্মিলিত ও বিক্ষিপ্ত হইবে।" (৭৭ ঃ ১০)	(৪) ধূমকেতু বা গ্রহানুর প্রচন্ড আঘাতের কারনে পৃথিবী থর-থর করে ব্যাপক ভাবে কাঁপতে থাকবে এবং ভিতরের খনিজ পদার্থ ও আগ্নেয় গিরির লাভা বের করে দিবে। ঐ আঘাতে ভূমিতে যে ধাক্কার সৃষ্টি হবে তাতে ভূ-পৃষ্ঠ ভাঁজ-ভাঁজ হয়ে ঢেউয়ের মত দূলতে থাকবে এবং পাহাড় বা উঁচু স্থানের সাথে সংঘর্ষে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে। মানব জ্ঞানে যে অবস্থা পূর্বে দর্শন করেনি এমনি এক ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ লাভ করবে। ঐ অবস্থায় পৃথিবী পৃষ্ঠে অবস্থানরত মানব মন্ডলী আত্নরক্ষায় উদভ্রান্তের মত দিক বিদিক জ্ঞানশূন্যবস্থায় ছুটতে থাকবে। ভয়াবহ বিপর্যয়ের কারনে দৃশ্যমান বৃহৎ-বৃহৎ পাহাড়-পর্বত, দালান-কোঠা, এমারত, শহর-নগর সবই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে বাতাসে উড়তে থাকবে।

"আর পর্বত সমূহ উড়ন্ত ধূলী-কনায় পরিণত হইবে।" (৭৩ ঃ ১৪) "পর্বত সমূহকে যখন চলমান করা হইবে।" (৮১ ঃ ৩) "যেইদিন তোমরা উহা প্রত্যক্ষ করিবে, সেইদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী বিস্মৃত হইবে তাহার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তাহার গর্ভপাত করিয়া ফেলিবে, মানুষকে দেখিবে মাতাল-সদৃশ, যদিও উহার নেশাগ্রস্থ নহে। বস্তুত আল্লাহ্র শাস্তি কঠিন।" (২২ ঃ ২)	পৃথিবী পৃষ্ঠ ব্যাপক ধ্বংসীয় তান্ডবের কারনে উড়ন্ত ধূলী-কনায় রূপ নিবে। ঐ ধূলী-কনা ওপরের দিকে উঠে গিয়ে পৃথিবীর আকাশকে ছাতার মত ঢেকে ফেলবে। আবহ্মন্ডল হবে বিপর্যস্ত। অবস্থার মারাত্মক প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র পৃথিবী জুড়ে মানুষেরা এক অসহায় করুন দশার শিকারে পরিনত হবে। সকল প্রকার বিপদের মধ্যে তারা জড়িয়ে পড়ে জ্ঞানশূন্য অবস্থায় ফিরে যাবে, যা বর্তমান মুহূর্তে এতটুকুন অনুমান করাও দুঃসাধ্য ব্যাপার বৈ-কি।
(৫) "যখন সমূদ্র উদ্বেলিত হইবে। (৮২ ঃ ৩) "যখন সমুদ্র স্ফীত হইয়া যাইবে।" (৮১ ঃ ৬)	(৫) ভূ-পৃষ্ঠের প্রচন্ড কম্পনের কারনে, ভূমির ধাক্কা-ধাক্কিতে এবং বড়-বড় গ্রহানু ও ধূমকেতু সমুদ্রে পতিত হওয়ার কারনে হাজার-হাজার পারমানবিক বোমার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে সমুদ্রের পানি কয়েক কিলোমিটার উঁচু ঢেউ সৃষ্টি করে ভূ-ভাগকে গ্রাস করবে। তাতে শহর-নগর, বন্দর পানির তোড়ে ডুবে গিয়ে নাস্তানাবুদ হয়ে যাবে।
(৬) "যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে।" (৭৭ ঃ ৯) "যখন আকাশের আবরণ উম্মোচিত করা হইবে।" (৮১ ঃ ১১) "সেই দিন আকাশ গলিত ধাতুর মত হইবে।" (৭০ ঃ ৮)	(৬) পৃথিবীর বিপর্যয়ের দিন গ্রহানু ও ধূমকেতুর ব্যাপক আকারে আবহমন্ডলে প্রবেশের কারনে ব্যাপকভাবে অগ্নুৎপাতের সৃষ্টি হবে এবং ভূ-পৃষ্ঠের ধূলি-কনা ওপরে উঠে গিয়ে ছাতার সৃষ্টি করে অবস্থান

"যেইদিন আকাশ বিদীর্ণ হইবে, সেইদিন উহা রক্তের রংগে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারন করিবে।" (৫৫ঃ৩৭)	করার কারনে প্রচন্ড উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে রক্তিম বর্ণ ধারণ করবে, ফলে পৃথিবীর আকাশ সর্বত্র শুধু অগ্নিময় ও রক্তের গাদের ন্যায় দৃষ্টি গোচর হবে।
(৭) "যখন সূর্য জ্যোতিহীন ও নিস্প্রভ হইয়া যাইবে।" (৮১ ঃ ১) "এবং চন্দ্র হইয়া পড়িবে জ্যোতিহীন।" (৭৫ ঃ ৮) "যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একই অবস্থায় একাকার করা হইবে।" (৭৫ ঃ ৯) "যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হইয়া যাইবে।" (৭৭ ঃ ৮) "যখন নক্ষত্র সমূহ বিক্ষিপ্তভাবে খসিয়া পড়িবে।" (৮১ ঃ ২)	(৭) পৃথিবীর ওপর কথিত বিপর্যয় শুরু হলে ধূলা-বালি আবহ্মন্ডলে উঠে গিয়ে যে ছাতা তৈরী করবে, তা দীর্ঘদিন পর্যন্ত এমনকি কয়েক যুগ পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকার কারনে সূর্যের ও চন্দ্রের এবং নক্ষত্র সমূহের আগত আলোকে পৃথিবী পৃষ্ঠে পৌঁছতে বাধা প্রদান করবে, যার জন্য ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ঐগুলো না দেখার কারনে জ্যোতিহীন মনে হবে। অপরদিকে যদি 'একাধিক গ্যালাক্সীর মাঝে সংঘর্ষ' কিংবা 'সমগ্র গ্যালাক্সীর শূন্যের কোঠায় গমনের' কারনে গোটা গ্যালাক্সী জুড়েই বিপর্যয় শুরু হয়ে যায়, তাহলে আমাদের সূর্য, চন্দ্র ও অসংখ্য নক্ষত্রও তাদের অবস্থানে আর নিরাপদ থাকতে পারবে না, মহাজাগতিক ব্যাপক ধ্বংসীয় তান্ডবে পড়ে বাধ্যগতভাবে নির্দিষ্ট কক্ষপথ থেকে স্থানচ্যুৎ হয়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে ভাসমান অবস্থায় ছুট্তে থাকবে এবং পারস্পরিক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর ধ্বংস সাধন ঘটাবে।

"তোমরা তোমাদিগের প্রভুর এই বাস্তব নিদর্শনমূলক (বিজ্ঞানসম্মত) বাণীকে মিথ্যা মনে করিয়া কি অস্বীকার করিতে পার ?" (৫৫ ঃ ৩৪) এক্ষেত্রে একটিই উত্তর হতে পারে 'অবশ্যই না'।

সুতরাং প্রায় দেড় হাজার বছর থেকে 'কুরআন' এই পৃথিবীর মহাপ্রলয় সম্পর্কে যে সাবধান-সতর্কবাণী শুনিয়ে আসছে, বর্তমান বিজ্ঞান তার উদ্ঘাটিত তথ্য ও ছবি দিয়ে হুবহু সেই কুরানের বাণীকেই প্রমাণীত করে মহাসত্যতার এক দৃঢ় আসনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। ফরে 'কিয়ামাত' অস্বীকারের সকল পত চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে।

"সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত, মিথ্যার পতন অবশ্যম্ভাবী।" (১৭ ঃ ৮১)

"আল্লাহ্র বাণীর কোন পরিবর্তন নাই, ইহা এক মহা সাফল্য।" (১০ ঃ ৬৪)
"এই গুলিই প্রমাণ যে আল্লাহ্ সত্য।" (৩১ ঃ ৩০)

'কিয়ামাতের সম্ভাব্য পদ্ধতি'

আল্-কুরআনঃ

"অধিকন্তু কিয়ামাত উহাদিগের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামাত হইবে কঠিনতর ও তিক্ততর।" (৫৪ ঃ ৪৬)

"যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হইবে পৃথিবী এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়িবে ফলে উহা পর্যবসিত হইবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকনায়।" (৫৬ ঃ ৪-৬)

"সেই দিন মানুষ হইবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত এবং পর্বত সমূহ হইবে ধূনিত রঙীন পশমের মত।" (১০১ ঃ ৪-৫)

"যখন আকাশ বিদির্ণ হইবে ও তাহার প্রতিপালকের আদেশ পালন করিবে এবং ইহাই তাহার করনীয়।" (৮৪ ঃ ১-২)

"আকাশ যখন বিদীর্ণ হইবে, গ্রহানু সমূহ যখন বিক্ষিপ্তভাবে নিক্ষিপ্ত হইবে, যখন সমুদ্র উচ্ছসিত হইয়া যাইবে।" (৮২ ঃ ১-৩)

"যখন নক্ষত্র রাজির আলো নির্বাপিত হইবে, যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে এবং যখন পর্বতমালা উম্মিলিত ও বিক্ষিপ্ত হইবে।" (৭৭ ঃ ৮-১০)

"সূর্য যখন নিস্প্রভ হইবে, যখন নক্ষত্র রাজি খসিয়া পড়িবে, পর্বত সমূহকে যখন চলমান করা হইবে।" (৮১ ঃ ১-৩)

"সেই দিন আকাশ আন্দোলিত হইবে প্রবলভাবে এবং পর্বত চলিবে দ্রুত, দূর্ভোগ সেই দিন মিথ্যাশ্রয়ীদিগের যাহারা ক্রীড়াচ্ছলে অসার কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে।" (৫১ ঃ ৯-১২)

"যখন চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে এবং চন্দ্র হইয়া পড়িবে জ্যোতিহীন। যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হইবে। সেইদিন মানুষ বলিবে আজ পালাইবার স্থান কোথায় ?" (৭৫ ঃ ৬-১২)

"যখন সিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে – একটি মাত্র ফুৎকার, পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হইবে এবং একই ধাক্কায় উহারা চূর্ণ-বিচূর্ণ

হইয়া যাইবে। সেই দিন সংঘটিত হইবে মহাপ্রলয় এবং আকাশ বিদীর্ণ হইয়া বিশ্লিষ্ট (ছিন্ন-ভিন্ন) হইয়া পড়িবে।" (৬৯ ঃ ১৩ -১৬)

"এবং সিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, ফলে যাহাদিগকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তাহারা ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মুর্ছীত হইয়া পড়িবে। অতঃপর আবার সিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে তৎক্ষনাৎ উহারা দন্ডায়মান হইয়া তাকাইতে থাকিবে।" (৩৯ ঃ ৬৮)

"সেইদিন প্রথম সিংগাধ্বনী প্রকম্পিত করিবে, উহাকে অনুসরণ করিবে পরবর্তী (দ্বিতীয়) সিংগাধ্বনী।" (৭৯ ঃ ৬-৭)

"ইহারাতো অপেক্ষা করিতেছে একটি মাত্র প্রচন্ড নিনাদের যাহাতে কোন বিরাম থাকিবেনা।" (৩৮ ঃ ১৫)

"যেইদিন উহারা ইহা প্রত্যক্ষ করিবে, সেইদিন উহাদিগের মনে হইবে যেন উহারা পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা বা এক সকাল অবস্থান করিয়াছে।" (৭৯ ঃ ৪৬)

আমরা ইতোপূর্বেই পবিত্র কুরআন থেকে অবগত হতে পেরেছি যে, কিয়ামাত বা মহাপ্রলয় সম্পর্কে, এর আগমন মুহূর্ত ও এর পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত নবী-রাসূল (সাঃ) গনও কোন জ্ঞান রাখেন না। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত জ্ঞানের একমাত্র মালিক বিশ্ব প্রতিপালক মহান 'আল্লাহ্'। তবে তিনি অত্যন্ত দয়ালু বিধায় নিজ থেকে করুনা করে উক্ত 'কিয়ামাত' বা 'মহাপ্রলয়' সম্পর্কে তাঁর পবিত্র ঐশী গ্রন্থ 'কুরআনে' আলোর ঝলকের ন্যায় কিছু কিছু চিহ্ন স্বরূপ বক্তব্য তুলে ধরেছেন, যেন জ্ঞানবান সমাজ উক্ত 'আলামত' সম্বলিত বাণীসমূহকে আবিষ্কৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের রিপোর্টের সাথে মিলিয়ে মহাপ্রলয়ের যৎসামান্য হলেও আন্দাজ- অনুমান করতে পারে এবং সেই ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের নিমিত্তে যথাসম্ভব চেষ্টা-সাধনা করে সত্য-সঠিক পথের উপর জীবন পরিচালনা করতে পারে।

বিষয়টিকে আরও খোলাসা করার জন্য উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাহ্দের মধ্যে নাম ধরে-ধরে বলেননি যে, অমুক-অমুক জান্নাতে যাবে, আর অমুক-অমুক জাহান্নামে যাবে, অথচ তিনি ভালো করেই জানেন কে-কে জান্নাতি আর কে-কে জাহান্নামী ! বিষয়টি তাঁর নিকট গোপন রাখলেও কিন্তু তিনি পরোক্ষভাবে কিছু-কিছু চিহ্ন বা আলামত

বর্ণনা করেছেন যাতে করে সমাজের মানুষেরা ঐ চিহ্ন বা আলামত অথবা আমলের কারনে বুঝতে পারে এ লোকগুলি জান্নাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং ঐ লোকগুলি জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, আর সমাজের লোকজন সেভাবে মন্তব্য করেও থাকে, যদিও বিষয়টির প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্‌র নিকটই গোপনীয়। মানুষের জীবনের বাস্তব ঐ সকল আলামত বা নিদর্শন দর্শন করে যদি অগ্রিম মন্তব্য করাতে দোষের না হয়, তাহলে 'কুরআন' বর্ণিত ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষতায় বাস্তবভাবে প্রমানিত বিষয়ের মাঝে তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করে 'কিয়ামাতের সম্ভাব্য পদ্ধতি' সম্পর্কে ধারণা করাতেও দোষের কিছু নয়। এখানে যতটুকুন সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, তা হচ্ছে 'ধারনা' বা 'অনুমান' করা যাবে কিন্তু 'দৃঢ়' হওয়া যাবে না বা 'নিশ্চিত এটাই ঘটবে' এরূপ বলা যাবে না, যেহেতু প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ্‌র নিকটই গোপনীয়।

আমরা অধ্যায়টি উন্মুক্ত করেছি শুধুমাত্র 'কিয়ামাতে' অবিশ্বাসীদের জ্ঞানচক্ষু বাস্তবতার আলোকে খুলে দেয়ার জন্য।

অতএব 'কুরআনে' বর্ণিত বক্তব্যের আলোকেই আমরা বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্‌ঘাটিত তথ্যের তুলনামূলক আলোচনায় ব্রতী হয়ে কিয়ামাত বা মহাপ্রলয়ের যেন একটা ক্ষুদ্র ধারণা কল্পনায় স্থান দিতে পারি, যা প্রতিনিয়তঃই আমাদেরকে এর আগমন, পদ্ধতি ও ভয়াবহতা সম্পর্কে সজাগ করবে এবং পরকালমূখী জীবন গঠন ও পরিচালনে সহায়তা করবে। সুতরাং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সরাসরি 'কিয়ামাতের সময় এবং পদ্ধতি না বলা সত্ত্বেও তাঁর সরবরাহকৃত তথ্যের আলোকে যৎসামান্য ধারণা গড়ে তুলতে তিনি নিষেধও করেননি বরং উৎসাহিত করেছেন বিধায় আমরা সকল প্রকার বাড়াবাড়ি বা অতিরঞ্জিত কিছু করা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থেকে এখন এ বিষয়ে আলোচনায় এগিয়ে যেতে চাই। আল্লাহ্ আমাদের এ প্রয়াসে সাহায্য করুন। আমীন !

কিয়ামাত বা মহাপ্রলয়ের পুরো বিষয়টি আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের কাছে গোপন রেখেছেন ঠিকই, কিন্তু এর ছিটে-ফোঁটা দু'একটি আলামত বা নিদর্শন যা তিনি পবিত্র ঐশী গ্রন্থ 'কুরআনে' প্রকাশ করেছেন, তার কয়েকটি আমরা আমাদের বর্তমান আলোচনায় উপস্থাপন করেছি। উপস্থাপিত বাণী সমূহে মোটামুটিভাবে যে ধারণা আমাদের দেয়া হয়েছে এখন পর্যায়ক্রমে আমরা তা সাজিয়ে নিচ্ছি। যেমনঃ-

(ক) 'কিয়ামাত' বা 'মহাপ্রলয়' পৃথিবী বাসীর বিচারের জন্য পূর্বেই নির্দিষ্ট করা 'সময়কাল'।

(খ) ঐ দিনটি মানবজাতির জন্য খুবই কঠিন ও তিক্ততর হবে।

(গ) প্রচন্ড ভূ-কম্পনে সেদিন পাহাড়-পর্বত উড়ন্ত ধূলা-বালিতে রূপান্তরীত হবে।

(ঘ) সেদিন মানুষ দিক-বিদীক জ্ঞান শূন্য – দিশেহারা হয়ে ভয়ে পালানো পোকা-মাকড়ের মত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পালাতে থাকবে।

(ঙ) বিশ্ব প্রতিপালকের নির্দেশে আকাশ মন্ডলের ভারসাম্য এবং সেটিং (ব্যবস্থা) ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে।

(চ) আকাশ মন্ডলের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ায় অসংখ্য গ্রহানু (পাথর খন্ড) ও ধূমকেতুর আঘাতে পৃথিবী নাস্তা-নাবুদ হয়ে পড়বে।

(ছ) গ্রহানু ও ধূমকেতু সাগরে পতিত হওয়ায় এর পানি বিরাট উঁচু হয়ে এগিয়ে এসে ভূ-ভাগ ডুবিয়ে দিবে।

(জ) আকাশ রাজ্যে ব্যাপক থেকে ব্যাপক বিশৃংখলা দেখা দেয়ায় নক্ষত্র সমূহ স্থানচ্যুত হবে এবং পরস্পর সংঘর্ষে জড়িয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

(ঝ) চন্দ্র এবং সূর্য একত্রিত হয়ে সংঘর্ষের মাধ্যমে উভয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

(ঞ) চন্দ্র, সূর্য, ও নক্ষত্র ধ্বংসহয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে দেখে, পাহাড় বালু-কনায় পরিনত হয়ে উড়তে দেখে, ভয়ে বিহবলতায় মানুষের চোখ বিষ্ফারিত হয়ে শুধু তাকিয়ে থাকবে। নিজ দৃষ্টিকে বিশ্বাস করতে পারবে না।

(ট) একটি মাত্র সিংগায় ফুৎকার-ই বিকট শব্দের সূচনা করে কিয়ামাত আরম্ভ হবে এবং পাহাড় পর্বত সহ পৃথিবী প্রচন্ড ধাক্কায় চূর্ণ-বিচূর্ণ ও বিপর্যস্ত হয়ে এর ভিতরকার সবকিছু বেরিয়ে পড়বে।

(ঠ) সিংগার বিকট শব্দে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাহগণ ছাড়া আকাশ জগতের (গ্যালাক্সীর) সবাই মুর্ছীত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে।

(ড) সিংগার ঐ শব্দ একটা দীর্ঘসময় পর্যন্ত অনবরত চলতে থাকবে বিরামহীন ভাবে।

(ঢ) প্রথম সিংগার বিকট শব্দে কিয়ামাত শুরু হয়ে চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর দ্বিতীয়বার আবার সিংগায় ফুৎকার দিয়ে প্রচন্ড শব্দের সৃষ্টি করা হবে।

(ন) দ্বিতীয় বার সিংগার শব্দের সাথে সাথে সমগ্র মানবজাতি পূনর্বার জীবিত হয়ে দাড়িয়ে যাবে এবং বিচারের নিমিত্তে শব্দের উৎস স্থলের দিকে দৌড়াতে থাকবে।

(ত) কিয়ামাতের শুরু থেকে বিচার কার্য সম্পন্ন হওয়ার সময় পর্যন্ত অবস্থার দীর্ঘ সময়কাল ও বিপদের ভয়াবহতা এবং পেরেশানীর কারনে মানুষেরা ভাবতে থাকবে সে তুলনায় পৃথিবীতে তারা মুহূর্তকালই অবস্থান করেছিল মাত্র।

উল্লেখিত পয়েন্ট গুলোই 'কিয়ামাত'-র সম্ভাব্য পদ্ধতি সম্পর্কে মূল বক্তব্য হিসাবে আমরা বিবেচনায় আনতে পারি।

ওপরে বর্ণিত আলামতবা চিহ্নগুলো জ্ঞানের আঙিকে বিবেচনা করতে গেলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার সময় পর্যায়ক্রমে যে বিশৃংখলা ও ধ্বংস সাধন শুরু হবে তাতে বিপর্যয়ের যত প্রকার ব্যবস্থা হতে পারে তার সব কয়টিই সেখানে কার্যকর হবে। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার পূর্বেই আমরা বর্তমান বিজ্ঞানের মতামত গুলোকেও স্পষ্ট আলোতে এনে স্বচ্ছভাবে পর্যালোচনা করে দেখি। তাতে কোন্ পদ্ধতিতে 'কিয়ামাত' ঘটবার সম্ভাবনা বেশি তা আমরা অনেকটা অনুমান করতে সমর্থ হব যদিও প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ্-ই ভালো জানেন।

বিজ্ঞানঃ

বিজ্ঞান তার এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সকল প্রকার প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে আমাদের এ জীবনময় গ্রহ 'পৃথিবী' সম্ভাব্য ধ্বংস হওয়ার কারণগুলো খুবই যত্ন সহকারে মানব মন্ডলীর দৃষ্টির সামনে উপস্থাপন করেছে, যা আমরা কিয়ামাতের মূল অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। বিজ্ঞান তাতে পৃথিবী ধ্বংসের জন্য আপাতত প্রধানতঃ ৮টি ব্যবস্থার যে কোন একটি ব্যবস্থাই 'যথেষ্ট' বলে মত প্রকাশ করেছে। যেমনঃ

(১) সৌরজগতের মূল বস্তু 'সূর্য' যে কোন কারনে ধ্বংস হলে অনিবার্যভাবে তার 'সৌর' ব্যবস্থাও ধ্বংসে নিপতিত হবে।

(২) সৌরজগতের ভিতরে এবং বাইরে বিলিয়ন-ট্রিলিয়ন ছোট-বড় গ্রহানু ও পাথরখন্ড উড়ে বেড়াচ্ছে। নূন্যতম পক্ষে এক কিলোমিটার ব্যাসের গ্রহানু বা পাথরখন্ডও যদি পৃথিবী পৃষ্ঠে পতিত হয় তাহলেও পৃথিবীর বায়ুমন্ডল বিপর্যস্ত হবে, প্রচন্ড আঘাতে লক্ষ-লক্ষ পারমানবিক বোমার বিষ্ফোরনের সমান প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে সমগ্র পৃথিবী পৃষ্ঠকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই ভস্ম করে দিবে, পাহাড়-পর্বতকে উড়ন্ত ধূলী-কনায় পরিনত করবে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে রক্ষিত সকল কিছু বের করে দিবে, প্রচন্ড ভূমিকম্পে শহর, নগর, বন্দর ধ্বংসস্তুপে রূপ নিবে, সাগর-মহাসাগরের পানি কয়েক কিলোমিটার ওপরে উঠে সমগ্র ভূ-ভাগকে গ্রাস করবে। পৃথিবীর চতুর্দিকে বিরাট ধূলির ছাতা উত্থিত হয়ে গোটা আকাশকে ঢেকে দিবে, তাতে বছরের পর বছর চন্দ্র-সূর্য ও তারকার আলো আর ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছতে পারবেনা। নেমে আসবে পৃথিবীতে তুষার যুগ। তাতে কোন মতে বেঁচে থাকা জীব-উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলও চিরদিনের জন্য হারিয়ে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

(৩) পৃথিবী পৃষ্ঠে যদি 'গ্রহানুর' মত 'ধূমকেতুর'ও আক্রমন ঘটে তাহলেও ওপরে বর্ণিত ধ্বংসের ন্যায় পৃথিবী তার পৃষ্ঠে জীবনময় পরিবেশের জন্য জরুরী সকল বৈশিষ্টই চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলবে। তবে গ্রহানু ও ধূমকেতুর আঘাতে চন্দ্র, সূর্য ও তারকা বিপর্যস্ত হবে না বা আকাশ মন্ডলীর তেমন কোনই ক্ষতি হবে না।

(৪) 'সুপার নোভা' বিষ্ফোরনের কারনে এর নিকটবর্তী সৌরজগত সমূহকে উত্তপ্ত ধূলা-বালি ও গলিত বিভিন্ন ধরনের পদার্থ দিয়ে দীর্ঘ সময়ের জন্য কম্বল আস্তরনের ন্যায় ঢেকে দিতে পারে। যার ফলে প্রচন্ড তাপে জীবনময় গ্রহের বায়ুমন্ডল তিরোহীত হতে পারে, গ্রহের পৃষ্ঠে গাছ-পালা, বাড়ী-ঘর জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে, চন্দ্র, সূর্য বা তারকার আলো বাধাগ্রস্থ হয়ে ভূ-পৃষ্ঠ পর্যন্ত নাও পৌঁছতে পারে। ক্রমান্বয়ে উদ্ভিদকুল ধ্বংস হয়ে জীব ও প্রাণীর অস্তিত্বও মুছে ফেলতে পারে। এক পর্যায়ে উত্তপ্ত পরিবেশ কেটে গিয়ে দীর্ঘ সময়ের জন্য জীবনময় গ্রহে তুষার যুগের আগমন ঘটতে পারে। তবে আকাশ মন্ডলীর তেমন বড় ধরনের কোন ক্ষতি নাও হতে পারে, যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

(৫) 'ব্ল্যাক-হোলের' কারনে কোন জীবনময় গ্রহের যবনিকাপাত ঘট্লে সে স্থলে গোটা সৌরজগত-ই একসাথে বিপর্যস্ত হবে। বৃহৎ 'ব্ল্যাক-হোলের' (massive black hole) আক্রমন ঘটলে সে ক্ষেত্রে একাধিক সৌর

ব্যবস্থা এর রাক্ষসী টানে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে বাধ্য হয়ে 'ব্ল্যাক হোল' চৌঙে প্রবেশ করতে থাকলে আকাশ মন্ডলী এবং এদের ব্যবস্থাপনা বিপর্যস্ত হতে বাধ্য। এই অবস্থায় পূর্বে বর্ণিত আলামত থেকে ভিন্ন ধরনের ধ্বংসীয় আলামত বা চিহ্ন সৃষ্টি হবে। নক্ষত্র, গ্রহ এবং উপগ্রহের সকল কিছুই নিজ নিজ অবস্থান থেকে স্থানচ্যুত হতে বাধ্য হবে। 'ব্ল্যাক হোলের' অকল্পনীয় কেন্দ্রমুখী টানে সকল কিছুই তার পূর্বের অবস্থানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে মহাশূন্যের ভিতর দিয়ে সন্তরন করে এর horizon event-র চারদিকে জড় হবে। পরবর্তী সময়ে horizon event-এ পা রাখা মাত্র মুহূর্তেই ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে নিজ অস্তিত্বের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করে চিরদিনের জন্য ব্ল্যাক হোল চৌঙে হারিয়ে যাবে। বর্তমান বিজ্ঞান 'ব্ল্যাক হোলের' আভ্যন্তরীন রহস্য এখনো উদ্‌ঘাটিত করতে না পারায় পরবর্তী অবস্থা জানাতে অপারগ। তবে ধারণা করছে যে সম্ভবতঃ বস্তুকে প্রচন্ড ঘনায়নের মাধ্যমে মহাসুক্ষ্ম ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে পরিণত করে একটি বিন্দুতে (Singularity) আট্‌কিয়ে রাখছে।

'ব্ল্যাক হোল' পদ্ধতি অবলম্বনে কিয়ামাত সংঘটিত এলাকায় জীবন্ত প্রানীকুল তখন দৃশ্য আলামত হিসেবে শুধু দেখতে পাবে একমুখী প্রচন্ড বাতাসের টানে ঝড়-তুফান বয়ে যাচ্ছে এবং সেই ঝাপটায় সকল কিছুই মহাশূন্যের দিকে উড়ে যাচ্ছে, সবার আত্ম রক্ষার সকল চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে, চন্দ্র, সূর্য বা নিকটবর্তী তারকার আলো ক্রমান্বয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে এবং এরা ছিঁড়ে-ফোঁড়ে ক্রমান্বয়ে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলছে, যা এক অবিশ্বাস্য কল্পনাতীত ভয়ংকর অবস্থা সৃষ্টি করবে বিধায় মানুষ তা চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে।

(৬) পূবে বিষয়টি বিজ্ঞানের কাছে অপরিচিত াকলেও বর্তমান সফলতার উজ্জল পরিবেশে 'একাধিক' নক্ষত্রের পারস্পরিক সংঘর্ষ' ছবিসহ আবিস্কৃত হয়ে স্বপ্রমানে মানবমন্ডলীর সম্মূখে হাজির হয়েছে। উক্ত পদ্ধতিতে সংঘর্ষ ঘটলে সংশ্লিষ্ট নক্ষত্রসমূহ তাদের পরিবারসহ (গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহানু ও ধূমকেতু) সম্পূর্নরূপে উড়ন্ত ধূলা-বালিতে রূপান্তরিত হয়ে মহাশূণ্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। ফলে জীবনময় জগত থেকে থাকলে জীব, উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলসহ চিরদিনের জন্য ধ্বংসের অতলে তলিয়ে যাবে।

অতি সম্প্রতি প্রায় ৩০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বে 'NGC 664' গ্যালাক্সীর মধ্যে দু'টি নক্ষত্রের পারস্পরিক সংঘর্ষ ও তাদের উভয়ের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়েছে।

(৭) 'গ্যালাক্সীদের পারস্পরিক সংঘর্ষ' এ যাবৎ বর্ণিত গ্রহ বা সৌরজগত ধ্বংসের সকল প্রকার পদ্ধতির মধ্যে এক ভয়ংকর ধ্বংসাত্মক ব্যবস্থা। একটি, দুটি গ্রহ বা সৌর জগত নয় বরং শত-সহস্র সৌর জগত একই সাথে ব্যাপক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে ছিন্ন-ভিন্ন ও নাস্তানাবুদ হয়ে যায়। আকাশ মন্ডলীতে ব্যাপক ওলোট-পালট ঘটে যায়। অসংখ্য নক্ষত্র পরস্পর প্রচন্ড আঘাতে উড়ন্ত ধূলিকনায় রূপান্তরীত হয়। ফলে গ্যালাক্সীদের সাংঘর্ষিক এলাকায় নক্ষত্র, গ্রহ বা উপগ্রহের কোন অস্তিত্বই আর বর্তমান থাকে না। 'ব্ল্যাক হোলের' তুলনায় এই ব্যবস্থাটি আরও বেশি ভয়ানক। পৃথিবী থেকে 'হাবেল স্পেস টেলিস্কোপ' দিয়ে এ ধরনের সংঘর্ষে জড়িত 'এ্যান্টেনে' গ্যালাক্সীদের পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, প্রচন্ড ধাক্কায় দুটি গ্যালাক্সির যে সকল নক্ষত্র পরিবার ধ্বংস হয়েছে, এদের ধ্বংসাবশেষ ধূলা-বালির মেঘপুঞ্জ প্রায় এক হাজার মাইল / সেকেন্ড বা তার চেয়ে আরও বেশি দ্রুত গতিতে চতুর্দিকে ধাবমান হচ্ছে। কত যে প্রচন্ড সংঘর্ষ তা-কি কল্পনা করা যায় ?

তবে একটি দিক লক্ষণীয় যে গ্যালাক্সীদের 'মহাকর্ষ' বলের কারনে উক্ত সংঘর্ষ সাধিত হয়ে থাকলেও একই ধাক্কায় উভয় গ্যালাক্সী বা একাধিক জড়িত গ্যালাক্সী সাথে সাথেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায় না। পরস্পর আঘাত প্রাপ্ত দিকের নক্ষত্র সমূহ ধ্বংস হয় বটে কিন্তু অপরাপর দূরবর্তী অংশ ঠিক থাকে এবং সেখানকার নেবুলা (আদি-ধূলা-বালির মেঘপুঞ্জ) থেকে সংঘর্ষজনিত ঝাকুনী পড়ায় 'মধ্যকর্ষন শক্তি' সক্রিয় হয়ে নতুন নতুন নক্ষত্র সৃষ্টি করে থাকে। সে যাই হোক, গ্যালাক্সীদের পারস্পরিক সংঘর্ষে দূর্যোগ কবলিত এলাকায় নক্ষত্র ব্যবস্থায় বর্ণনাতীত ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হওয়ায় মানব জ্ঞানে তা বর্ণনা করা সত্যি এক কঠিন ব্যাপার বৈ-কি।

(৮) সমগ্র 'গ্যালাক্সী' প্রচন্ড গতিতে ভ্রমনের কারনে গতির বিপরীতে উহা সংকুচিত হয়ে ক্রমান্বয়ে আভ্যন্তরীণ কাঠামোতে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর ধ্বংস সাধন ঘটিয়ে 'প্রায় শূন্যের' কোঠায় (Singularity-তে) গমনে – যে ব্যবস্থা মহাজাগতিক নিয়মে মহাকাশে রচিত হয়ে আছে তা সত্য-সত্যই মানবজ্ঞানে সব চেয়ে বেশি বিপদ সংকুল অবস্থা হিসেবে

ইতোমধ্যেই স্বীকৃতি লাভ করেছে। কেননা উক্ত ব্যবস্থাটি যে দৃশ্য বস্তু জগতের চূড়ান্ত ভাবে ধ্বংসসাধন ঘটিয়ে এর অস্তিত্ব মিটিয়ে দিচ্ছে – তা কিন্তু মানব জ্ঞানে মোটামোটি ধরা পড়েছে।

বিজ্ঞানীগণ বর্তমানে আমাদের মহাবিশ্বে প্রায় ১০০ কোটি গ্যালাক্সীর উপস্থিতি স্বীকার করছেন। তাদের পর্যবেক্ষণকৃত ভাষ্য অনুযায়ী প্রতিটি গ্যালাক্সীতে গড়ে প্রায় ২০,০০০ কোটি নক্ষত্র বর্তমান আছে। 'বিগ্-ব্যাংগ' নামক মহাবিষ্ফোরনের পরে গ্যালাক্সী সমূহ সৃষ্টির পর থেকে নিয়ে এই সময় পর্যন্ত সবাই গড়ে উল্লেখিত বিরাট সংখ্যক (প্রায় ২০,০০০ কোটি) নক্ষত্র বুকে ধারণ করে বস্তুজগতের প্রান্ত সীমানার দিকে ক্রমান্বয়ে গতি বাড়িয়ে কেবলই উড়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীগণের হিসেব মতে গতি বাড়ার হার হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৫০ মাইল। এভাবে ক্রমান্বয়ে দ্রুত গতিতে উড়তে গিয়ে গ্যালাক্সীসমূহ যেভাবে তাদের গতি বাড়িয়ে থাকে তাতে বিপরীত দিকে উচ্চ গতির কারনে বাধাগ্রস্থ হয়ে আকৃতিও সেভাবে ক্রমান্বয়ে ছোট হতে থাকে (যা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে)।

এখন তীব্র গতির কারনে যখন প্রায় ২০,০০০ কোটি নক্ষত্র ধারণকারী বিরাট চাক্তিটি ঘূর্ণনরত অবস্থায় চতুর্দিক হতেই ক্রমান্বয়ে ছোট হয়ে ভিতরের দিকে চাপতে থাকে, তখন চাক্তির (গ্যালাক্সীর) কিনারায় অবস্থানকৃত নক্ষত্র, এদের গ্রহ ও উপগ্রহ ব্যবস্থা এদের চতুর্দিকে মহাজাগতিক নিয়মে সৃষ্টি হয়ে থাকা ট্রিলিয়ন-ট্রিলিয়ন গ্রহানু, ধূমকেতু ও পাথর কুচি নিজেদের কক্ষপথ হতে বিচ্যুত হয়ে বিক্ষিপ্ত ও বিশৃংখলভাবে এলো-পাথাড়ী ভিতরের দিকে ধাবমান হতে শুরু করে। এতে করে এদেরও পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। গ্যালাক্সীর গতি যতই বাড়তে থাকে এর সাথে সমতা রেখে প্রচন্ড বাধার কারনে এর আয়তনও ততই কমতে থাকে। ফলে গ্যালাক্সীর প্রান্ত বা কিনারা থেকে শুরু হলেও এক পর্যায়ে গিয়ে এর অভ্যন্তরে সর্বত্র প্রায় গড়ে ২০,০০০ কোটি নক্ষত্র সকলেই তাদের সৌর ব্যবস্থা সহ স্থানচ্যুৎ (ফরংঢ়ষধপবফ) হয়ে গোটা গ্যালাক্সীর ভারসাম্যই সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে দেয়। আর তাতে গতিশীল নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহানু, ধূমকেতু সহ সকল কিছুই পরস্পর-পরস্পরের সাথে ব্যাপক সংঘর্ষ বাধিয়ে দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধূলি-কনায় পরিণত হয়।



চিত্রঃ ১১৪

"তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান।" (৮৫ ঃ ১৩, ১৪)

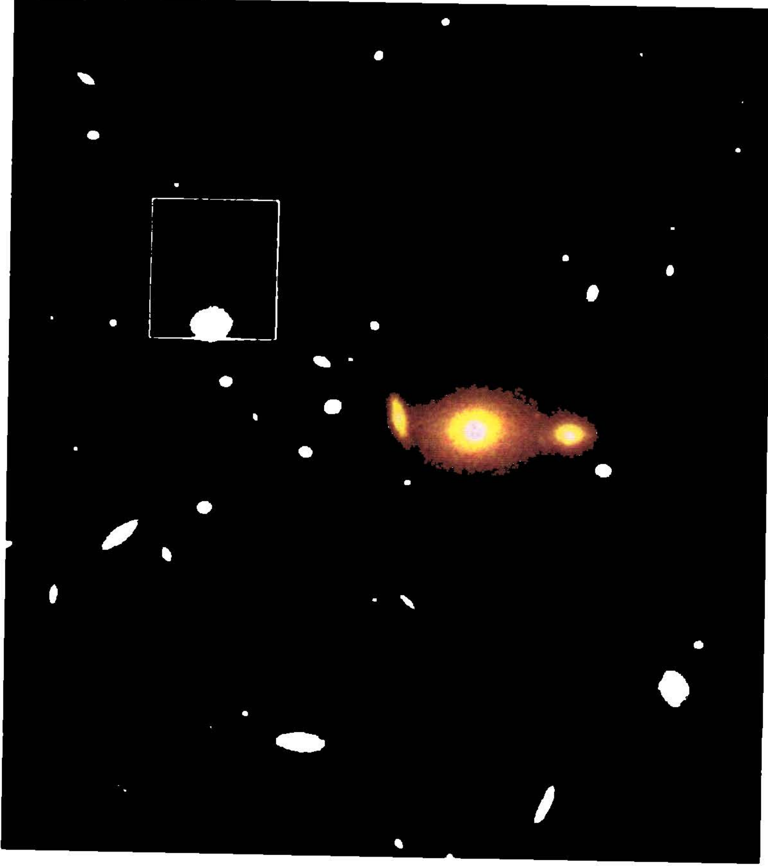
- Big Bang-র মাদ্যমে গ্যালাক্সী অস্তিত্ব ধারন করে এবং মহাকাশে ভাসমান অবস্থায় ক্রমান্বয়ে গতি বাড়িয়ে উড়তে গিয়ে পর্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত হয়ে পরিশেষে আবার মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে উপনীত হচ্ছে এবং আভ্যন্তরীন সকল সৌর ব্যবস্থাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলছে। কিয়ামাত ঘটে যাচ্ছে জীবনময় জগতগুলোতে এক সুকঠিন নিয়মের ভিতর দিয়ে।



চিত্রঃ ১১৫

"তিনিই আল্লাহ্ তোমাদিগের সত্য প্রতিপালক, সত্য ত্যাগ করিবার পর বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কি থাকে? সুতরাং তোমরা কোথায় চালিত হইতেছ?" (১০ঃ৩২)

- এক এক করে গ্যালাক্সী ও কোয়াসার বস্তুজগতের প্রান্ত সীমার দিকে প্রচন্ড গতিতে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মহাজাগতিক নিয়মে ভেংগে-চুরে ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিতও হতে থাকে। এভাবে এক পর্যায়ে মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে পৌছে আবার শর্ত পূরণ সাপেক্ষে Big Bang নিয়মে বিস্ফোরন ঘটিয়ে নতুনভাবে জগত সৃষ্টি করতে থাকে। বিজ্ঞানীগণ অবস্থা আঁচ করে তাই বলতে শুরু করেছেন Where are we going?



চিত্রঃ ১১৬

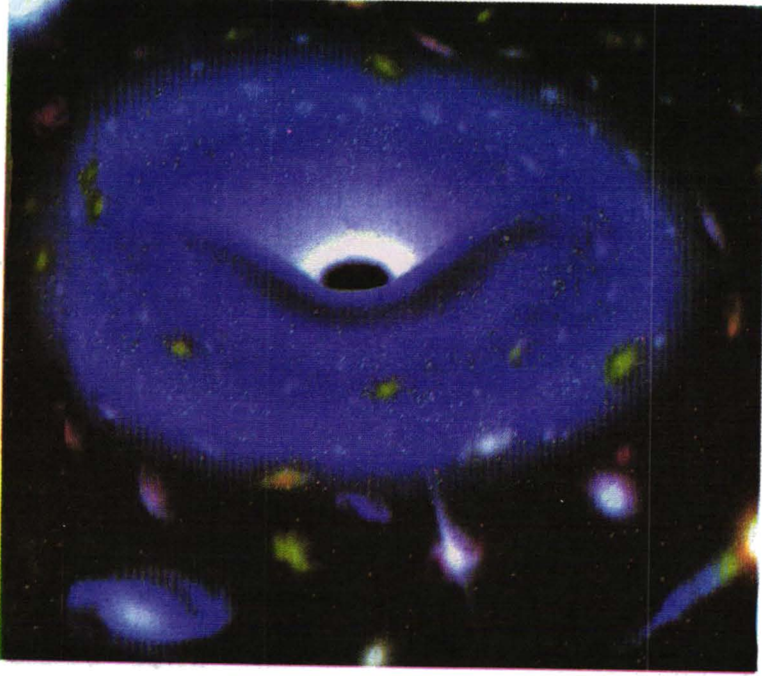
"আমি শপথ করিতেছি হারিয়ে যাওয়া তারকাপুঞ্জের, যখন উহারা ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায় এবং অদৃশ্য হইয়া যায়।" (৮১ ঃ ১৫,১৬)

- ছবিতে দৃশ্যমান এক একটি চাক্‌তি এক একটি ব্যক্তি গ্যালাক্সী, গড়ে প্রায় ২০,০০০ কোটি নক্ষত্র বুকে ধারণ করে মহাকাশের মহাশূন্যতায় ক্রমান্বয়ে গতি বৃদ্ধি করে উড়ে যাচ্ছে। গতি যত বাড়ছে ততই প্রচন্ড চাপে আকৃতি ছোট হয়ে যাচ্ছে। এভাবে এক সময় সকল কাঠামো ভেংগে-চুড়ে কল্পনাতীত এক মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে উপনীত হচ্ছে।

যেহেতু বস্তু জগতের প্রায় প্রান্ত সীমানার দিকে এগিয়ে যাওয়া গ্যালাক্সী সমূহ দ্রুত গতির কারনে উক্ত অবস্থার স্বীকার হচ্ছে এবং একটা দীর্ঘ সময় ধরে এদের অভ্যন্তরে তা চলতে থাকে (গ্যালাক্সী সম্পূর্ণরূপে সঙ্কুচিত হয়ে মহাসুক্ষ্ম বিন্দুতে পৌঁছা পর্যন্ত) সে কারনে সেখানকার জীবনময় গ্রহসমূহ চূড়ান্ত ধ্বংস হওয়ার পূর্বেই গ্রহানু ও ধূমকেতুর বিক্ষিপ্ত আক্রমনে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে থাকবে, প্রকম্পিত হয়ে থাকবে, পাহাড়-পর্বত উড়ন্ত ধূলা-বালিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকবে এবং একই কারনে সাগরের পানি উচ্ছসিত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে মহাপ্লাবনের সৃষ্টি করবে, ঐ মহা দূর্যোগে এগুলি খুব সহজেই ঘট্‌তে থাকবে। এমন কি প্রাণীকুল দেখতে পাবে দূরের তারকারাজি আলো হারিয়ে বিপর্যস্ত হচ্ছে। যদিও হয়তোবা পরক্ষণে নিজ মাতৃ সৌরজগতের সকল কিছু সহ উদ্ভিদ, জীব ও প্রাণীকুল সবাই ধ্বংসের করাল গ্রাসে নিক্ষিপ্ত হয়ে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পরবর্তী অবস্থা জানার আর সুযোগ হবে না।

আশ্চার্য হওয়ার মত বিষয় বর্তমান বিজ্ঞানীগণ আরও আবিষ্কার করেছেন। তারা ইতোমধ্যেই প্রায় প্রতিটি গ্যালাক্সীর কেন্দ্রেই অসংখ্য বিরাট-বিরাট 'ব্ল্যাক হোলের' (massive black hole) সন্ধ্যান লাভ করেছেন। যেগুলি এখনই সহস্র-সহস্র নক্ষত্রজগত গলাধঃকরণ করে বিরাট ভয়ংকর চেহারা নিয়ে হুঙ্কার ছাড়ছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন এদের একটাই কাজ, আর তা হলো আশ-পাশের সব নক্ষত্র ছিড়ে-ফুঁড়ে গিলে-গিলে সাবাড় করা।

বস্তু জগতের প্রান্ত সীমানায় গ্যালাক্সীসমূহ শূন্যের কোঠায় গমনে নিরত থাকাবস্থায় তখন ঐ ধারাটিকে সহযোগীতা করে সহজে পূর্ণকার্যটি সমাধা করার জন্যই মহাজাগতিকভাবে ব্ল্যাক হোল গুলো গ্যালাক্সীদের অভ্যন্তরে সৃষ্টি হয়ে আছে। ব্ল্যা হোল ছাড়া মহাবিশ্বে এ পর্যন্ত এমন কোন বিষয় আবিষ্কৃত হয়নি যা সমগ্র গ্যালাক্সীকে প্রায় গড়ে ২০,০০০ কোটি সৌর পরিবার সহ কোনঠাসা করে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর সঙ্কোচনের প্রক্রিয়ায় 'মহাসুক্ষ্ম বিন্দুতে' (ঝরহমঁষধৎরঃু-তে) পৌঁছাতে পারে। তাই সমগ্র গ্যালাক্সী জুড়ে ব্যাপক প্রলয়ের সময় চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ছিন্ন-ভিন্ন হওয়া সকল বস্তুকে 'ব্ল্যাক হোল' উহার আগ্রাসী টানে মানব জ্ঞানে অবহিত সবচেয়ে ভয়ংকর ও আশ্চার্য করার মত 'চৌঙে' (নষধপশ যড়ষব ঃহহবষ-এ) প্রবেশ করিয়ে রহসাবৃত অজানা এক পদ্ধতিতে গোটা গ্যালাক্সীকে ক্রমান্বয়ে এক অদৃশ্য মহাসুক্ষ্ম বিন্দুতে জমিয়ে দিবে। যে বিন্দুটি চাপ এবং তাপের



চিত্রঃ ১১৭

"অধিকন্তু কিয়ামাত উহাদিগের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামাত হইবে কঠিনতর ও তিক্ততর।" (৫৪ ঃ ৪৬)

- গ্যালাক্সীর অভ্যন্তরে যত Black hole আছে, এরা গ্যালাক্সীর সঙ্কোচনের কারণে পরস্পর মিলিত হয়ে বৃহদাকার Black hole-এ রূপ নিবে এবং সমগ্র বস্তুভরকে প্রচন্ড গ্রাসে গলাধঃকরণ করে মহাসূক্ষ্ম এক বিন্দুতে জমিয়ে দিবে। চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে যাবে বর্তমান প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরা গ্যালাক্সীর এবং এর আভ্যন্তরীন প্রাণময় জগতসমূহের ইতিহাস। মহাজ্ঞানী স্রষ্টার কি সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ কৌশলসম্পন্ন পরিকল্পনা, যা দর্শনে সমস্ত চেতনা নিস্তেজ হয়ে মাথা অবনত হয়ে আসে। 'প্রভু' সত্যিই তুমি মহান স্রষ্টা ও প্রতিপালক, তুমি তুলনাবিহীন্ তুমি পবিত্র, তুমিই শ্রেষ্ঠ।

শর্তপূরণ স্বাপেক্ষে পরবর্তীতে প্রচন্ড এক বিস্ফোরণের মাধ্যমে নতুন জগত সৃষ্টির অপেক্ষায় প্রহর গুনতে থাকবে। আমরা পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে সে বিষয়ে আরও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবো, ইন্‌শাআল্লাহ্।

আমাদের মহাবিশ্বে ওপরে উল্লেখিত বর্ণনা অনুযায়ী সম্ভবত ঃ গ্যালাক্সীসমূহ অতীতকাল থেকেই পর-পর এভাবে বস্তুজগতের প্রান্ত সীমানায় প্রবেশ করছে এবং ভবিষ্যতেও একই ধারা অব্যাহত থাকবে। বর্তমান বিজ্ঞান সত্য-সত্যই এ তথ্য উদ্‌ঘাটন করে জ্ঞানবান সমাজের প্রভুত কল্যাণ সাধন করেছে।

'কিয়ামাত' বা মহাপ্রলয় বিষয়ক বাস্তব আলোচনায় কুরআনের বর্ণিত ধারাবাহিক পর পর আলামতের সাথে বর্তমান বিজ্ঞানের পেশকৃত তথ্যবহুল রিপোর্টের মৌলিকভাবে তথ্যগত কোন পার্থক্য দেখতে পাই না, বরং উভয় বক্তব্যেই আমাদেরকে একই ধারণা দিয়ে যাচ্ছে। এখন কথা হলো – বিজ্ঞান কর্তৃক মহাপ্রলয় সম্পর্কিয় একাধিক মহাজাগতিক পদ্ধতি উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় আমরা নির্দিষ্ট কোন একটি পদ্ধতি কিংবা একাধিক পদ্ধতিকে আমাদের গ্যালাক্সীর বর্তমান অবস্থানের সার্বিক বিবেচনায় বেশি সম্ভবনাময় ধারণা করতে পারি কি-না তা উম্মোচন করার চেষ্টা করবো ! আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি – এ ব্যাপারে সত্য এবং সঠিক জ্ঞান একমাত্র মহান স্রষ্টা 'আল্লাহ্‌র' নিকটই লুকায়িত, যেহেতু তিনি 'কুরআনে' কিছু নমুনা পেশ করেছেন আমাদের অবহিতির জন্য এবং বিজ্ঞান নামক বিশেষ জ্ঞান তিনি মানুষের জ্ঞানরাজ্যে সরবরাহ করেছেন যৎসামান্য হলেও পরোক্ষভাবে এর রহস্য উদ্‌ঘাটন করার জন্য। তাই ঐ সকল ঐশী বাণী এবং সঠিক তথ্যের ভিত্তিতেই আমরা কিছুটা বাস্তব সত্য অবস্থার ধারনা লাভ করার জন্যই এই অধ্যায়ের সূচনা করেছি যেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানে বড় বড় শিক্ষিত এবং উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি বর্গ মিথ্যার গোলক ধাঁ-ধাঁয় পড়ে গিয়ে এক মহাসত্যকে অস্বীকার করে চূড়ান্ত ধ্বংসের আবর্তে হারিয়ে না যান।

ওপরে বর্ণিত 'কুরআনের' এবং 'বর্তমান বিজ্ঞানের' বক্তব্য থেকে আমাদের নিকট পৃথিবী নামক এই জীবনময় গ্রহটি ধ্বংসের ব্যাপারে 'গ্যালাক্সীদের পারস্পরিক সংঘর্ষ' এবং 'গ্যালাক্সীর শূন্যের কোঠায় গমন' উক্ত দুটি পদ্ধতিকেই প্রাথমিক পর্যায়ে বেশি সম্ভবনাময় বলে মনে হয় (প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্ই ভালো জানেন)। কেননা উক্ত দু'টি পদ্ধতির যে কোন একটি পদ্ধতি ঘটলেই ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর ধ্বংস যজ্ঞ ঘটবার

ফলে 'কুরআনে' বর্ণিত সকল আলামত গুলোই পর-পর পরিষ্ফুটিত হয়ে প্রকাশিত হবে। অন্য কোন পদ্ধতিতেই সকল আলামত কভার করে না। যেমন 'গ্রহানুর' আঘাতে বা 'ধুমকেতুর' পতনে পৃথিবী ধ্বংস হতে পারে সত্য কিন্তু চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না এবং হওয়ার কথাও নয়, আকাশ জগত ও অক্ষত থেকে যাবে। তাহলে কুরআনের বক্তব্য কেন সে দিকেও ইশারা করেছে? ঐশী গ্রন্থ হিসেবে কুরআনের বাণীর কোন নড়-চড় হতে পারে না। আর সে জন্যই বিজ্ঞান বিলম্বে হলেও 'কুরআনকে' সত্যে প্রমাণীত করার লক্ষ্যে মহাকাশের দূর-দূরান্তে গ্যালাক্সীদের 'পারস্পরিক সংঘর্ষ' এবং বস্তু জগতের প্রায় প্রান্ত বা শেষ সীমানায় গ্যালাক্সীদের দ্রুত গতি প্রাপ্ত হওয়া এবং সেই কারনে প্রবল সঙ্কোচনের মাধ্যমে সমগ্র গ্যালাক্সী প্রায় শূন্যের কোঠায় গমনের বাস্তব সত্য তথ্য আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছে।

উক্ত দুটি পদ্ধতির যে কোন একটির মাধ্যমে কিয়ামাত শুরু হলেই আমাদের পৃথিবী বিক্ষিপ্ত ভাবে আগত গ্রহানু বা ধুমকেতুর দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হতে পারে। তাতে পৃথিবীর বায়ুমন্ডল বিনষ্ট হতে পারে, ব্যাপক ভূ-কম্পনের সৃষ্টি হয়ে পাহাড়-পর্বত বিপর্যস্ত হয়ে বালু কনার মত উড়তে পারে, পৃথিবী পৃষ্ঠে সব চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে পারে। সাগরে পতিত হওয়ার ফলে কল্পনাতীত জলোচ্ছাসে ভূ-ভাগ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হতে পারে, পানিতে ডুবে যেতে পারে। নক্ষত্র, গ্রহ এবং উপগ্রহ লক্ষ-লক্ষ হিসেবে ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ার কারনে মহাশূন্যে ধূলা-বালির মেঘে পরিপূর্ণ হয়ে যেতে পারে। নিজ আবাসস্থল থেকে দূরবর্তী তারকা বা নক্ষত্র সমূহের স্থানচ্যুত হয়ে বিপর্যস্ত হওয়ার দৃশ্য হয়তোবা দেখা যেতে পারে (পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কেবল তা সম্ভব, এর পর দেখার প্রশ্নই উঠে না)। চন্দ্র ও সূর্য ধ্বংস হতে পারে। আকাশ মন্ডলীর সর্বত্র ব্যাপক থেকে ব্যপকতর বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়তে পারে, যার জন্য দীর্ঘ সময় ধরেই সে তান্ডবলীলা চলতে পারে।

এতটুকুন আসার পর আমরা যদি আবার 'কুরআন' ও 'বিজ্ঞানের' দিকে একটু ফিরে তাকাই তাহলে পৃথিবীর চূড়ান্ত ধ্বংসের ব্যাপারে উল্লেখিত দুটি পদ্ধতির মধ্যে একটি পদ্ধতিকেই অপরটি থেকে বেশি সম্ভাবনাময় দেখতে পাবো। অর্থাৎ 'পারস্পরিক সংঘর্ষের' তুলনায় 'গ্যালাক্সীদের শূন্যের কোঠায় গমনই' অধিকতর সম্ভাবনাময় হিসেবে ধারণা করতে পারবো। লক্ষ্য করুন 'কুরআনেই বলা হয়েছে "তাহারাতো অপেক্ষা করিতেছে একটি মাত্র প্রচন্ড

ধ্বনির যাহাতে কোন বিরাম থাকিবেনা" (৩৮ ঃ ১৫)। "এবং শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, ফলে যাহাদিগকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তাহারা ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মুর্ছিত হইয়া পড়িবে। অতঃপর আবার শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে তৎক্ষণাত উহারা দন্ডায়মান হইয়া তাকাইতে থাকিবে" (৩৯ ঃ ৬৮)। উল্লেখিত পরপর তিনটি ঐশীবাণী হতে আমরা যে ধারণা লাভ করতে পারি তাহলো কিয়ামাত প্রচন্ড শব্দ নিনাদে আরম্ভ হবে এবং বিরামহীনভাবে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে। (গ্যালাক্সীদের 'শূণ্যের কোঠায় গমনে' দীর্ঘ সময় নিবে, তাই কিয়ামাত দীর্ঘ সময় ধরেই চলবে।) অত:পর চূড়ান্ত ধ্বংসের পরে তখন দ্বিতীয়বার আবার প্রচন্ড শব্দ নিনাদের সৃষ্টি করে সকল মানব গোষ্ঠীকে হাশরের মাঠে উঠানো হবে। ('শূণ্যাবস্থা বা মহাসূক্ষ্ম বিন্দু প্রাপ্ত গ্যালাক্সী প্রচন্ড চাপ ও তাপে আবার মহাবিষ্ফোরণ ঘটিয়ে নতুন জগত সৃষ্টি করবে বিধায় প্রচন্ড শব্দ নিনাদের সৃষ্টি হবে।) উক্ত ধারনাটি 'গ্যালাক্সীদের পারস্পরিক সংঘর্ষের' চেয়ে 'গ্যালাক্সীদের শূন্যের কোঠায় গমন'কেই সমর্থন (সাপোর্ট) করে বেশি। আবার তুলনামূলক ধ্বংস সাধন ক্ষমতায়ও উক্ত পদ্ধতি অন্য সকল পদ্ধতি অপেক্ষা খুব বেশি কার্যকর। তাছাড়া এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল- প্রত্যেকটি গ্যালাক্সীকেই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মহাজাগতিক নিয়মে 'শূণ্যের কোঠায়' প্রবেশ করতেই হচ্ছে। কোন একটি গ্যালাক্সী এই অবস্থা থেকে রেহাই পাচ্ছে না। অন্যান্য পদ্ধতিগুলো নিশ্চিত নয় বরং সম্ভাবনাময় মাত্র। তাই গ্যালাক্সীর 'শূণ্যের কোঠায় গমন'-ই হয়তোবা পৃথিবীর মহাপ্রলয় ডেকে আনবে চূড়ান্তভাবে।

এখন এ বিষয়ে বর্তমান বিজ্ঞানের চূড়ান্ত কথা হচ্ছে – আমাদের লোকাল গ্রুপে প্রায় ৩২টি গ্যালাক্সী (ছোট-বড়) অবস্থান করছে। তার মধ্যে আমাদের 'Milky Way' Galaxy-টির নিকটতর্বী গ্যালাক্সী হচ্ছে 'এ্যান্ড্রোমিডা' (Andromeda)। উভয় গ্যালাক্সীই তাদের অভিকর্ষ বলের (Grvitational force) কারনে পরস্পর পরস্পরের দিকে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই বিজ্ঞানীরা সতর্কতার সাথেই ভবিষ্যতবাণী পেশ করেছেন হয়তোবা কোন একসময় উভয় গ্যালাক্সীর মাঝে সংঘর্ষ ঘট্তে পারে এবং তাতে উভয়ই ধ্বংস প্রাপ্ত হতে পারে। আবার কোন কোন বিজ্ঞানীর মত হচ্ছে উভয় গ্যালাক্সীর মাঝে ব্যবধান হচ্ছে প্রায় 'সাড়ে বাইশ

লক্ষ আলোক বর্ষ'। অতএব মহাজাগতিক কোন অদৃশ্য কারনে এদের কোনটির গতিপথ উল্লেখিত বিরাট দূরত্বের মধ্যে পরিবর্তনও ঘট্‌তে পারে, তা মোটেই বিচিত্র নয়। ফলে এদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ নাও ঘট্‌তে পারে। ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি অর্থাৎ ভাগাভাগি হয়ে গেছে, সংঘর্ষ ঘট্‌তেও পারে আবার নাও ঘট্‌তে পারে।

'গ্যালাক্সীদের শূন্যের কোঠায়গমনে' কিন্তু সকল বিজ্ঞানী ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় একমত। মহাবিশ্বের কঠিন নিয়ম-শৃংখলার ভিতর দিয়ে মহাজাগতিক বস্তু সমূহ যেমনি সৃষ্টি হচ্ছে, তেমনি আবার কঠিন নিয়ম-শৃংখলার মধ্য দিয়েই চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এর কোন ব্যতিক্রম নেই, নেই কোন পরিবর্তন। এ ব্যাপারে সামান্য কোথাও পরিবর্তনের যোগ্যতা, ক্ষমতা, শক্তি কোনটা-ই পৃথিবীর মানব মন্ডলীর নেই। পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে টেলিস্কোপের (Telescope-র) সাহায্যে পৃথিবীর মানব সমাজ প্রতিনিয়তই বস্তু জগতের প্রায় প্রান্ত সীমানায় অসংখ্য গ্যালাক্সীকে ওপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে মহাসংকোচনের মাধ্যমে 'শূন্যের কোঠায়' তথা অদৃশ্যে ক্রমান্বয়ে হারিয়ে যেতে দেখতে পাচ্ছে। শুনতে যতই ভয়ে গা শিউরে উঠুক বিষয়টি কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতায় একশত ভাগ সত্য। পরবর্তী 'পুনর্জীবন' অধ্যায়ে আমরা উক্ত বিষয়ে আরো আশ্চার্য করার মত তথ্য পাবো, ইন্‌শাআল্লাহ্‌।

এখন পবিত্র কুরআনের বক্তব্যে 'কিয়ামাত বা মহাপ্রলয়' বিষয়ে আমাদেরকে যে আলামতের বা নিদর্শনের ধারণা দেয় এবং বর্তমান বিজ্ঞান তার সর্বশেষ উদ্‌ঘাটনে যে সকল তথ্য সরবরাহ করে তা-কি আমাদের জ্ঞানের সম্মূখে একই পরিণতির চিত্র তুলে ধরেনা ? পৃথিবী সহ আকাশ মন্ডলী (গ্যালাক্সী) সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস সাধনের কি একই রূপ-রেখা প্রকাশ করেনা ? মহান স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ট সৃষ্টি 'মানুষের' জন্য তাঁর পক্ষ থেকে এই যৎসামান্য ইশারাই যথেষ্ট হতে পারে। যারা জ্ঞানবান তারা জ্ঞান নামক অন্তর চক্ষু দ্বারা প্রকৃত বিষয় উপলব্ধি করতে পারেন এবং সে কারনে বিশ্ব প্রতিপালককে যথাযথভাবে ভয় করে নিজ জীবনকে নিরবচ্ছিন্নভাবে স্রষ্টার গোলমীর স্রোতে প্রবাহ্‌মান রেখে ইহ্‌জগত ও পরজগতে সফলতা লাভের নিমিত্তে চেষ্টাও করতে থাকেন।

সুতরাং আলোচনার শেষ লগ্নে এসে 'কিয়ামাত কোন্‌ পদ্ধতিতে হতে পারে ?'-এ প্রশ্নের জবাবে আমরা যা বলতে পারি তা হলো – 'আমাদের

প্রভুর পক্ষ থেকে আগত পবিত্র বাণী এবং বর্তমান চরম উৎকর্ষীত বিজ্ঞানের সত্য-সঠিক আবিষ্কারের আলোকে আমরা ধারণা করছি সম্ভবতঃ 'গ্যালাক্সীর শূন্যের কোঠায় গমনে' যে 'মহাধ্বংস' বা 'মহাপ্রলয়' শুরু হবে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী জুড়ে, তাতেই আমাদের পৃথিবীর 'কিয়ামাত' ঘট্তে পারে।' (প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ্ই ভালো জানেন এবং কোন প্রকার ত্রুটি ও বাড়াবাড়ীর জন্য তাঁর নিকট একান্তভাবে মস্তক অবনত করে ক্ষমা চাচ্ছি। আল্লাহ্ মহান এবং অত্যন্ত দয়ালু)।

আবার এও হতে পারে যে, আমরা যা আলোচনা করেছি তার কোন পদ্ধতিকেই আল্লাহ্ তায়ালা 'কিয়ামাতের' জন্য নির্ধারণ না করে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী একেবারে নতুন অন্য কোন এক পদ্ধতিও ব্যবহার করতে পারেন। সে ক্ষমতা তাঁর রয়েছে।

এবার আমরা বিষয়টি এক নজর দেখে নিই।

এক নজর

আল্-কুরআন	বর্তমান বিজ্ঞান
(১) "অধিকন্তু কিয়ামাত উহাদিগের শাস্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামাত হইবে কঠিনতর ও তিক্ততর।" (৫৪ : ৪৬)	(১) 'পৃথিবী' নামক এ জীবনময় গ্রহটি আমাদের মহাবিশ্বের মাঝে একটি মহাজাগতিক জ্যোতিষ্ক। মহাবিশ্বের অন্যান্য জ্যোতিষ্কের ন্যায় কালের প্রবাহে একদিন এরও যবনিকাপাত ঘট্বে প্রচন্ড ও ভয়াবহ ধ্বংসের মাধ্যমে।
(২) "যখন প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হইবে পৃথিবী এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়িবে ফলে উহা পর্যবসিত হইবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকনায়।" (৫৬ : ৬)	(২) পৃথিবী ধ্বংসের প্রচন্ডতা এবং ভয়াবহতা এত মারাত্মক আকার ধারণ করবে যে ভূমিকম্প, ধ্বশ, ওপর থেকে পাথরের আঘাতে পাহাড়-পর্বত ও ভূমি ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে একাকার হয়ে যাবে এবং সব ধূলা-বালিতে রূপান্তরিত হবে।

(৩) "সেইদিন মানুষ হইবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত এবং পর্বত সমূহ হইবে ধূনিত রঙীন পশমের মত।" (১০১ ঃ ৮,৫)	(৩) ধ্বংসের তীব্রতায় মানব-মন্ডলী দিশেহারা, মাতাল সদৃশ হয়ে পঙ্গপালের মত দিক-বিদিগ জ্ঞানশূন্যভাবে দৌড়াতে থাকবে প্রাণ ভয়ে, কেহ্ কারও খবরই নিতে পারবেনা।
(৪) "আকাশ যখন বিদির্ণ হইবে, গ্রহানুসমূহ যখন বিক্ষিপ্তভাবে নিক্ষিপ্ত হইবে, যখন সমুদ্র উচ্ছসিত হইয়া যাইবে।" (৮২ ঃ ১-৩)	(৫) মহাশূন্যে মহাকর্ষবলের (Gravity) প্রভাব ক্ষুন্ন হয়ে ভারসাম্যহীন পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় ভাসমান পাথরের বহর, ধূমকেতু, উল্কাপিন্ড অনবরত এলোপাথাড়ী ছুট্তে গিয়ে পৃথিবীর মধ্যাকর্ষনে আট্কে গিয়ে প্রচন্ড গতিতে ভূ-পৃষ্ঠে আছড়ে পড়বে, ফলে সমদ্রে পতিত হওয়ার কারনে একে রাগিয়ে তুলবে এবং উঁচু পাহাড় সমান ঢেউয়ের সৃষ্টি করে ভূ-ভাগ ডুবিয়ে দিবে।
(৫) "যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হইবে, যখন আকাশ বিদীর্ণ হইবে এবং যখন পর্বতমালা উন্মিলিত ও বিক্ষিপ্ত হইবে।" (৭৭ ঃ ৮-১০)	(৫) ধ্বংসের তান্ডবে ভূমি, পাহাড়-পর্বত, ধূলি-কনায় পরিনত হয়ে ওপরের দিকে উঠে গিয়ে ছাতার ন্যায় পৃথিবীকে ঢেকে দিবে, ফলে নক্ষত্ররাজির আলোও দেখা যাবে না। সকল আলোময় বস্তুকে জ্যোতিহীন মনে হবে। অন্ধকারে পৃথিবী ছেয়ে যাবে শত বছরের জন্য। নেমে আসবে তুষার যুগ, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সকল প্রানের স্পন্দন।
(৬) "যখন চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে এবং চন্দ্র হইয়া পড়িবে	(৬) আকাশের ভারসাম্য ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ায় চন্দ্র ও সূর্য কক্ষচ্যুত

জ্যোতিহীন। যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হইবে।" (৭৫ ঃ ৬-১১)	হয়ে পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হবে অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রের ন্যায়। ফলে সব ধ্বংসস্তুপে পরিণত হবে।
(৭) "সূর্য যখন নিস্প্রভ হইবে, যখন নক্ষত্ররাজি খসিয়া পড়িবে, পর্বত সমূহকে যখন চলমান করা হইবে।" (৮১ ঃ ১-৩)	(৭) দৃশ্যমান শত-সহস্র নক্ষত্রসমূহ এদের বর্তমান অবস্থান থেকে কক্ষচ্যুত হয়ে এলো-মেলো পথে চলতে শুরু করবে এবং মহাকর্ষ বলের প্রভাব ক্ষুন্ন হওয়ায় মহাকাশে বড় ধরনের বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে। ফলে কিয়ামাত ঘটবে কি-না সে প্রশ্ন বিজ্ঞান বিশ্বে একেবারেই অবান্তর। এখন বরং প্রশ্ন হতে পারে তা কখন ঘটতে পারে?
(৮) "তাহারাতো অপেক্ষা করিতেছে একটি মাত্র প্রচন্ড নিনাদের যাহাতে কোন বিরাম থাকিবেনা।" (৩৮ ঃ ১৫)	(৮) ওপরে বর্ণিত ধ্বংসীয় আলামতগুলো 'গ্যালাক্সীর শূন্যের কোঠায় গমন' ব্যবস্থায় কেবলমাত্র পরিদৃশ্য হতে পারে, অন্য কোন ব্যবস্থায় নয়। আর তাই যদি হয় তাহলে 'গ্যালাক্সীর প্রান্ত থেকে প্রথম ভাঙা শুরু হতে যে শব্দের বা নিনাদের উৎপত্তি হবে তা চলতে থাকবে গ্যালাক্সী ভেঙ্গে -ভেঙ্গে একটি বিন্দুতে সঙ্কুচিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যা কয়েক মিলিয়ন বছরের ব্যাপারও হতে পারে। যে অবস্থাকে দীর্ঘসময় বলা যেতে পারে।
(৯) "যেই দিন উহারা প্রত্যক্ষ করিবে, সেইদিন উহাদিগের মনে হইবে যেন উহারা পৃথিবীতে মাত্র	(৯) ধ্বংসের তান্ডবে দীর্ঘ সময় দুল্‌তে থাকায় মানুষের মনে হবে সে তুলনায় তারা পৃথিবীতে মাত্র এক

এক সন্ধ্যা বা এক সকাল অবস্থান করিয়াছে।" (৭৯ ঃ ৪৬)	সকাল বা এক সন্ধ্যা অবস্থান করেছিল মাত্র, কেননা সমগ্র গ্যালাক্সীর প্রায় ২০,০০০ কোটি নক্ষত্র তখন পর পর ধ্বংস হতে প্রচুর সময় লেগে যাবে।

সুতরাং 'কিয়ামাত' অবিশ্বাসী জ্ঞানী-গুণি পণ্ডিত ও বিজ্ঞানে পারদর্শী সমাজের তাদের পূর্বের অবস্থানে দাড়িয়ে থাকার আর সুযোগ রইল না। পৃথিবীর কিয়ামাত আর অস্বীকার নয় বরং এ যে এখন এক কঠিন বাস্তবতার পথ ধরে ক্রমান্বয়ে সম্মুখে এগিয়ে আসছে, সে কথা বর্তমান বিজ্ঞান চোখে আঙ্গুল রেখে মানব সমাজকে অবহিত করছে। ফলে অতি বিজ্ঞান প্রিয়দের এখনই মুক্তির পথ সন্ধান করা প্রয়োজন নয় কি?

"আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নাই, ইহা এক মহাসাফল্য।"
(১০ ঃ ৬৪)

'কিয়ামাতের সম্ভাব্য সময়'

আল্-কুরআনঃ

"মানুষ তোমাকে কিয়ামাত সম্পর্কে প্রশ্ন করে, বল, ইহার জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র-ই আছে। তুমি ইহা কি করিয়া জানিবে' ?" (৩৩ ঃ ৬৩)

"তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে 'কিয়ামাত কখন ঘটিবে ? বল, 'এই বিষয়ে জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেরই আছে। শুধু তিনিই উহা যথাসময়ে প্রকাশ করিবেন। উহা আকস্মিকভাবেই তোমাদিগের উপর আসিবে। তুমি এই বিষয়ে সর্বশেষ অবহিত মনে করিয়া তাহারা তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, 'এই বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌রই আছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তাহা জানে না।" (৭ঃ১৮৭)

"কিয়ামাতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্-তেই ন্যাস্ত"। (৪১ঃ৪৭)

"বল, 'ইহার জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র-ই নিকট আছে' এবং আমিতো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র"। (৬৭ঃ২৬)

"বল, 'তোমাদিগের জন্য আছে এক নির্ধারিত দিবস, যাহা তোমরা মুহূর্তকাল বিলম্ব করিতে পারিবে না।" (৩৪ঃ৩০)

"কিয়ামাতের লক্ষণসমুহতো আসিয়াই পড়িয়াছে "! (৪৭ ঃ ১)

"ইহারাতো অপেক্ষায় আছে এক মহানাদের যাহা ইহাদিগকে আঘাত করিবে ইহাদিগের বাকবিতন্ডাকালে।" (৩৬ঃ৪৯)

"সম্ভবতঃ কিয়ামাত শীঘ্রই হইয়া যাইতে পারে।" (৩৩ঃ৬৩)

"কিয়ামাত আসন্ন, আল্লাহ্ ব্যতীত কেহ-ই ইহা ব্যক্ত করিতে সমর্থ নহে। তোমরা কি এই কথায় বিস্ময়বোধ করিতেছ! এবং হাসি-ঠাট্টা করিতেছ ! ক্রন্দন করিতেছ না ? (৫৩ঃ৫৭-৬০)

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্‌রই এবং কিয়ামাতের ব্যাপারতো চক্ষুর পলকের ন্যায়, বরং তার চাইতেও দ্রুততর। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (১৬ঃ৭৭)

"কিয়ামাত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে"। (৫৪ঃ১)

"তাহারা ঐ দিনকে মনে করে সুদুর কিন্তু আমি দেখিতেছি ইহা আসন্ন।" (৭০ঃ৬)

"এমন কি অকস্মাৎ তাহাদিগের নিকট যখন 'কিয়ামাত' উপস্থিত হইয়া যাইবে তখন তাহারা বলিবে 'হায়' ! ইহাকে যে আমরা অবহেলা করিয়াছি তার জন্য আক্ষেপ !" (৬ঃ৩১)

আমাদের বর্তমান অধ্যায়টিও পূর্বের অধ্যায়ের মতই একই ধরণের। অর্থাৎ 'কিয়ামাত' বা 'মহাধ্বংস' কখন কোন মুহূর্তে ঘটবে এ পৃথিবী নামক গ্রহের উপর, তার সঠিক কোন সময়ক্ষণটি মহাবিশ্বের স্রষ্টার পক্ষ থেকে আমাদেরকে অবহিত করা হয়নি। দুনিয়ায় মানুষের 'জীবন পরিক্রমা (Life Cycle) মহানস্রষ্টা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করে দেয়া পরীক্ষা বিধায় কিয়ামাতের দিন-ক্ষণ্টি একমাত্র তাঁর নিকটই গোপন করে রাখা হয়েছে। আল্লাহ্‌ ছাড়া তাই অন্য কেউ-ই এর চূড়ান্ত সময়টি সম্পর্কে কোনই জ্ঞান রাখে না। এ অবস্থায় তিনি আমাদেরকে তাঁর সর্বশেষ ঐশীবাণীর মাধ্যমে জ্ঞানের যে 'নিদর্শন' কিয়ামাত সম্পর্কে পাঠিয়েছেন এবং বর্তমান অগ্রগতি সম্পন্ন বিজ্ঞানের মাধ্যমে যতটুকুন তথ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়েছেন তার সবটুকুনের যথার্থ পর্যালোচনা করে আমরা একটা সম্ভাবনাময় সময়ের কথা ধারণা করার চেষ্টা করবো। যাতে করে বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে আমাদের শিক্ষিত সমাজের যে সকল ভাইয়েরা আল্লাহ্‌, রাসুল, কিতাব, জান্নাত, জাহান্নাম, কিয়ামাত ও পরকালসহ ধর্মীয় বিষয়াদি বিশ্বাস করতে চান না বা বিশ্বাস করলেও বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে তা বাস্তব হতে পারে তা মনে করেন না, সেই সকল শিক্ষিত-জ্ঞানী ভাইদের প্রসারিত জ্ঞানময় দৃষ্টির সম্মূখে দৃঢ়ভাবে বিষয়টির অস্তিত্ব তুলে ধরে তাদের কাল্পনিক পূর্বের ধ্যান-ধারণাকে যেন মুছে দিয়ে তদস্থলে 'বিজ্ঞানময় কুরআনের' সঠিক তথ্যগুলো অঙ্কিত করে দিতে পারি। যে বিজ্ঞানের গর্বে গর্বিত হয়ে তাঁরা মহাসত্যগুলোকে উপেক্ষা করছেন, সে বিজ্ঞান দিয়েই শুধু কিয়ামাত নয়, সাথে সাথে এর 'সম্ভাব্য সময়'ও (বিজ্ঞানের) প্রমাণিত তথ্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করে দৃঢ় পদে সত্যের পানে এগিয়ে যেতে তাদেরকে সহায়তা করতে পারি। এখন উদ্ধৃত ঐশীবাণীসমূহের অন্তরনিহিত কথাগুলো পর পর সাজিয়ে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাবোঃ-

(১) মহাবিশ্বের মহানস্রষ্টা আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই 'কিয়ামাত', এর পদ্ধতি কিংবা এর নির্দিষ্ট সময়ক্ষণটি সম্পর্কে কোন সঠিক জ্ঞান রাখে না।

(২) 'কিয়ামাতের' ব্যাপারটি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে এক ভয়ানক ও মহাবিপদসঙ্কুল ঘটনার সূচনা করবে।

(৩) অবশ্যই 'কিয়ামাতের' ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা আছে।

(৪) 'কিয়ামাতের' নির্ধারিত মুহূর্তটি আগে-পিছে করার বা কোনরূপ পরিবর্তন করার ক্ষমতা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নেই।

(৫) 'কিয়ামাতের' আগমনমুহূর্তের লক্ষণসমূহ ইতোমধ্যেই এসে পড়েছে।

(৬) অতএব 'কিয়ামাত' খুবই নিকটবর্তী।

(৭) এতই নিকটবর্তী যে 'কিয়ামাত' সম্পর্কে হাসি-ঠাট্রা ও বাকবিতন্ডাকালেই এটা মানবমন্ডলীকে আঘাত করবে।

(৮) সর্বগ্রাসী 'কিয়ামাতের' আগমন মানুষের চক্ষুর পলকের চাইতেও দ্রুততর হবে এবং মুহূর্তেই সব ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলবে।

(৯) অবিশ্বাসীরা যতই এটাকে সুদুর পরাহত ভাবুক না কেন মহাবিশ্বের মহাজাগতিক হিসাবে 'কিয়ামাত' একেবারে ঘাড়ের ওপরেই অপেক্ষায় আছে।

(১০) কিয়ামাত বাস্তবভাবে আঘাত হানার পর তখন অবিশ্বাসীদের নিজেদের বিরুদ্ধেই শুধু ঘৃণা, আক্ষেপ ও রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে, কিন্তু তাতে কোন প্রকার কল্যাণ হবে না।

আল্লাহ্তায়ালা 'কিয়ামাতের' নির্দিষ্ট দিন-তারিখ না বললেও এর আগমনবার্তা সম্পর্কে এমন সুক্ষ্মভাবে হাল্কা ছোঁয়ায় কিছু কিছু বাণী পেশ করেছেন যে, তাতে সমাজের জ্ঞানবানরা গভীর চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে একটু ভাবনায় নিমগ্ন হলে অন্তরদৃষ্টি দিয়ে 'কিয়ামাত'কে সত্যি-সত্যি একেবারে নিকটেই দেখতে পাবেন। 'কিয়ামাত' সম্পর্কীয় বিষয়টি আমাদের ট্রেন ধরার মত বিষয় নয় বলে ঘড়ির কাঁটার মত টায়-টায় নির্দিষ্ট সময়টি জানার প্রয়োজনও নেই। যেহেতু এটা 'মহাপ্রলয়' সাধন কাল, তাই

তা ঘটার একটা সম্ভাভ্য সময় মানবীয় জ্ঞানে আমরা ধারণা বা অনুমান করতে পারলেই গোটা মানবসমাজকে তাদের অকল্যাণজনক ঘুম থেকে জাগ্রত করার চেষ্টা করতে পারবো এবং আমরা নিজেরাও পরকালীন জীবনে সুখময় দিন লাভ করার জন্য পৃথিবীতে আসবাবপত্র সংগ্রহের জন্য উঠে পড়ে লেগে যেতে পারবো। আর সম্ভবতঃ সে কারণেই মহাবিশ্বের স্রষ্টা 'মহান আল্লাহ্' তিনি একটু করে শুনিয়ে দিলেন যে– "কিয়ামাতের (আগমন মুহূর্তের) লক্ষণসমূহ তো ইতোমধ্যেই আসিয়া পড়িয়াছে।" "কিয়ামাত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে।" "তাহারা ঐ দিনকে মনে করে সুদুর কিন্তু আমি দেখিতেছি ইহা আসন্ন।" "সম্ভবতঃ কিয়ামাত শীঘ্রই হইয়া যাইতে পারে।" উক্ত পবিত্র ঐশীবাণীসমূহ থেকে আমরা এতটুকুন উপলব্ধি করতে পারছি যে, তিনি আমাদের এ জীবনময় পৃথিবী ধ্বংসের জন্য নিজ থেকে যে দিনক্ষণটি (সময়টি) নির্দিষ্ট করেছেন, হয়তোবা পৃথিবী বর্তমানে সেই নির্ঘাত ধ্বংসের চূড়ান্ত বিন্দুর (Extreme Point) নিকটতর্বী হয়ে আছে। মহাবিশ্বে মহাজাগতিক নিয়মের যে কঠিন বাঁধন তিনি রচনা করেছেন, তা থেকে যখন কেউ আত্মরক্ষা করতে পারছে না তখন পৃথিবী তার প্রতিমুহূর্তে মহাশূন্যে পরিভ্রমণে রত থেকে যেভাবে 'মৃত্যুকুপের' নিকটবর্তী হচ্ছে তাতে অল্প সময়ের মধ্যেই 'কিয়ামাতের' মাধ্যমে এর যবনিকাপাত ঘটবে। 'কুরআন মনীষার' উক্ত সতর্কীকরণ আমাদের জ্ঞানরাজ্যকে নাড়া না দিয়ে পারে না। ব্যাপারটি খুবই গুরুতর। যে পৃথিবী বিগত সহস্র-কোটি বছর থেকে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে এবং বর্তমানে জীব-উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল দিয়ে মুখরিত হচ্ছে, তা-কি না খুব সহসাই সকল কিছুকে সাথে নিয়ে মহাপ্রলয়ের বিষের পেয়ালা পান করবে ! মন মান্‌তে না চাইলেও স্রষ্টার বাণী মিথ্যা হতে পারে না। মনে হচ্ছে পৃথিবী এখন মহাশূন্যে যে অবস্থানে আছে হয়তোবা তার খুব নিকটেই অপেক্ষা করছে তার 'ধ্বংসের' প্রহর, যা ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করে নির্মম আঘাত হানবেই। ফলে পৃথিবী তার পৃষ্ঠে অবস্থানরত সকলকিছুকে সাথে নিয়ে ধ্বংসের করাল গ্রাসে পতিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কুরআনের উল্লেখিত বাণীসমূহ আমাদেরকে এমনি এক ধারণা দিয়ে যায়। এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করা দরকার, তা হলো কুরআনে উল্লেখিত 'নিকটবর্তী' বা 'অতিশীঘ্র' বলতে কতটুকুন সময়ের স্কেল আমরা অনুধাবন করবো ? বিষয়টি বোধগম্য করার জন্যই কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে যে, 'পৃথিবীর পঞ্চাশ হাজার বছর পরকালের মাত্র এক দিনের সমান'। আবার 'পৃথিবীতে মানুষের (৫০ থেকে ১০০ বছরের) জীবন

পরকালের হিসেবে একটি মুহূর্তমাত্র (এক সেকেন্ড)'। অতএব, বিশ্বস্রষ্টার বাণীতে 'নিকটবর্তী' বা 'অতিশীঘ্র' বলতে আমরা হাজার বা লক্ষ বছর ও বুঝতে পারি যা মহাজাগতিক হিসেবে এতই নগণ্য যে বলার অপেক্ষা রাখে না। অপরদিকে প্রায় ১৪০০ বৎসর পার হয়ে যাওয়ার পরও এখনো 'কিয়ামাত' সংঘটিত না হওয়ায় উল্লেখিত যুক্তিটি মজবুত ভিত্তির উপর টিকে আছে বলে ধরে নেয়া যায়। কিন্তু এসব হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ যদি এখনি 'পৃথিবী' ধ্বংস করে দেন তাহলেও তা সম্ভব। টু-শব্দটি করারও কারও পক্ষে সম্ভব হবে না। যেহেতু তিনি প্রচন্ড শক্তি-ক্ষমতা ও মহাজ্ঞানের অধিকারী একমাত্র সত্তা। তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই। তাঁকে প্রশ্ন করা যায় না, কিন্তু সবাই তাঁর নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য। তাই বলে ওপরের আলোচনা থেকে আত্মতৃপ্তি লাভ করে এ কথা ভাবার সুযোগ নেই যে – 'যাক বাবা বেঁচে গেছি '! 'কিয়ামাত' আর সহসা আসছে না, আরও কয়েক হাজার-লক্ষ বৎসর পরে হয়তো আসবে তখন আমি বেঁচে থাকবো না, যা ইচ্ছা তাই ঘটুক।' জি না, এমন ভাবার কোন অবকাশ আমাদের নেই। এরূপ ভাবতে পারে একমাত্র অবিশ্বাসী সম্প্রদায়। আমাদের বরং ভাবতে হবে আগামীকালই হয়তোবা 'কিয়ামাত' ঘটে যেতে পারে। আর সে কারণে আজকের দিনে এখন থেকেই আমাকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মহানস্রষ্টার পছন্দনীয় পথে গোলামী করার নিমিত্তে এগিয়ে যেতে হবে। একমাত্র স্রষ্টার বা মালিকের সন্তুষ্টিই আমাকে ঐ 'মহাধ্বংস' বা কিয়ামাত থেকে বাঁচাতে পারে। অন্য সকল পথ এ ব্যাপারে চূড়ান্তভাবে রুদ্ধ।

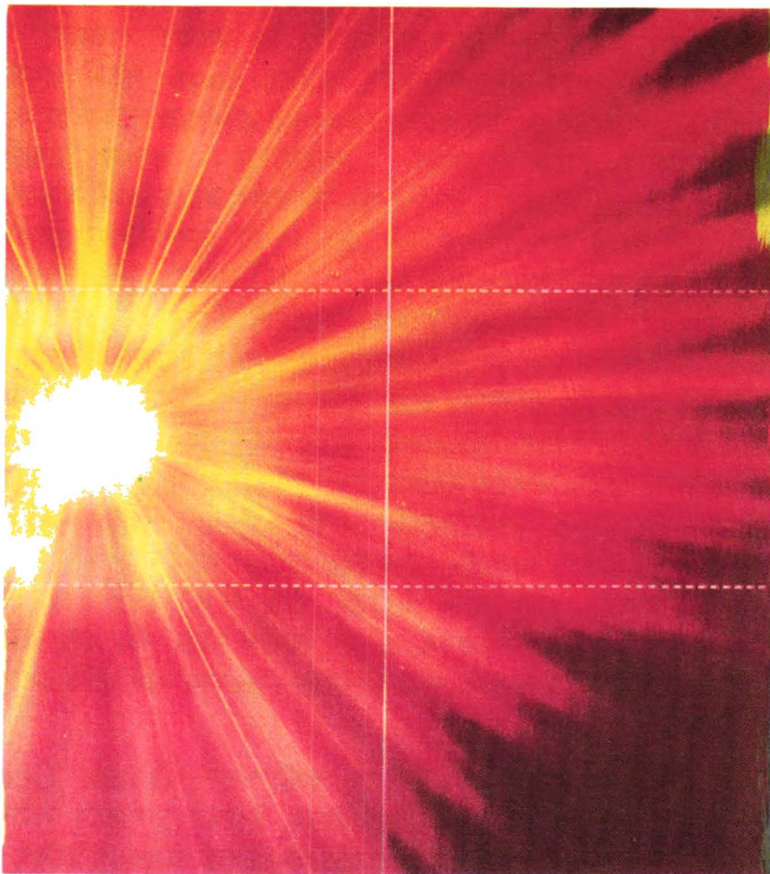
কিয়ামাতের 'নির্দিষ্ট করা সময়ের' ওপর আলোচনায় আমরা শেষ পর্যায়ে লক্ষ্য করেছি যে, আমাদের জীবনময় পৃথিবী বর্তমানে হয়তোবা মহাকাশের মহাশূন্যতায় ধ্বংসের নিমিত্তে নির্দিষ্ট করা চূড়ান্ত বিন্দুর (Extreme Point) প্রায় নিকটেই আছে, যেখানে পৌঁছামাত্র 'কিয়ামাত শুরু' হয়ে যেতে পারে। এবার আমরা বিষয়টিকে বিজ্ঞানের নিকট নিয়ে যাচ্ছি।

বিজ্ঞানঃ

আমরা পূর্বেই বর্তমান বিজ্ঞানের বদৌলতে অবগত হয়েছি যে, আমাদের পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে টেলিস্কোপ দিয়ে বিজ্ঞানজগত সম্মুখের দিকে প্রায় ১৩,০০০ মিলিয়ন (১৩০০ কোটি) আলোকবর্ষ দূরত্ব পর্যন্ত মহাকাশ দর্শন করতে সক্ষম হচ্ছে। উক্ত দর্শনকৃত মহাবিশ্বের মহাশূন্যতায় প্রায় ১০০

কোটির মত গ্যালাক্সীর সন্ধান পেয়েছে, যে গ্যালাক্সীগুলোর প্রতিটিতে গড়ে প্রায় ২০,০০০ কোটি নক্ষত্র বর্তমান রয়েছে। প্রতিটি গ্যালাক্সী সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত শুধু ঘূর্ণনরত অবস্থায় পরস্পর-পরস্পর থেকে দূরত্ব সৃষ্টি করে ক্রমান্বয়ে গতি বৃদ্ধি করে বস্তুজগতের প্রান্তসীমানার দিকে উড়ে যাচ্ছে। আমেরিকান আকাশবিজ্ঞানী 'মিঃ হাবেল পাওয়েল' উক্ত গ্যালাক্সীসমূহের ওপর ব্যাপক জরিপ চালিয়ে ১৯২৯ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, মহাকাশে উড়ন্তবস্থায় ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যাওয়া গ্যালাক্সীসমূহ থেকে আগত 'আলো'কে 'স্পেকট্রোস্কোপির' (Spectroscopy) 'রেড ও ব্লু শিফ্‌ট' পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় দূরের প্রতিটি গ্যালাক্সী-ই আশ্চার্যজনকভাবে 'রেড শিফ্‌ট' প্রদর্শন করে কেবল-ই গতি বৃদ্ধি করে সরে যাচ্ছে। তিনি V= (D= দূরত্ব T= সময় এবং V= গতিবেগ) এই সমীকরণের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, প্রতি ৩.২৬ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বের পর প্রতিসেকেন্ডে গ্যালাক্সীদের গতিবেগ প্রায় ৫০ মাইল (৭৫ কিলোমিটার) হারে বৃদ্ধি পায়। উক্ত সূত্রে তিনি আরো দেখান যে ২৭০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের কোন গ্যালাক্সী প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৪৫,০০০ মাইল গতিতে মহাবিশ্বের প্রান্তসীমানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আবিষ্কৃত 3C-295 কোয়াসারটি একই সূত্রমতে প্রায় ৯০,০০০ মাইল/সেকেন্ড গতিতে গন্তব্যের পানে উড়ে যাচ্ছে। বর্তমান বিজ্ঞানীগণ প্রায় ১৩,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বের পরে 'OQ-172' নামক যে 'কোয়াসারটি' আবিষ্কার করেছেন, তাদের হিসাব মতে ওটা প্রায় আলোর গতির কাছাকাছি গতি লাভ করে উড়ে যাচ্ছে (আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১৮৬,০০০ মাইল)।

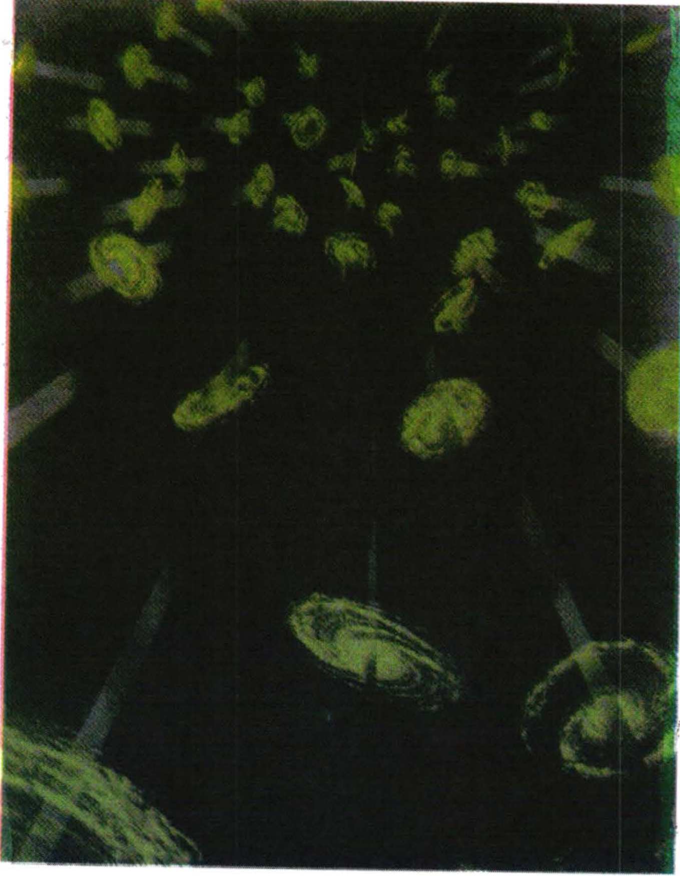
ইতোপূর্বে আমরা 'ফিট্ জিরাল্ড কন্ট্রাকশান' (Fitez Gerald Contraction) ও বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের ভরবেগ তুল্যতার সমীকরণ '$E=mc^2$' হতে অবগত হতে পেরেছি যে চলন্ত বস্তুর গতিবেগ যদি ক্রমাগতভাবে বাড়ানো যায়, তাহলে দ্রুতগতিজনিত বাঁধার কারণে বস্তুটি এর মূল আকৃতি ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়। উক্ত সমীকরণ হতে প্রমাণ হয়েছে যে, যদি কোন বস্তু প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৭ মাইল গতিতে ছুটে যেতে পারে তাহলে এর গতি মুখের অনুকুলে এর আকৃতি এক বিলিয়ন ভাগের প্রায় দুই ভাগ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।



চিত্রঃ ১১৮

"তিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও উহাদিগের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন ছয়টি সময়কালে। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন।" (৫৭ ঃ ৪)

- প্রায় ১৪০০ কোটি বছর পূর্বে মহাবিশ্বটি প্রচন্ড শক্তির ঘনায়নকৃত ও সঙ্কুচিত এক মহাসূক্ষ্ম বিন্দু হতে মহাবিষ্ফোরণের মাধ্যমে জন্মলাভ করেছিল।



চিত্রঃ ১১৯

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর-ই। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (৩ঃ ১৮৯)

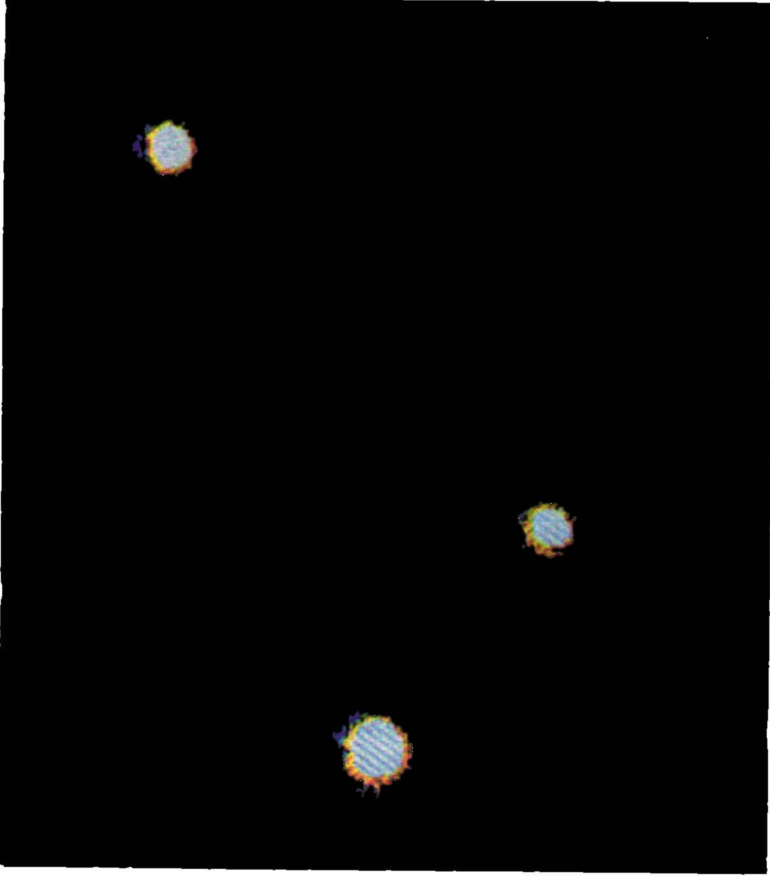
- এ পর্যন্ত আবিস্কৃত প্রায় ১০০ কোটি গ্যালাক্সী সৃষ্টির শুরু থেকেই পরস্পর পরস্পর থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যাচ্ছে মহাজাগতিক নিয়মে নিজ নিজ গতির বৃদ্ধি ঘটিয়ে।



চিত্রঃ ১২০

"তিনি তোমাদিগের কল্যানে নিয়োজীত করিয়া দিয়াছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতেতো রহিয়াছে নিদর্শন। (৪৫ ঃ ১৩)

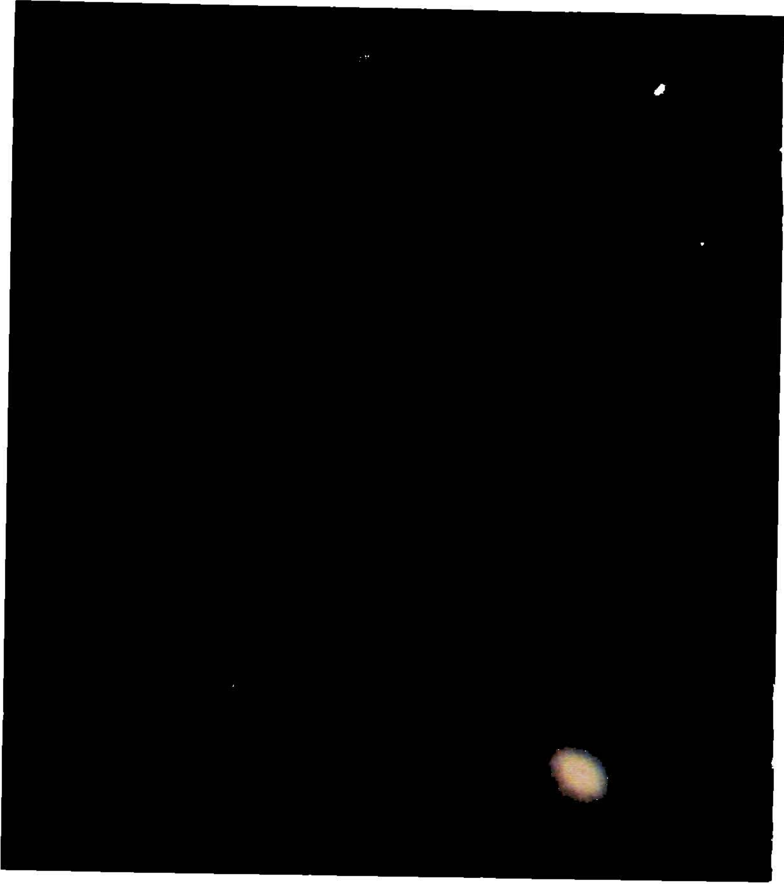
- বর্তমান বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষিত স্পেকট্রোস্কোপি (Spectroscopy) মহাবিশ্বের জ্ঞান অর্জনে এনেছে এক মহাবিপ্লব। এক সাগর জ্ঞান এনে দিয়েছে মানব সভ্যতার হাতের মুঠোয়।



চিত্রঃ ১২১

"শীঘ্রই আমি তোমাদিগকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাইব; সুতরাং তোমরা আমাকে ত্বরা করিতে বলিও না।" (২১ ঃ ৩৭)

- প্রায় ১৩০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বে 'কোয়াসার OQ-172' (ছবিতে ডানদিকে উপরে বড় চাকতির নীচে ক্ষুদ্র অস্পষ্ট চিহ্নটি) আবিষ্কৃত হয়েছে, বিজ্ঞানীগণের হিসেবে তা প্রায় আলোর গতির কাছাকাছি গতিপ্রাপ্ত হয়ে ছুটে যাওয়ার কারণে আদি আকৃতির প্রায় সিংহভাগ প্রবল সঙ্কোচনে ভেংগে-চুরে ক্ষুদ্রত্ব ধারণ করেছে। আর স্বল্প সময়ে হয়তোব বাধ্য হয়ে মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে জমে যাবে।



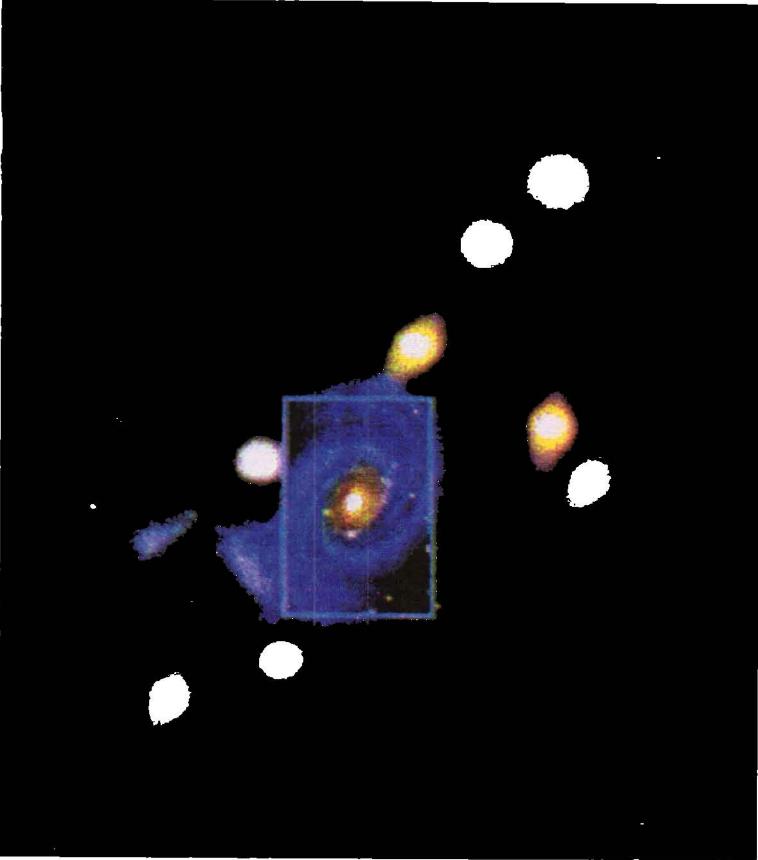
চিত্রঃ ১২২

"আকাশে আমি গ্যালাক্সীসমূহ সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাকে করিয়াছি সুশোভিত দর্শকদিগের জন্য।" (১৫ ঃ ১৬)

- বর্তমান বিজ্ঞানীদের হিসেব মতে আমাদের এই মহাবিশ্বটি বর্তমানে প্রায় ২০,০০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষব্যাপী বিস্তৃত হয়ে আছে। আর তারই মধ্যে প্রায় ১০০ কোটি গ্যালাক্সী আবিস্কৃত হয়েছে। প্রতিটি গ্যালাক্সীই প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষব্যাপী মহাশূণ্যে জায়গা দখল করে ছড়িয়ে আছে এবং প্রতিটিতে প্রায় ২০,০০০ কোটি নক্ষত্র বিরাজ করছে। এই গ্যালাক্সীগুলোই মহাবিশ্বে সবচেয়ে বড় সংগঠন, যা অবশ্যই দর্শনীয়।

ওপরে উল্লেখিত সূত্রমতে বিজ্ঞানীগণ প্রমাণ করেছেন, যখন বস্তুজগতের প্রায় প্রান্তসীমানার দিকে উড়ে যাওয়া গ্যালাক্সী ৯৩,০০০ মাইল / সেকেন্ড গতিপ্রাপ্ত হবে তখন এর অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট গ্যালাক্সীর মূল আকৃতি প্রায় ১৫ ভাগ সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। আরও গতি বেড়ে যখন প্রায় ১৬৩,০০০ মাইল / সেকেন্ড গতিপ্রাপ্ত হবে তখন গ্যালাক্সীটির মূল আকৃতির ৫০ ভাগ হ্রাসপ্রাপ্ত হবে অর্থাৎ গ্যালাক্সীটি আদি আকৃতির প্রায় অর্ধেক হয়ে যাবে। এভাবে ক্রমান্বয়ে গতি আরও বৃদ্ধি পেয়ে যখন প্রায় ১৮৬,২৮২ মাইল/সেকেন্ড গতি লাভ করবে তখন গ্যালাক্সীটি চূড়ান্তরূপে সঙ্কুচিত হয়ে প্রায় 'শূন্যের কোঠায়' (Singularity) গমন করবে। ফলে 'গ্যালাক্সীর' অভ্যন্তরে লালিত-পালিত হওয়া প্রায় গড়ে ২০,০০০ কোটি নক্ষত্রসহ সকল কিছুই 'মহাধ্বংসের' পিপাসা নিবারণের জন্য সম্পূর্ণরূপে সঙ্কুচিত হয়ে এক মহাসুক্ষ্ম বিন্দুতে জমে যাবে।

এতটুকুন অবহিত হওয়ার পর এবার আমরা আমাদের গ্যালাক্সী এবং তাতে আমাদের নক্ষত্রের (সূর্যের) অবস্থানের দিকে একবার তাকিয়ে দেখি, তাহলে আমাদের সৌরজগতের অবস্থানগত দিক বুঝে আসলে আমাদের স্থানীয় সম্ভাব্য কিয়ামাত বা মহাধ্বংসের বিষয়টিও বুঝতে অনেকটা সহজ হবে। আমাদের 'মিল্‌কি ওয়ে গ্যালাক্সীটির' ব্যাস হচ্ছে প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ! সে হিসেবে ব্যাসার্ধ হচ্ছে নিশ্চিতভাবে 'পঞ্চাশ হাজার' আলোকবর্ষ। আমাদের নক্ষত্র (সূর্য) থেকে আমাদের গ্যালাক্সী 'মিল্‌কি ওয়ে'র' কেন্দ্র হচ্ছে প্রায় 'ত্রিশ হাজার' আলোকবর্ষ দূরে। উক্ত হিসেবে নিশ্চয় আমাদের সৌরজগত গ্যালাক্সীর প্রান্তসীমানা থেকে ভিতরের দিকে মাত্র 'বিশ হাজার' আলোকবর্ষ দূরে আছে। অতএব আমাদের গ্যালাক্সী বস্তুজগতের প্রান্তসীমানার দিকে উড়ে যাওয়ার পথে নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রমের পর প্রতি ৩.২৬ মিলিয়ন আলোকবর্ষ পর প্রতিসেকেন্ডে ৫০ মাইল হারে ক্রমান্বয়ে গতি বাড়িয়ে যে মুহূর্তে প্রায় একলক্ষ মাইল/সেকেন্ড-র চেয়ে বেশি গতিপ্রাপ্ত হবে ঠিক তখনি হয়তোবা আমাদের 'সৌরজগত' মহাসঙ্কোচনের কঠিন থাবায় আক্রান্ত হবে এবং আমাদের জীবনময় পৃথিবী পূর্বে বর্ণিত 'কিয়ামাত' বা 'মহাধ্বংসে' নিপতিত হবে। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে জীব-উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলসহ পৃথিবীপৃষ্ঠের সকলকিছুই। 'কিয়ামাত' বা মহাপ্রলয় সম্পর্কীয় যত প্রকার আলামতের বর্ণনা আমরা যত প্রকার উৎস থেকেই পাই না কেন, তার সব কয়টি-ই স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়বে উল্লেখিত মহাসঙ্কোচন জনিত মহাজাগতিক কঠিন এক মহা-প্রলয়ের ভিতর

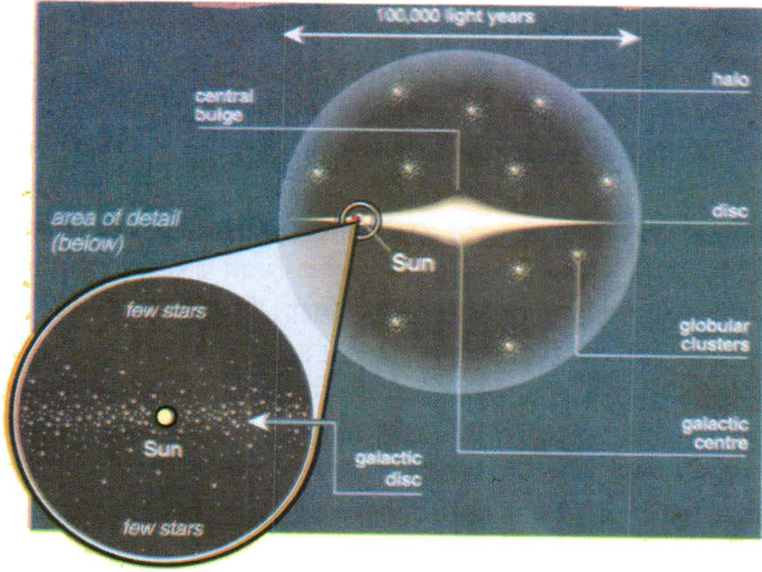


চিত্রঃ ১২৩

"যাহারা আমার নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করে, আমি তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে এমনভাবে ধ্বংসের দিকে লইয়া যাই যে, তাহারা জানিতেও পারিবে না।"

(৭ ঃ ১৮২)

- ছবিতে বক্স চিহ্নিত গ্যালাক্সীটি আমাদের 'Milky Way' গ্যালাক্সী। লোকাল গ্রুপে আছে ছোট-বড় প্রায় ৩২টি গ্যালাক্সী। অতি সম্প্রতি বিজ্ঞান উদ্ঘাটন করতে সমর্থ হয়েছে যে, লোকাল গ্রুপের গ্যালাক্সীগুলো প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৬০০ কিলোমিটার বেগে মহাশূণ্যে উড়ে যাচ্ছে। অতএব আমরাও প্রতি সেকেন্ডে ৬০০ কিলোমিটার বেগে মহাশূণ্যের প্রান্ত সীমানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।



চিত্রঃ ১২৪

"তিনিই মানুষকে জ্ঞান দান করিয়াছেন, ইতিপূর্বে সে যাহা জানিত না।" (৯৬ ঃ ৫)

- আমাদের গ্যালাক্সীর বর্তমান গতি ৩৬০ মাইল বা ৬০০ কিলোমিটার/সেকেন্ড থেকে যখন বৃদ্ধি পেয়ে ৯৩,০০ মাইল/সেকেন্ডে উন্নীত হবে, তখন গ্যালাক্সীর প্রায় ১৫ ভাগ চতুর্দিক হতে প্রচন্ড চাপে ভিতরের দিকে সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে। ফলে গ্যালাক্সীতে আমাদের সৌরজগত অবস্থানগত কারণে ঐ সঙ্কোচনজনিত ধ্বংসের আওতায় পড়ে যাবে। তখন জীবনময় সুন্দর এই পৃথিবীও নিশ্চিত 'কিয়ামাতের' নির্দয় আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে। বর্তমান অবস্থান থেকে বর্ণিত বিপদজনক অবস্থানে পৌছতে আমাদের গ্যালাক্সীর আরও প্রায় ৬০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ পথ পাড়ি দিতে হতে পারে বলে বর্তমান বিজ্ঞানের হিসেবে দেখা যাচ্ছে।

দিয়ে যা এ যাবত আবিষ্কৃত আর কোন ধ্বংসীয় পদ্ধতি-ই প্রদর্শন করতে পারেনি।

সমাপ্তি কথায় যাওয়ার পূর্বে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও আলোকপাত করা জরুরী। আর তা হচ্ছে-এঃযব ওহঃবৎহধঃরড়হধষ অংঃৎড়হড়সরপধষ টহরড়হ (ওঅট) আগষ্ট ২০০০ইং সালের প্রথম সপ্তাহে ঘোষণা করেছে যে, ব্রিটিশ বিজ্ঞানীমহল কর্তৃক পর্যবেক্ষণে নতুনভাবে প্রমাণিত হয়েছে আমাদের মহাবিশ্বটি প্রায় ১৪ বিলিয়ন (১৪,০০০ মিলিয়ন) বর্ষ পূর্বে 'বিগ-ব্যাংগ'-এর মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছিল। দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞানীমহলে এ বিষয়ে বিতর্ক থাকলেও বর্তমানে বিভিন্ন উন্নততর প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে সর্বশেষ যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, তাতে মোটামুটি অধিকাংশ বিজ্ঞানীই একমত। গ্যালাক্সীর উড়ার গতি সকল সময় একই রকম যেমন থাকেনি, তেমনি নিজ মাতৃ গ্যালাক্সীর বাইরে কোন একস্থানে গিয়ে 'মিল্‌কি ওয়ে' তথা নিজ গ্যালাক্সীকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ভালোভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ বিজ্ঞানজগত এখনো লাভ করতে পারেনি বিধায় এ অবস্থায় বিজ্ঞানজগত 'বিগ-ব্যাংগ' বিন্দু থেকে আমাদের গ্যালাক্সী বস্তুজগতের প্রান্তসীমা পর্যন্ত পথের শেষ বিন্দুর দিকে যে এগিয়ে যাচ্ছে তার হিসেব সঠিকভাবে প্রকাশ করতে না পারলেও অনুমান করছে-'মিল্‌কি ওয়ে' আমাদের গ্যালাক্সীটি প্রায় অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে। এখন দ্বিতীয় অর্ধ্যাংশের পথের ওপর দিয়ে উড়ে প্রান্তসীমার দিকে ক্রমান্বয়ে গতি বাড়িয়ে ছুটে চলেছে। অতি সম্প্রতি বিজ্ঞানজগত আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ্ করেছে। তা হলো আমাদের 'লোকাল গ্যালাক্সীগুচ্ছ' (প্রায় ৩২টি গ্যালাক্সী) প্রায় ৬০০ কিঃ মিঃ/সেঃ গতিতে মহাশূন্যে উড়ে যাচ্ছে। আমাদের গ্যালাক্সীর বিষয়টি এখনো এককভাবে প্রমাণ করার ব্যবস্থা আবিষ্কৃত না হলেও, সংশ্লিষ্ট (জড়িত) বৈজ্ঞানিক তথ্য ও উপাত্তগুলো উপেক্ষা করার মত নয় বিধায় মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। আর তাই যদি হয় তাহলে বলতে হবে আমাদের গ্যালাক্সী 'মিল্‌কি ওয়ে' উল্লেখিত দ্বিতীয় ধাপে একদিকে যেমনিভাবে প্রতি সেকেন্ডে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর গতি বৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হবে, ঠিক তেমনিভাবে এটা গতি বৃদ্ধিজনিত বাধার সম্মূখীন হয়ে মহাসঙ্কোচনে প্রবেশ করার 'রেড লাইনের' দ্রুত নিকটবর্তী হবে। বিষয়টি 'ম্যারাথন' দৌড়ের মত যেখানে উক্ত লম্বা দূরত্বের দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীরা প্রথমদিকে হাঁটি-হাঁটি, পা-পা করে এগিয়ে যেতে থাকে; এক চতুর্থাংশ পথ ঐভাবে অতিক্রম করার পর ক্রমান্বয়ে একটু করে দৌড়াতে থাকে, অর্ধেক

পথ পার হওয়ার পর পূর্বের তুলনায় আরো একটু গতি বাড়িয়ে এগিয়ে যেতে থাকে, এরপর ৩/৪ অংশ পাড়ি দেয়ার পর প্রতিযোগীরা সাধ্যমত গতি বাড়িয়ে প্রচন্ডগতিতে সমাপ্তি রেখার (Finishing line) দিকে ছুটে যেতে থাকে বিজয়ের আশায়। অনুরূপভাবে মহাকাশের মহাশূন্যতায় একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করার পর গ্যালাক্সীসমূহ পর্যায়ক্রমে গতি বাড়িয়ে ঘূর্ণনরতবস্থায় প্রচন্ড গতিতে বস্তুজগতের প্রান্তসীমার দিকে ছুটে যেতে থাকে এবং গতিমুখের অনুকুলে বিপর্যয় ঘটবার চূড়ান্ত বিন্দুর নিকটবর্তী হতে থাকে, যেখানে পৌঁছামাত্রই গ্যালাক্সীর চতুর্দিকে প্রান্ত থেকে নক্ষত্রসমূহ প্রচন্ড চাপে ভিতরের দিকে স্থানচ্যুত হয়ে বিশৃংখল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে সকল কিছুসহ সংঘর্ষের মাধ্যমে ধ্বংস হতে শুরু করবে। বিজ্ঞান ইতোপূর্বে প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে, আমাদের গ্যালাক্সী থেকে মাত্র ২৭০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের গ্যালাক্সী প্রায় ৪৫,০০০ মাইল/সেকেন্ডে উড়ে যাচ্ছে, তাতে ঐ গ্যালাক্সীর আভ্যন্তরীণ কাঠামো হ্রাস পাচ্ছে প্রায় ৭ ভাগ। অর্থাৎ, এর মূল আকৃতি ৭ ভাগ ছোট হয়ে যাচ্ছে। এভাবে আমরা যদি উক্ত হিসাবটিকে দ্বিগুণ করে দেখি (২৭০০ X ২ = ৫৫০০), তাহলে দেখতে পাবো–প্রায় ৫৫০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বের গ্যালাক্সী প্রায় (৪৫০০০ X ২ = ৯০,০০০) নব্বই হাজার মাইল/সেকেন্ড গতিপ্রাপ্ত হয়ে এর আদি আকৃতিতে প্রায় ১৫ ভাগ সঙ্কোচন ঘটাচ্ছে। একেবারে সাদা-মাটা হলেও উক্ত হিসেবে প্রতীয়মান হয় আমাদের 'মিল্‌কি ওয়ে' গ্যালাক্সী সম্মুখের দিকে উড়ার পথে আরও প্রায় ৬,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ পথ ঘূর্ণনরত অবস্থায় উড়ে গেলেই নির্ঘাত প্রচন্ড গতির কারণে মহাসঙ্কোচণের করালগ্রাসে নিপতিত হয়ে এর প্রায় ১৫ ভাগ গঠনাকৃতি হারিয়ে ফেলবে। আমাদের সৌরজগতটি গ্যালাক্সীদেহের প্রান্ত থেকে নিকটেই মাত্র বিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থান করছে বিধায় ঐ ১৫ ভাগ সঙ্কোচণের কারণেই সৃষ্ট প্রচন্ড ধ্বংস-তান্ডবের আঘাতে জীবনময় এই সুন্দর গ্রহটিও তার পৃষ্ঠের সকল কিছুকে নিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে শুরু করবে। দৃশ্যমান নক্ষত্রসমূহ এবং চন্দ্র ও সূর্য ক্রমান্বয়ে মহাধ্বংসে পড়ে গিয়ে বিপর্যস্ত হবে। আকাশমন্ডলীর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ঘটবে চরম বিপর্যয়। গ্যালাক্সীর গতি যত বাড়বে ততই এর অভ্যন্তরে ধ্বংসসাধন ব্যাপক থেকে ব্যাপক আকার ধারণ করবে। যত রকমের বিপর্যয় এবং ধ্বংস হতে পারে তার প্রায় সকল আলামত-ই সেখানে ফুটে উঠবে। এক পর্যায়ে যখন আমাদের গ্যালাক্সীটি প্রায় আলোর গতির সমান গতি অর্জন করবে তখন চূড়ান্ত সঙ্কোচনের

কারণে প্রায় ২০,০০০ কোটি নক্ষত্রসহ সকল কিছুকে ধ্বংস করে প্রায় অদৃশ্য মহাসূক্ষ্ম এক বিন্দুতে (Singularity) জমে যাবে।

বিজ্ঞানের উল্লেখিত তথ্যের অনুকূলে বর্তমান বিজ্ঞানীগণ প্রায় প্রতিদিনই টেলিস্কোপ দিয়ে মহাবিশ্বের প্রান্ত সীমানার দিকে অর্থাৎ প্রায় ১৩,০০০ মিলিয়ন লাইট ইয়ার (আলোকবর্ষের) দূরত্বের পরে একাধিক 'গ্যালাক্সী' ও 'কোয়াসার' কে ক্রমান্বয়ে গতিবৃদ্ধির সাথে সাথে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রাকৃতি ধারণ করে মহাশূন্যে মিলিয়ে যেতে প্রত্যক্ষ করছেন। এই অবস্থায় ঐ সকল 'বিন্দুবত' মহাজাগতিক বস্তুসমূহ থেকে আগত আলোর রেখাও আর দেখা যায় না। 'গ্যালাক্সী' বা 'কোয়াসার' আকৃতি হারাবার সাথে-সাথে এদের আলোর উৎসও সম্পূর্ণরূপে মুছে যায় বলে বিজ্ঞানীদের বর্তমান ধারণা। গ্যালাক্সীদের অস্তিত্বই যদি না থাকে, তাহলে সে কোত্থেকে আলো নির্গত করবে? যুক্তির দিক থেকে এটা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য তথ্য।

সুতরাং 'কিয়ামাতের সম্ভাব্য সময়' অধ্যায়ের সমাপ্তি আলোচনায় 'কুরআন' এবং 'বিজ্ঞানের' জ্ঞানগর্ভ ও তথ্যবহুল অংশগ্রহণে আমাদের সামনে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, কুরআনে 'কিয়ামাত' সম্পর্কীয় আলামতের ধারাবাহিক যে বর্ণনা পেশ করা হয়েছে তা বর্তমান বিজ্ঞান কর্তৃক মহাবিশ্বে ধ্বংস বিষয়ক আবিষ্কৃত পদ্ধতিসমূহের সাথে এক ও অভিন্ন এবং আমরা আরো লক্ষ্য করেছি যে, কুরআনের বর্ণনানুযায়ী নক্ষত্র, সূর্য ও চন্দ্রসহ আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবী ধ্বংস হতে হলে আবিষ্কৃত ৮টি পদ্ধতির মধ্যে সর্বশেষ পদ্ধতি অর্থাৎ, 'গ্যালাক্সীদের শূন্যের কোঠায় গমন'-এর মাধ্যমেই কেবল 'কিয়ামাত' সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। অন্য ৭টি পদ্ধতি মহাবিশ্বে গ্যালাক্সীদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়, কিন্তু ৮ম পদ্ধতিটি মহাবিশ্বে গ্যালাক্সীদের জন্য বাধ্যতামূলক এবং নির্দিষ্ট করা। এর কোন ব্যতিক্রম ঘটার মোটেই সম্ভাবনা নেই। অপর দিকে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্যে দেখা যায় আমাদের গ্যালাক্সীটি উড়ন্ত অবস্থায় এর চলার পথে প্রতি মুহূর্তে গতির বৃদ্ধি ঘটিয়ে আরও প্রায় ৬০০০ মিলিয়ন আলোক বর্ষ পথ অতিক্রম করার পর প্রায় লক্ষাধিক মাইল/সেকেন্ড গতিপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে প্রচন্ড বাধায় গ্যালাক্সীর মূল আকৃতির প্রায় ১৫ ভাগ বাধ্যতামূলক সঙ্কোচন ঘটানোর ফলে যে 'মহাপ্রলয়' এর অভ্যন্তরে শুরু হয়ে যাবে, তাতে আমাদের সৌরজগতও ঐ সময়-ই অবস্থানগত কারণে বর্ণিত ঐ ধ্বংসে পতিত হয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে। আর যদি তাই হয় তাহলে

মহাজাগতিক হিসেবের স্কেলে যেখানে বিলিয়ন-বিলিয়ন বছরের হিসেব ছাড়া মহাবিশ্বকে বুঝানো যায় না সেখানে মাত্র ৬০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ মোটেই লম্বা দূরত্ব নয় বরং একেবারেই 'সন্নিকটবর্তী'।

অতএব, কুরআনের 'কিয়ামাত' বা মহাপ্রলয় সম্পর্কীয় ভবিষ্যতবাণীতে যে 'নিকটবর্তী' ও 'অতিশীঘ্র' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তা বর্তমান বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণেও যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাই 'আল্-কুরআন' যে 'সত্য-সঠিক ও বিজ্ঞানময়' সেকথাও নিজ থেকেই প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়।

আলোচিত বিষয়টি এবার আমরা 'এক নজরে' দেখে নিই।

এক নজরে ঃ

আল্-কুরআন	বর্তমান বিজ্ঞান
(১) "মানুষ তোমাকে কিয়ামাত সম্পর্কে প্রশ্ন করে, বল, ইহার জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র-ই আছে। তুমি ইহা কি করিয়া জানিবে ?" (৩৩ ঃ ৬৩)	(১) বিজ্ঞান আমাদের মহাবিশ্বে দৃশ্য-অদৃশ্য অসংখ্য মহাজাগতিক বস্তু ইতোমধ্যে প্রযুক্তির মাধ্যমে আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছে।
"তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে 'কিয়ামাত' কখন ঘটিবে ? বল, এই বিষয়ে জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেরই আছে। শুধু তিনিই উহা যথাসময়ে প্রকাশ করিবেন। উহা আকস্মিক ভাবেই তোমাদিগের উপর আসিবে। তুমি এই বিষয়ে সর্বশেষ অবহিত মনে করিয়া তাহারা তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, এই বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌রই আছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তাহা জানে না। (৭ ঃ ১৮৭)	আবিষ্কৃত তথ্য সমূহের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত বিষয়সমূহ হচ্ছে– সুপার নোভা বিষ্ফোরন, ব্ল্যাক হোল, নিউট্রন ষ্টার, হোয়াইট ডর্‌ফ ধূমকেতু পতন, গ্রহানু (asteroid) পতন, একাধিক নক্ষত্রের মধ্যে সংঘর্ষ, একাধিক গ্যালক্সির মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ (Collision), প্রতিটি গ্যালাক্সী মহাশূন্যের মাঝে উড়তে গিয়ে প্রচন্ড গতির কারনে আকৃতিগতভাবে মহাসঙ্কোচনে পড়ে গিয়ে শূন্যের কোঠায় গমন ইত্যাদি।

"কিয়ামাতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌তেই ন্যাস্ত।" (৪১ ঃ ৪৭) "বল, ইহার জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র নিকট আছে এবং আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। (৬৭ ঃ ২৬) "বল, তোমাদিগের জন্য আছে এক নির্ধারিত দিবস, যাহা তোমরা মুহূর্তকাল বিলপ্ত করিতে পারিবেনা। (৩৪ ঃ ৩০)	উল্লেখিত ধ্বংস বা বিপর্যয়মূলক বিষয়গুলোর মধ্যে কখন কোন বিষয়টি কোন বস্তুর উপর ঘট্‌বে তা সঠিকভাবে একটা দীর্ঘ সময় পূর্বেই কিন্তু বলা বড়ই কঠিন ব্যাপার। মহাজাগতিক কঠিন নিয়ম শৃংখলার অনেক বড় বড় ব্যাপারই এখনো বিজ্ঞানের করায়ত্ত হয়নি। তাই উক্ত বিষয়ে বিজ্ঞান যা বলে তা 'সম্ভাবনাময়' বলেই দাবী করে থাকে। ফলে বিষয়টি ঘট্‌তে পারে অথবা না-ও ঘট্‌তে পারে। এমনি এক পর্যায়ে দোদুল্যমান থাকে। বস্তুতঃ মহাবিশ্বের মহাসাগর তুল্য জ্ঞানসাগরের বিপরীতে পৃথিবীর মানব মন্ডলীর বর্তমান সময় পর্যন্ত আহ্‌রিত জ্ঞানের সমষ্টির তুলনা ক্ষুদ্র 'বালি-কনার' পর্যায়ে এখনো আবর্তিত।
(২) "কিয়ামাতের লক্ষণসমূহ তো আসিয়াই পড়িয়াছে।" (৪৭ ঃ ১) "ইহারাতো অপেক্ষায় আছে এক মহানাদের যাহা ইহাদিগকে আঘাত করিবে ইহাদিগের বাক-বিতন্ডাকালে।" (৩৬ ঃ ৪৯) "কিয়ামাত আসন্ন, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কেহ্-ই ইহা ব্যক্ত করিতে	(২) বর্তমান বিজ্ঞানী মহলের পর্যবেক্ষণে দেখা যায় আমাদের সৌরজগতের ভিতরে এবং বাইরে ট্রিলিয়ন-ট্রিলিয়ন ভাসমান বড় বড় 'পাথর খন্ড' ও "ধূমকেতু' মহাশূন্যে পরিভ্রমনে রত আছে। এমনি ধরনের প্রায় ৫০০০ পাথর খন্ড পৃথিবীর নিকটবর্তী মহাশূন্যে এলোপাথাড়ী ঘুরে বেড়াচ্ছে। যাদের এখনো নামকরণ করে সনাক্ত করা হয়নি। সব মিলিয়ে লক্ষ-লক্ষ ভাসমান পাথর থেকে এক বা একাধিক

সমর্থ নহে। তোমরা কি এই কথায় বিস্ময় বোধ করিতেছ ! এবং হাসি-ঠাট্টা করিতেছ ! ক্রন্দন করিতেছ না? (৫৩ ঃ ৫৭-৬০) "কিয়ামাত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে।" (৫৪ ঃ ১) "তাহারা ঐ দিনকে মনে করে সুদূর কিন্তু আমি দেখিতেছি ইহা আসন্ন।" (৭০ ঃ ৬)	পাথরখন্ড যে কোন দিন সকাল-বিকাল অথবা রাতে পৃথিবীর মধ্যাকর্ষনে বন্দী হয়ে ছুটে এসে ভূ-পৃষ্ঠে আছড়ে পড়ে বর্তমান সভ্যতাকে প্রচন্ড প্রলয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করে চিরদিনের জন্য ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে। 'গ্রহানু' বা "ধূমকেতুর' আঘাতে পৃথিবী ধ্বংসের বিষয়টি বর্তমান সময়ে এতই স্বল্প সময়ের (Short time notice) নোটিশ হয়ে দাড়িয়েছে যে, যার কারনে আমেরিকান, ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের বিজ্ঞানী মহল রাষ্ট্রীয় খরচে বিভিন্ন নামে প্রজেক্ট (project) চালু করে অনবরত ২৪ ঘন্টা বায়-রোটেশানে পর্যবেক্ষণ ও প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা প্রনয়নের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে উক্ত বিষয়টি ভূ-পৃষ্ঠের মানব মন্ডলীর জন্য খুবই বেদনা দায়ক ও দুঃসংবাদবহ, যা একরাশ হতাশাই শুধু ছড়িয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে পৃথিবীর 'বিপর্যয়ের' বিষয়টিও যেন প্রতিদিনই খুবই নিকট থেকে নিকটতর হচ্ছে।
(৩) "আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্‌রই এবং	(৩) বিজ্ঞানের বর্তমান অগ্রগতি পূর্বের সকল প্রকার রেকর্ডকে

কিয়ামাতের ব্যাপারতো চক্ষুর পলকের ন্যায়, বরং তার চাইতেও দ্রুততর। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (১৬ ঃ ৭৭) "এমনকি অকস্মাৎ তাহাদিগের নিকট যখন 'কিয়ামাত' উপস্থিত হইয়া যাইবে তখন তাহারা বলিবে হায় ! ইহাকে যে আমরা অবহেলা করিয়াছি তার জন্য আক্ষেপ।" (৬ ঃ ৩১) "তবে কি তাহারা আল্লাহ্র সর্বগ্রাসী শাস্তি হইতে অথবা তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে কিয়ামাতের আকস্মিক উপস্থিতি হইতে নিরাপদ? (১২ ঃ ১০৭) "বল, তোমরা যে বিষয়ে ত্বরান্বিত করিতে চাহিতেছ সম্ভবত তাহারা কিছু তোমাদিগের নিকটবর্তী হইয়াছে।" (২৭ ঃ ৭২)	ছাড়িয়ে গেলেও বাস্তবভাবে মহাবিশ্বের মাঝে অদৃশ্য বা লুকায়িত বিষয় ও বস্তু সমুহের এখনো সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটন সম্ভব করে তুলতে পারেনি। যতটুকুন সম্ভব করে তুলেছে তা বিশাল সীমা-পরিসীমাহীন মহাবিশ্বের ভগ্নাংশ-ই বলা চলে, যা এখনো মহাবিশ্বের ব্যাপক বিস্তৃতির তুলনায় অনুল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞানীগণের পর্যবেক্ষণে প্রমানীত হয়েছে মহাকাশের মহাশূন্যতায় গ্রহানু বা ধূমকেতু সমূহ স্বাভাবিকভাবে ভাসমান অবস্থায় পরিভ্রমন করতে গিয়ে কোন গ্রহ বা উপগ্রহের মধ্যাকর্ষনের আওতায় ঢুকে পড়লে তখন প্রচন্ড গতিশক্তিতে (প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩০ কিঃ মিটার থেকে ১০০ কিঃ মিটার বেগে) সংশ্লিষ্ট গ্রহ কিংবা উপগ্রহের পৃষ্ঠে আছড়ে পড়ে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সাধন করবে। যদি বিষয়টি স্বাভাবিক না হয়ে সম্পূর্ণ 'গ্যালাক্সী শূন্যের কোঠায় গমনের' কারনে হয়ে থাকে তাহলে গ্যালাক্সীর প্রচন্ড সঙ্কোচনের চাপে গ্রহানু ও ধূমকেতু এবং বিভিন্ন প্রকার মহাজাগতিক বস্তু কল্পনাতীত তীব্র গতিতে (ঘন্টায় প্রায় লক্ষাধিক মাইলের চেয়েও বেশি) লাভ করে সর্বত্র আঘাত হানবে। আর তাতে

	চোখের পলকের পূর্বেই সব ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে একাকার হয়ে যাবে। মানুষের কল্পনাকেও হার মানিয়ে সর্বত্র অকস্মাৎ ঘট্‌তে থাকবে চরম বিপর্যয়। আমাদের গ্যালাক্সী থেকে প্রায় ১৪০০০ মিলিয়ন আলোক বর্ষ দূরত্বে 'Big Bang' নামক মহাবিষ্ফোরনের মাধ্যমে মহাবিশ্বটি জন্ম গ্রহণ করেছে অর্থাৎ আমাদের গ্যালাক্সী এ পর্যন্ত ১৪০০০ মিলিয়ন আলোক বর্ষ পথ অতিক্রম করে এসেছে। বিজ্ঞানীদের হিসেবমতে আরো ২৭০০ মিলিয়ন আলোক বর্ষ পথ প্রায় পাড়ি দিতে পারলেই আমাদের গ্যালাক্সীর প্রায় ৭ ভাগ ধ্বংসের মধ্যে পড়ে যাবে (প্রচন্ড গতির কারণে আকৃতি সঙ্কুচিত হওয়ায়) এবং প্রায় ৫৫০০ মিলিয়ন আলোক বর্ষ পথ অতিক্রম করার সাথে সাথে ১৫ থেকে ২০ ভাগ গ্যালাক্সী সঙ্কোচনের কারনে আমাদের সৌর জগতও তখন অবস্থানগত কারণে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে। তাই যেখানে ইতোমধ্যেই গ্যালাক্সী প্রায় ১৪০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে, সেখানে মাত্র ৫৫০০ মিলিয়ন (গড়ে ৬০০০ মিলিয়ন) আলোকবর্ষ পথ কোন ব্যাপরই না

	বরং তুলনামূলক ভাবে সংক্ষিপ্ত বা নিকটবর্তীই বলা চলে। সবমিলিয়ে পৃথিবীর ধ্বংস যে নিকটবর্তী ও দ্রুততর হবে, তা খুবই স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

সুতরাং 'কিয়ামাতের' সম্ভাব সময় সম্পর্কে 'কুরআন' ও 'বিজ্ঞানের' দৃষ্টিভঙ্গি এক ও অভিন্ন, অর্থাৎ মহাবিশ্বে আমাদের গ্যালাক্সী এবং গ্যালাক্সীর অভ্যন্তরে আমাদের সৌর জগতের অবস্থান এবং গ্যালাক্সীর ঘূর্ণায়মান উড়ন্ত গতির বৃদ্ধি প্রমাণ করছে সুন্দর সতেজ-সবুজ এই পৃথিবী নামক গ্রহটির ধ্বংস খুবই নিকটে এগিয়ে আসছে, যে মৃত্যুপথ থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন বিকল্প পথ নেই।

অতএব 'কিয়ামাত' অস্বীকার করার কোন প্রশ্নই আসে না। বরং প্রশ্ন হতে পারে নির্ঘাত আগত মহাপ্রলয় থেকে কিভাবে মানবজাতি রক্ষা পেতে পারে?

"এই গুলিই প্রমাণ যে, আল্লাহ্ সত্য।" *(৩১ ঃ ৩৪)*

'হাশরের মাঠ তৈরী, পূনর্জীবন ও বিচার'

আল্-কুরআনঃ

'ক' গ্রুপঃ

"তোমরাতো প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে অবহিত হইয়াছ, তবে কেন তোমরা অনুধাবন কর না ?" (৫৬ ঃ ২২)

"যিনি আদিতে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি উহার পূনরাবৃত্তি করিবেন।" (২৭ ঃ ৬৪)

"উহারা কি লক্ষ্য করে না, কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতঃপর পূনরাবৃত্তি ঘটান ? ইহাতো আল্লাহ্র জন্য সহজ।" (২৯ ঃ ১৯)

"ইহারা কি লক্ষ্য করে না যে, 'আল্লাহ্', যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি উহাদিগের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সক্ষম। তিনি উহাদিগের জন্য স্থির করিয়াছেন একটি কাল, ইহাতে সন্দেহ নাই।" (১৭ ঃ ৯৯)

'খ' গ্রুপঃ

"আল্লাহ্র আদেশ আসিবেই, সুতরাং উহা ত্বরান্বিত করিতে চাহিও না।" (১৬ ঃ ১)

"সেই দিন আমি আকাশমন্ডলীকে গুটাইয়া ফেলিব যেভাবে লিখিত দফতর গুটানো হয়।" (২১ ঃ ১০৪)

'গ' গ্রুপঃ

"যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করিয়াছিলাম, সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করিব, প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি ইহা পালন করিবই।" (২১ ঃ ১০৪)

" যে দিন জমিনকে পরিবর্তন করিয়া ভিন্নরূপ জমিনে পরিণত করা হইবে এবং তদ্রুপ করা হইবে ঐ আকাশমন্ডলীকেও।" (১৪ ঃ ৪৮)

"নিশ্চয় আমি পৃথিবীর সমুদয় বস্তুকে একটি পরিষ্কার ময়দানে পরিণত করিব।" (১৮ ঃ ৮)

'ঘ' গ্রুপঃ

"ইহাতো কেবল একটিমাত্র বিষ্ফোরণের শব্দ।" (৭৯ঃ১৩)

"অতঃপর আবার সিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তৎক্ষণাত উহারা দন্ডায়মান হইয়া তাকাইতে থাকিবে।" (৩৯ঃ৬৮)

"তখনই ময়দানে উহাদের আবির্ভাব হইবে।" (৭৯ঃ১৪)

"তোমার প্রতিপালক উপস্থিত হইবেন এবং সারিবদ্ধভাবে ফিরিশ্‌তাগণও।" (১৪ঃ৪৮)

"আমলনামা পেশ করা হইবে এবং নবীগণকে ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হইবে, আর সকলের মধ্যে ন্যায়-বিচার করা হইবে এবং তাহাদিগের প্রতি জুলুম করা হইবে না।" (৩৯ঃ৬৯)

'ঙ' গ্রুপঃ

"ইহার চরম জ্ঞান আছে তোমার প্রতিপালকের নিকট-ই।" (৭৯ঃ৪৭)

"তোমরা কি এই কথায় বিস্ময়বোধ করিতেছ, এবং হাসি-ঠাট্টা করিতেছ ? ক্রন্দন করিতেছ না ?" (৫৩ঃ৫৭)

আমরা এমন এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে এগিয়ে যাচ্ছি যেখানে এতদিন শুধু ধর্মীয় চিন্তার লোকগুলোই মাঝে মধ্যে প্রবেশ করতো শুধুমাত্র তাদের ঈমানেরই (বিশ্বাসের) কারণে। আজকে আমাদের সকলেরই সৌভাগ্য বলতে হবে এ জন্য যে, বক্ষমান অধ্যায়ের প্রতি বিজ্ঞান যেখানে পূর্বে নাক সিট্‌কাতো এবং উল্লেখিত বিষয়কে 'ধর্মান্ধতার বকাবকি' আখ্যা দিয়ে এ বিষয় থেকে যথাসম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে চলার চেষ্টা করতো, সেখানে আজকে কেন জানি অজ্ঞাত কোন এক কারণে বর্তমান প্রযুক্তিগত চরম উৎকর্ষীত বিজ্ঞান ধর্মের হাত ধরে প্রায় অর্ধেক পথ (পরকালমুখী) পাড়ি দিয়ে এগিয়ে এসেছে এবং ধর্মের সাথে পাড়ি দেয়া উক্ত পথের এত সুন্দর ও নিঁখুত এবং বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করেছে যে, কোন বিশ্বাসী মানুষ শুন্‌লে পর্যন্ত আঁতকে উঠবে। বর্তমান বিজ্ঞান সত্যিই কি এরূপ কথা বলতে পারে ? তাহলেতো নিঃসন্দেহে আজকের এ বিজ্ঞান আগামীদিনে আত্মভোলা

বিজ্ঞান প্রিয় অবিশ্বাসী সমাজকে বিশ্বাসী দলে পরিণত করতে সবচেয়ে বড় অবদান রাখতে যে সমর্থ হবে, এতে কোনই সন্দেহ্ নেই। আগামী দিনগুলোতে আশা করছি হয়তোবা সেই শুভ প্রভাতের উদয় ঘটবে এবং পথ হারা, দিক হারা মানবসমাজ অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছার রাজপথ (সত্যপথ) খুঁজে পাবে।

ওপরে উপস্থাপিত বিষয়কে সহজ পন্থায় দ্রুত উপলব্ধির সীমায় পৌঁছাবার জন্য উক্ত অধ্যায়ের ঐশীবাণীগুলোকেও গ্রুপ ভিত্তিক সাজিয়ে নিয়েছি। 'ক' গ্রুপের বাণীসমূহের মূলবক্তব্য হলো মহাবিশ্বের প্রতিপালক 'আল্লাহ্' প্রায় শূন্যবস্থা থেকে যেখানে এ মহাবিশ্বের প্রথম সৃষ্টির সূচনা করে এর পূর্ণাঙ্গ অস্তিত্ব রূপ গড়তে সক্ষম হয়েছেন, তখন এর পরিপূর্ণ ধ্বংস সাধনের পর আবারও নতুন করে অনুরূপভাবে সৃষ্টি করা অন্ততঃ তাঁর পক্ষে কোন ব্যাপারই না। তাঁর জন্য বরং খুবই সহজ কাজ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বদৌলতে মানুষ ইতোমধ্যেই প্রথম সৃষ্টির ব্যাপারেতো যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। তাদের জানা দরকার ঐ পদ্ধতিতেই আল্লাহ্ সৃষ্টির পূনরাবৃত্তি ঘটাবেন। তাঁর পক্ষ থেকে একটা নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে গোপন করে রাখা হয়েছে, ঐ নির্দিষ্ট সময়টি আগমন করা মাত্রই বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে সৃষ্টির পূনরাবৃত্তি ঘটানো হবে।

'খ' গ্রুপে বলা হয়েছে যে, মহাবিশ্বে সৃজিত সকল কিছুই সময়ের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে ধ্বংসের অধীন, আর সে কারণেই নির্দিষ্ট সময়টি উপস্থিত হওয়া মাত্র তিনি আকাশমন্ডলী (গ্যালাক্সীসমূহ) অফিস-আদালতে গুটানো বড় বড় দফতরের মত গুটিয়ে ফেলবেন। অর্থাৎ, সরকারী দফতর গুলোতে কর্মদিবসের শেষে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে বড় বড় লিখিত দফতর গুলো খুবই সতর্কতার সাথে বন্ধ করে যেমনিভাবে গুটিয়ে ছোট করে নেয়া হয়, ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ্ তায়ালা মহাকাশের বড় বড় সংগঠন 'Star city'বা গ্যালাক্সীসমূহ গুটিয়ে ছোট্ট করে জমিয়ে ফেলবেন। এই অবিশ্বাস্য বিস্ময়কর কাজটি তিনি পূর্বে যেমন দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করেছেন, ভবিষ্যতেও এর কোন সুক্ষ্মপরিমাণও ব্যতিক্রম হবে না।

'গ' গ্রুপের আয়াতগুলোতে তিনি জানিয়ে দিলেন নতুন সৃষ্টির কাঠামো এবং ক্রমধারা। এ পর্যায়টি মহাবিশ্বের সমগ্র বস্তুসমূহকে মহাসুক্ষ্ম বিন্দুতে গুটানোর পর থেকে শুরু হওয়া। এখানে আল্লাহ্ তায়ালা স্পষ্ট করে ঘোষণা করেন যে, তিনি প্রথম সৃষ্টির অনুকরনেই এ দ্বিতীয়বারের সৃষ্টিকার্যও আরম্ভ

করবেন। সৃষ্টিকর্তা হিসেবে তিনি এ প্রতিশ্রুতি পেশ করেছেন বিধায় তাঁর পক্ষ থেকে অবশ্য-অবশ্যই তা সম্পন্ন করা হবে। এতে কোনপ্রকার সন্দেহ্ যেন কেউ না করে। যদিও দ্বিতীয়বারের এ সৃষ্টি পদ্ধতি প্রথম সৃষ্টির হুবহু অনুকরণেই ঘটবে, কিন্তু সৃষ্টির গঠন বা কাঠামো হবে ভিন্নতর। এতে নতুনভাবে সৃষ্ট আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবী নামক গ্রহকে ভিন্ন গড়নে গড়ে তোলা হবে। বর্তমানের আকার-আকৃতি তিরোহিত হয়ে এক নতুন রূপ নিয়ে উভয়ই আবির্ভূত হবে। পৃথিবী নামক এ জগতটির অবস্থাটা অনেকটা এ রকম হবে যে এর পৃষ্ঠদেশের বর্তমান উঁচু-নীচু, ভাংগা-চোরা, নদ-নদী, খাল-বিল, সাগর-মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা কিছুই থাকবে না, পুরো পৃষ্ঠদেশই শুধু সমতল আর সমতল একক ময়দানে পরিণত হবে। সৃষ্ট এ নতুনজগত পরজগতের প্রথম ধাপ, যেখানে মহাবিশ্বের প্রতিপালক তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'মানুষের' পার্থিব জীবনের পুংখানুপুংখ হিসাব গ্রহণ করবেন।

এরপর 'ঘ' গ্রুপের আয়াতের বক্তব্য হলো, ওপরে উল্লেখিত নতুন সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি শুরু হবে একটি প্রচন্ড বিষ্ফোরণের শব্দের মাধ্যমে যেমনিভাবে 'কিয়ামাতের' সূচনা হয়ে থাকবে কল্পনাতীত বিকট ভয়ংকর শব্দ নিনাদে। এ জগত সৃষ্টি হওয়ার পর-পরই মানবসম্প্রদায়ও পূনর্বার সৃষ্টি হয়ে মাটির ওপর দাড়িয়ে গিয়ে চতুর্দিকে তাকাতে থাকবে এবং অনুভূতি হরণকারী ঐ বজ্রকঠিন শব্দের উৎসের দিকে দৌড়াতে থাকবে, যেভাবে সেনানিবাসে বিউগলের শব্দ শুনামাত্র সৈনিকেরা চতুর্দিক থেকে পঙ্গপালের মত ছুটে এসে খোলামাঠে বিউগলের চতুর্দিকে জড়ো হয়ে থাকে। এভাবে এক এক করে পৃথিবীর প্রথম মানুষটি থেকে শুরু করে কিয়ামাতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সর্বশেষ আগত মানুষটিও সৃষ্টি হয়ে বিচারের মাঠে হাজির হয়ে যাবে। তারপর মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, মালিক, প্রভু, মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন তাঁর সম্মানিত ফিরিশ্তাকুলসহ বিচারের মাঠে আগমন করবেন। মানুষ সেদিন তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে তাদের প্রভুর শক্তি-ক্ষমতা প্রভাব-প্রতিপত্তি, গৌরব-মহিমা ও জ্ঞান-গরিমার কিছুটা উপলব্ধি করতে পারবে, অথচ পৃথিবীতে থাকাবস্থায় তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে তারা কতই না চেতনাহীন অবস্থায় ছিল।

বিচারের পূর্বেই প্রত্যেক জাতির জন্য প্রেরিত নবী-রাসূলগণকে এবং প্রত্যক্ষ সাক্ষীগণকেও একপাশে উপস্থিত করা হবে। সকল মানুষের আমল-নামা এবং প্রমাণস্বরূপ দলিলপত্রও (Documents) হাজির করা হবে।

আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিন দলিল-প্রমাণসাপেক্ষে তাঁর বান্দাহ্দের পার্থিব জীবনের হিসেব গ্রহণ করে সকলের মধ্যে ন্যায়-বিচার সম্পন্ন করবেন। কারও ওপরই সামান্য চুল পরিমাণও জুলুম করা হবে না। উক্ত চূড়ান্ত বিচারের দিন যারা সাফল্য লাভ করবে তাদেরকে বিচারের (হাশরের) মাঠ থেকে আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশে ফিরিশ্তারা স্ব-সম্মানে পুলসিরাতের ওপর দিয়ে আলোর ঝলকের চেয়েও দ্রুতগতিতে জান্নাতে নিয়ে পৌঁছে দেবেন। আর যারা ব্যর্থ হবে, বিফল হবে, আল্লাহ্র নির্দেশে আযাবের ফিরিশতারা পুলিশের আসামী ধরার চেয়েও আরও অবমাননাকর অবস্থায় তাদেরকে ঘেরাও করে ধাক্কা মেরে মেরে পুল্সিরাতের ওপর দিয়ে জাহান্নামে নিয়ে ফেলে দেবে। যেখান থেকে বেরুবার কোন পথই থাকবে না। ফলে অনন্তকাল পর্যন্ত শুধু প্রচন্ড আগুনের ভেতর জ্বলতেই থাকবে।

সবশেষে 'ঙ' গ্রুপের আয়াতসমূহে এসে 'আল্লাহ্ তায়ালা' মানবমন্ডলীকে জানিয়ে দিলেন যে, এই যে আগাম ভবিষ্যৎ ঘটনা প্রবাহের বর্ণনা তাদের সামনে 'ওহীর' মাধ্যমে তুলে ধরা হলো, সেই অতিশয় কঠিন ও ভয়ংকর মুহূর্তের নির্দিষ্ট করা 'চরম সময়টি' সম্পর্কে কিন্তু তাঁদের প্রতিপালক ছাড়া আর কেউ জানে না, জানতে পারে না। এখন যদিও তারা এই মহাবিপদের নির্দিষ্ট করা সময়টি সম্পর্কে অনবহিত, কিন্তু সেই ঘটনার সত্যতা প্রমানের নিমিত্তে কিছু কিছু নিদর্শনমূলক ঘটনা ইতোমধ্যেই প্রকাশ করা হয়েছে। যে নিদর্শনসমূহ দর্শন করে যদি তারা বিবেক-বুদ্ধির মুক্তাঙ্গনে দাঁড়িয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে যাচাই করে তাহলে 'কুরআনে' বর্ণিত কিয়ামাত, পূনর্জীবন ও বিচার-এর সত্যতা নিজ জ্ঞানেই প্রমাণ পেতে সক্ষম হবে। আর এই যদি হয় ভবিষ্যত অবস্থার প্রকৃত চেহারা-চরিত্র, তাহলে কেন তারা কোন্ যুক্তিতে আগাম এই সংবাদে বিস্ময় প্রকাশ করছে? কেন বিষয়টিকে হালকা ভেবে উড়িয়ে দেয়ার নিমিত্তে হাসি-ঠাট্টার পরিবেশ সৃষ্টি করে আনন্দ উল্লাসের সাথে মজা লুটছে? মানুষ কি বিবেকশূন্য? না-কি জ্ঞানপাপী ? তা না হলে ভয়াবহ বিপদ-সংকুল ঘটনার আগাম সংবাদ লাভ করার পর এবং তারই অনুকুলে নিজেদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে অসংখ্য বাস্তব সত্যের নিদর্শন নিজ চক্ষু দিয়ে দর্শন লাভ করেও কি ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ক্রন্দন না করে পারা যায়? প্রকৃত সত্য কথাতো হচ্ছে, কেউ যখন এ আগাম বিরাট দূর্ঘটনা ও বিপদের বিষয় নিজজ্ঞানের আঙ্গিকে প্রমাণ বহন করতে দেখবে, তখন তার আত্মা ঐ বিপদের হাত থেকে বাঁচার নিমিত্তে আকুল-ব্যাকুল করে উঠ্বে। পরিণামে সত্য-মিথ্যার দোদুল্যমান দোল্না থেকে সরে এসে হাসি-

তামাসা বর্জন করে প্রকৃত বিষয়ের প্রতি প্রশ্নাতীত বিশ্বাসে শুধু এগিয়ে যাবে এবং বিশ্বপ্রভুর সামনে সমস্ত গর্ব-অহংকারকে ধূলোয় মিটিয়ে দিয়ে নিজকে তাঁর সম্মুখে ক্ষুদ্রাকারে পেশ করে ঐ বিপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্য ক্রন্দনরত অবস্থায় ফরিয়াদ করতে থাকবে।

অধ্যায়ের শুরুতে উদ্ধৃত কুরআনের পবিত্র ঐশীবাণীসমূহের সংক্ষিপ্ত মর্মার্থ পেশ করার পর এবার আমরা উক্ত বিষয়কে বর্তমান বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কৃত রিপোর্টের আলোকেও পরখ করে দেখার চেষ্টা করবো।

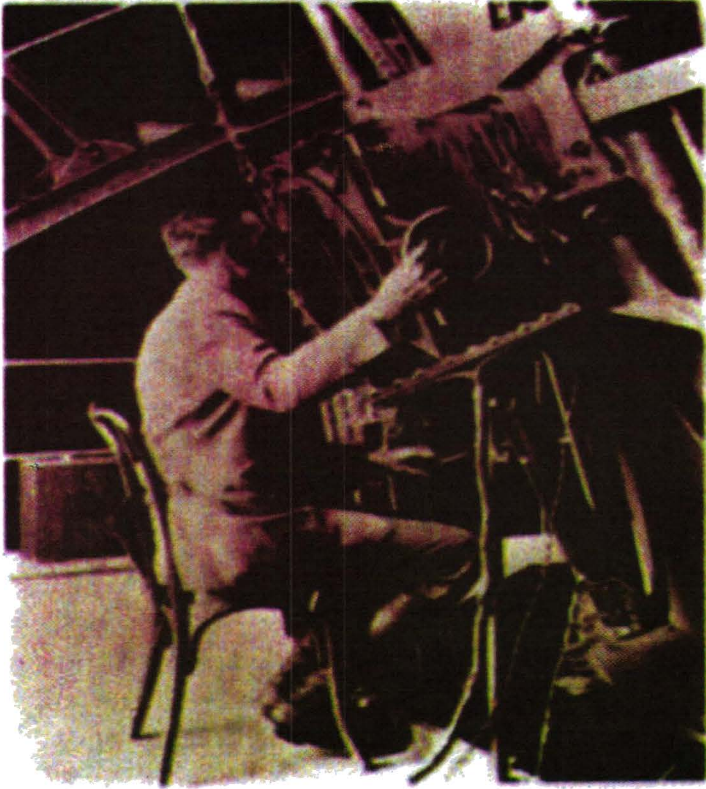
বিজ্ঞানঃ

আমাদের এ পৃথিবীর প্রাণচাঞ্চল্য ইতি টানার পর হাশরের মাঠ তৈরী এবং পূনর্জীবন সম্পর্কে 'কুরআনের' ওপরোল্লিখিত চিরন্তন, শ্বাশত ও কালজ্বয়ী বক্তব্য স্মরণে রেখে বিষয়টিকে বর্তমান বিজ্ঞানের আলোতে পরখ করতে এসে শুরুতেই সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে একটি বিষয় না আনলেই নয়, আর তা হচ্ছে পৃথিবীর পদার্থবিদ্যার বর্তমান পরিসর মহাবিশ্বের সার্বিক জ্ঞানের তুলনায় একেবারেই নগণ্য ব্যাপার বলতে হবে। এত নগন্য যে দূর্ধর্ষ 'Black hole'-র 'Event horizon' নামক এলাকার পরে এক কদমও সামনে অগ্রসর হতে পারে না, বর্তমান পৃথিবীর 'পদার্থ বিজ্ঞান' ভেংগে টুকরো-টুকরো হয়ে যায়, আর তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না, সে জন্যই 'Black hole'-এ প্রকৃত-ই যে কি ঘটে তা আমরা বর্তমান বিজ্ঞান দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে পারি না। ভবিষ্যতে যদি নতুন কোন পদার্থবিদ্যা আবিষ্কৃত হয়ে আগমন করে তাহলেই কেবল হয়তো আমরা 'Black hole-র' আভ্যন্তরীণ প্রকৃত বিষয়টি অবহিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবো। তাই যা বলতে চেয়েছি তা হলো বর্তমান বিজ্ঞান যতই নিত্য-নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে হৈ-হৈ, রৈ-রৈ করে এগিয়ে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু বস্তুজগতের প্রান্তসীমা অতিক্রম করে আধ্যাত্মিক বা পরজগতে পা রাখতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ, ঐ পর্যায়ে বিজ্ঞান সামনের দিকে আর কিছুই দেখতে পায় না। তাই সে পর্যায়ে গিয়ে পূর্বে অর্জিত জ্ঞানের আলোকেই কেবল পরবর্তী অবস্থার 'অনুমানসিদ্ধ' কিছু মন্তব্য করে থাকে। এই অবস্থায় আমাদের বক্ষমান অধ্যায়ের আলোচনায় বর্তমান বিজ্ঞান বস্তুজগতের সর্বশেষ প্রান্ত পর্যন্ত 'সত্য-সঠিক' তথ্য এবং 'বাস্তব ছবি' আমাদের হাতে তুলে দিলেই চলবে, বাকী আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো আমরা তুলনামূলক বিচারে প্রমাণ করে

এগিয়ে গেলে 'সত্যের' মাপকাঠিতে বিচার করতে তেমন বেগ পেতে হবে না। আমরা তা যাচাই করে মেনে নিতে পারবো।

বর্তমান বিজ্ঞানের প্রকৃত যৌবনকাল শুরু হয় বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকান আকাশ বিজ্ঞানী 'মিঃ ইডুইন হাবেল পাওয়েলের' মাধ্যমে। যখন তিনি পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রথমবারের মত টেলিস্কোপের সাহায্যে আকাশমালার গোপন পর্দা সরাতে সক্ষম হয়ে দূর মহাশূন্যের প্রকৃত রহস্য অবলোকন করেন, তখন শত-বিস্ময়কর মহাজাগতিক সৃষ্টি হওয়া বস্তুসম্ভার দর্শন করে তিনি হতবাক হয়ে যান। যে আকাশজগতকে হাজার হাজার বছর থেকে মানুষ মোটেই না জানার কারণে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে হাজারো কাল্পনিক ধ্যান-ধারণা এবং রঙে চিত্রিত করতো, সেই অন্ধকারময় গগনমন্ডলী হঠাৎ করেই বিংশশতাব্দীতে সকল প্রকার কল্পনার খেলাঘর গুড়িয়ে দিয়ে মানবমন্ডলীর দৃষ্টির সামনে শত-সহস্র বিচিত্রতার মহাবিস্ময়কর প্রদর্শনী (Exibition) মেলে ধরলো। সমগ্র বিশ্বব্যাপী মহাকাশ বিজ্ঞানে ব্যাপক সাড়া পড়ে গেল এবং এক নতুন উদ্যোমে আকাশ পর্যবেক্ষণ শুরু হলো আবিষ্কৃত নতুন নতুন টেলিস্কোপ দিয়ে। ফলে পরবর্তীতে স্বল্পসময়ের ব্যবধানে মহাকাশীয় ব্যাপক জ্ঞান-বিজ্ঞানে বর্তমান মানবসমাজের জ্ঞানের রাজ্য সম্প্রসারিত হল এবং এগিয়ে গেল একসাথে কয়েক ধাপ সামনের দিকে।

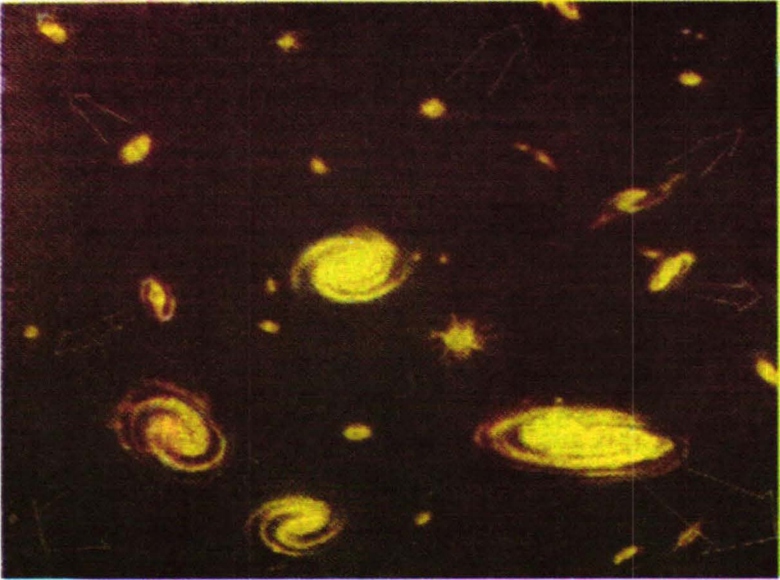
বিজ্ঞানী মিঃ ইডুইন হাবেল পাওয়েল ১৯২৩ সাল থেকে একনাগাড়ে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত মহাকাশে আবিষ্কৃত গ্যালাক্সীসমূহের ওপর অনবরত পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা চালিয়ে মহাকাশের সার্বিক অবস্থার একটা রূপ রেখা দাঁড় করাতে সক্ষম হলেন। এই সময় তিনি 'স্পেকট্রোস্কোপির' (Spectroscopy) সাহায্যে নির্দিষ্ট কয়েকটি গ্যালাক্সীর আগত আলোক রশ্মির 'Red ও Blue shift' নিয়ে গবেষণা করে দেখতে পেলেন যে প্রত্যেক গ্যালাক্সী পরস্পর পরস্পর থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। দূরবর্তী গ্যালাক্সীসমূহের প্রস্থান নিকটবর্তীদের তুলনায় অনেক অনেক গুণ বেশি এবং দ্রুততর। তিনি আরও লক্ষ্য করলেন–গ্যালাক্সীসমূহ এই দূরবর্তী অঞ্চলের দিকে সরে যাওয়ার ধরণ সকল দিকেই সামঞ্জাস্যের সাথে সুষমভাবে সংঘটিত হচ্ছে। গ্যালাক্সীসমূহ যতই দূরে সরে যাচ্ছে তাদের গতিও সেই অনুপাতে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। 'মিঃ ইডুইন হাবেল' গ্যালাক্সীদের এই দ্রুতি ও গতির উপর একটি তত্ত্ব পেশ করলেন। পরবর্তীতে যা 'Habble law' নামে খ্যাতি লাভ করে। উক্ত 'হাবেল ল'-তে গ্যালাক্সী সমূহ যতই দূরে যাচ্ছে, ততই তাদের গতিমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি নির্দিষ্ট



চিত্রঃ ১২৫

"আমরা আকাশে সৃষ্টি করিয়াছি সুরক্ষিত দূর্গ সদৃশ্য গ্যালাক্সীসমূহ (বুরুজ)। উহাদিগকে আমরা সজ্জিত করিয়াছি তাহাদিগের জন্য যাহারা প্রকৃত দর্শক।"
(১৫ ঃ ১৬)

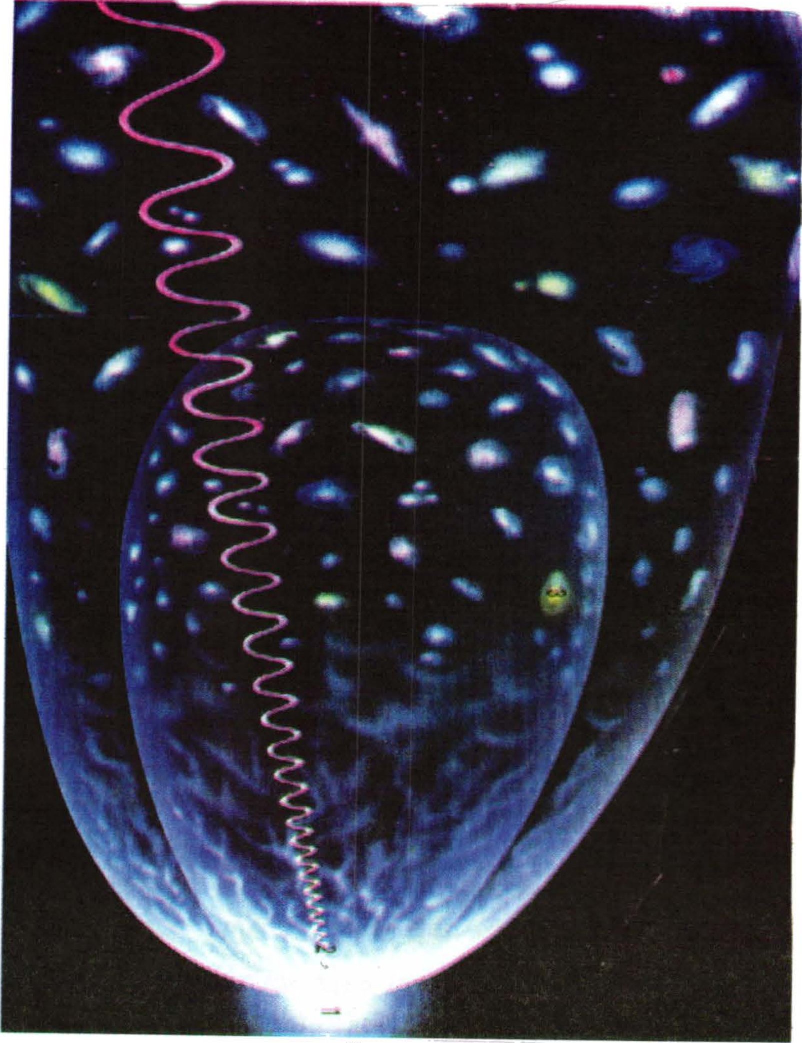
- ১৯২০ সালে আমেরিকান মাহাকশ বিজ্ঞানী 'ইডুইন হাবেল পাওয়েল' আবিস্কৃত উন্নত টেলিস্কোপ দিয়ে মহাকাশের দিকে তাকিয়ে পৃথিবীপৃষ্ঠে মানব সমাজের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম মহাবিশ্বের প্রকৃত চেহারা দর্শন লাভে ধন্য হন। মহাবিশ্বে 'বস্তুজগত' প্রথমবারের মত মানব সমাজের দৃষ্টিতে ধরা দেয়।



চিত্রঃ ১২৬

"শপথ নক্ষত্র সমষ্টির (গ্যালাক্সীসমূহের) যাহারা পশ্চাদগমনেরত এবং যাহারা ভাসিয়া বেড়ায় ও অদৃশ্য হইয়া যায়।" (৮১ ঃ ৫, ৬)

- আমেরিকান মহাকাশ বিজ্ঞানী 'ইডুইন হাবেল পাওয়েল' টেলিস্কোপের সাহায্যে দেখতে পেয়েছিলেন মহাশূন্য গ্যালাক্সী দিয়ে পরিপূর্ণ, পরবর্তীতে আবিস্কৃত স্পেকট্রোস্কোপির (Spectroscopy) সাহায্যে ঐ গ্যালাক্সীগুলো যে পরস্পর-পরস্পর থেকে ক্রমাগতভাবে গতিবৃদ্ধি ঘটিয়ে দূরে সরে যাচ্ছে, তা ওদের থেকে আগত আলোক রশ্মির রেড ও ব্লু শিফটের (Red and Blue Shift) মাধ্যমে প্রমান করেন।



চিত্রঃ ১২৭

"আমি আকাশমন্ডলী নির্মাণ করিয়াছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী।" (৫১ ঃ ৪৭)

- প্রচন্ড শক্তির ঘনায়নকৃত এক মহাসূক্ষ্ম বিন্দু হতে 'Bign Bang' নামক মহাবিষ্ফোরণের মাধ্যমে প্রায় ১০০ কোটি গ্যালাক্সী সৃষ্টি হয়ে আমাদের এই মহাবিশ্ব তার অস্তিত্ব ধারণ করে এবং বড় সংগঠন হিসেবে গ্যালাক্সীগুলো সৃষ্টির পর থেকেই মহাশূন্যে উড়ন্তবস্থায় ক্রমাগতভাবে গতির বৃদ্ধি ঘটিয়ে পরস্পর-পরস্পর থেকে কেবলই দূরে সরে যাচ্ছে।



চিত্রঃ ১২৮

"আকাশে আমি গ্যালাক্সীসমূহ সৃষ্টি করিয়াছি এবং উহাদিগকে করিয়াছি সুশোভিত দর্শকদিগের জন্য।" (১৫ ঃ ১৬)

- মহাবিশ্বের মহাশূন্যতায় উড়তে গিয়ে প্রতিটি গ্যালাক্সী তার গতিবৃদ্ধির সাথে সাথে একদিকে যেমন দূরবর্তী অঞ্চলের দিকে সরে যাচ্ছে, অপরদিকে তেমনি আদি আকৃতির সঙ্কোচন ঘটিয়ে ক্ষুদ্র হয়ে যাচ্ছে।



চিত্রঃ ১২৯

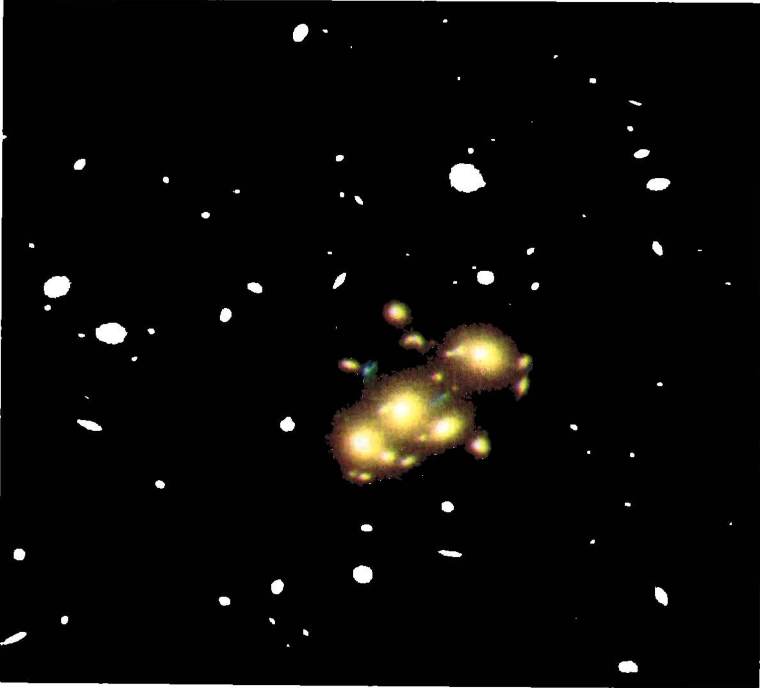
"তিনি তোমাদিগকে বহু নিদর্শন দেখাইয়া থাকেন, অতঃপর তোমার আল্লাহ্‌র কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করিবে?" (৪০ ঃ ৮১)

- গ্যালাক্সীসমূহ যতই দূরবর্তী অঞ্চলের দিকে সরে যাচ্ছে, ততই ওদের গতিবৃদ্ধির সাথে সাথে বিপরীত পক্ষে ওদের গঠনাকৃতি হারিয়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থা প্রাপ্তির পিছনে মূল কারণ হলো প্রচন্ড গতিমুখের অনুকূলে বাধাজনিত কারণে ব্যাপক চাপের মাধ্যমে গ্যালাক্সীর আকৃতিকে ভেংগে-চুরে ছোট হতে বাধ্য করা।

ব্যাপ্তির পর থেকে তা একটি নির্দিষ্ট হারে কেবলই বেড়ে চলে। বিজ্ঞান এই নতুন প্রাপ্তিকে 'হাবেল কনস্‌টেন্ট' (Hubble constant – Ho) নামে অভিহিত করেছে। মিঃ ইডুইন হাবেলের উক্ত সূত্র মতে নির্দিষ্ট দূরত্বের পর এর গতিমাত্রা দূরত্বের সমানুপাতিক ও সময়ের ব্যস্তানুপাতিক। অর্থাৎ, $V= \frac{D}{T}$ (D=দূরত্ব, T= সময় এবং V= গতিবেগ)। এ সমীকরণে 'মিঃ হাবেল' T কে ধ্রুবক (Constant) হিসাবে ব্যাখ্যা করেন, এখানে T-এর মান ১০,০০০,০০০,০০০ থেকে ২০,০০০,০০০,০০০ বৎসর। মিঃ ইডুইন হাবেল প্রমাণ করে দেখান যে প্রতি এক মেঘা পারসেক দূরত্বের (৩.২৬ মিলিয়ন আলোকবর্ষ) পর প্রতিসেকেন্ডে গ্যালাক্সীসমূহের গতিবেগ ৫০ মাইল (৭৫ কিঃ মিটার) হারে বৃদ্ধি পায়। এ হিসেবে ২৭০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের কোন গ্যালাক্সী প্রতি সেকেন্ডে ৪৫,০০০ মাইল গতিতে উড়ে যাচ্ছে। সুদূরবর্তী '3c-295 রেডিও গ্যালাক্সীটি' একই কারণে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৯০,০০০ মাইল অবিশ্বাস্য এক গতিবেগ নিয়ে কেবলই উড়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীগণ আজকে টেলিস্কোপের চূড়ান্ত অগ্রগতিকে কাজে লাগিয়ে ১৩,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের বস্তুটিকে সন্ধান করতে সমর্থ হয়েছেন। 'OQ-172' নামক 'কোয়াসারটি' পৃথিবী থেকে টেলিস্কোপ দিয়ে দর্শনযোগ্য দৃষ্টিসীমার সর্বশেষ দূরত্বে আবিষ্কৃত হয়েছে, স্পেকট্রোস্কোপীতে পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে কোয়াসারটি প্রতিসেকেন্ডে প্রায় ৯০% আলোর গতি লাভ করে উড়ে যাচ্ছে। আর হয়তো স্বল্প সময়ের ব্যবধানে কোয়াসারটি আলোর গতি লাভ করে মহাকাশের অসংখ্য বিবেকবান সৃষ্টির জ্ঞান রাজ্যকে নিত্য-নতুন হাজারো প্রশ্নের সম্মুখীন করে ক্রমান্বয়ে হারিয়ে যাবে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন পৃথিবী থেকে ১১,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষের দূরত্ব অতিক্রম করামাত্রই বস্তু প্রায় আলোর গতি লাভ করে।

বিজ্ঞান এতটুকুন তথ্য উদ্‌ঘাটন করেই তার পর্যবেক্ষণ শেষ করেনি; বরং আশ্চর্য করার মত আরও বিস্ময়কর তথ্য পেশ করে বহুদূর এগিয়ে গেছে। বর্তমান আশীর্বাদপুষ্ট বিজ্ঞান প্রমাণসাপেক্ষে জানাচ্ছে যে, যদি কোন বস্তু তার চলার পথে প্রায় আলোর গতির সমান গতি অর্জন করে, তখন বাস্তবভাবে কিন্তু বস্তুর ভর ও আকৃতিতে এক অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে থাকে। 'ফিট্ জিরাল্ড কন্ট্রাক্‌শান (Fitez Gerald contraction) এবং বিজ্ঞানী 'আইনষ্টাইনের ভরবেগ তুল্যতার সমীকরণ' '$E=mc^2$' হতে প্রমাণিত হয়েছে যে কোন বস্তুকে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৭ মাইল বেগে ধাবিত করতে পারলে এর আকৃতি গতিমুখের অনুকূলে এক বিলিয়ন ভাগের দুইভাগ

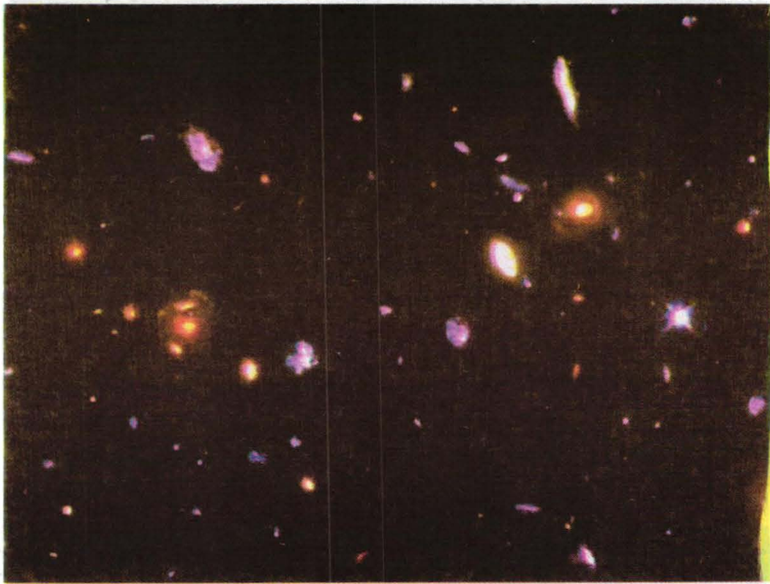
সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। উক্ত হিসেবে চলন্ত বস্তুর গতিবেগ বাড়িয়ে যদি প্রতি সেকেন্ডে ৯৩,০০০ মাইল/সেকেন্ড করা যায় তাহলে আদি আকৃতির প্রায় ৫০ ভাগ সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। তারপরও যদি গতি বাড়িয়ে ১৮৬,২৮২ মাইল/সেকেন্ড-এ উন্নীত করা যায় তাহলে আলোর ঝলকের ন্যায় গতিপ্রাপ্ত বস্তুটি চূড়ান্তরূপে সঙ্কুচিত হয়ে চলার অনুকুলে দাঁড়াবে প্রায় 'শূন্যের কোঠায়' (Singularity) অদৃশ্য মহাসুক্ষ্ম একটি বিন্দুতে। ওলন্দাজ পদার্থ বিজ্ঞানী 'হ্যান্ডরিক এ্যানটন লরেন্ট্জ' (Handrik Antoon Lorentz) প্রমাণ সাপেক্ষে দেখান যে ৯৩,০০০ মাইল/সেকেন্ড গতিতে বস্তুর আকৃতির হ্রাস ঘটলেও এর 'ভর' কিন্তু বিপরীতে বৃদ্ধি পায় প্রায় ১৫ ভাগ। ১৬৩,০০০ মাইল/সেকেন্ড গতিপ্রাপ্ত বস্তুর 'ভর' বৃদ্ধি পায় ১০০%। এরপর যদি বস্তুর গতি আরও বৃদ্ধি পেয়ে আলোর গতির সমান হয়ে পড়ে তাহলে বস্তুটির ভর বৃদ্ধি পেয়ে জ্ঞানের বোধগম্যের বাইরে অসীম স্কেলে (Infinite Scale) চলে যাবে, যদিও তখন মূল-আদি আকৃতি প্রায় শূন্যের কোঠায় এক মহাসুক্ষ্ম বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছবে, বাস্তবে যার কোন অস্তিত্ব নেই, শুধু তাত্ত্বিকভাবেই ধরা হয়ে থাকে। উক্ত 'তথ্য' আবিষ্কৃত হওয়ার পর সমগ্র বিজ্ঞানবিশ্ব হতচকিত হয়ে যায়। কারণ সমগ্র মহাবিশ্বের সৃষ্টি শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্তেও তাবৎ বস্তুভর এ জাতীয় অদৃশ্য এক মহাসুক্ষ্ম বিন্দুতে (10^{-32}cm) প্রায় আটকানো ছিল, যে বিন্দুটিতে ভর (mass), চাপ ও তাপ ছিল বর্ণনাতীত, কল্পনাতীত এক অসীম স্কেলে। আর তার ফলেই প্রচন্ড এক বিস্ফোরণ ঘটে মহাসঙ্কোচন জনিত বিন্দুটি পরক্ষণেই মহাসম্প্রসারণের স্রোতে নিপতিত হয়ে বাতাসে ফুলে উঠা বেলুনের মত চতুর্দিক সম্প্রসারিত করে প্রায় ২০,০০০ বিলিয়ন আলোকবর্ষ ব্যাস ব্যাপী বর্তমান দর্শনযোগ্য ১০০ কোটি গ্যালাক্সীসমৃদ্ধ 'মহাবিশ্বটির' রূপ ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে। (দেখুন কুরআন সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিগ ব্যাংগ সিরিজ-১) তাই বর্তমান বিজ্ঞানীগণ বেশ কৌতুহলী হয়েই আমাদের মহাবিশ্বের প্রান্তসীমানার দিকে অর্থাৎ বস্তুজগতের প্রায় শেষ সীমানায় পৌঁছে যাওয়া মহাজাগতিক বস্তুসমূহের উপর নিরলষভাবে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছেন এ আশায় যে পৃথিবী থেকে প্রায় ১৩,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বের পরে প্রায় শূন্যাবস্থার দিকে ধাবমান 'গ্যালাক্সী' এবং 'কোয়াসারদের' কি পরিণতি ঘটছে তা দর্শন লাভ করার জন্য। কিন্তু দূর্ভাগ্য বলতে হবে এ জন্য যে বিজ্ঞানীগণ টেলিস্কোপ দিয়ে ঐ দূরত্বের পরে আর কিছুই দেখতে পান না। 'গ্যালাক্সী' এবং 'কোয়াসার' টেলিস্কোপের দৃষ্টি থেকেও হারিয়ে যাচ্ছে।



চিত্রঃ ১৩০

"সেইদিন আকাশমন্ডলীকে গুটাইয়া ফেলিব, যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দফতর।" (২১ ঃ ১০৪)

- যতই মহাবিশ্বে বস্তুজগতের প্রান্তঃ সীমানার দিকে গ্যালাক্সীসমূহ এগুতে থাকে, ততই তাদের গঠনাকৃতি প্রচন্ড চাপের মুখে সঙ্কুচিত হতে থাকে। ছবিতে প্রায় ৭/৮ শত কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বে গ্যালাক্সীদের দেখা যাচ্ছে। এদের অনেকেই গতির বৃদ্ধি জনিত কারণে ক্রমান্বয়ে পূর্বের তুলনায় আরও ক্ষুদ্রাকৃতি ধারণ করছে।



চিত্রঃ ১৩১

"আমি ঐ সব মানুষের জন্য নিদর্শন ব্যক্ত করিয়া থাকি, যাহারা স্মরণকারী ও চিন্তাশীল।" (৬ ঃ ১২)

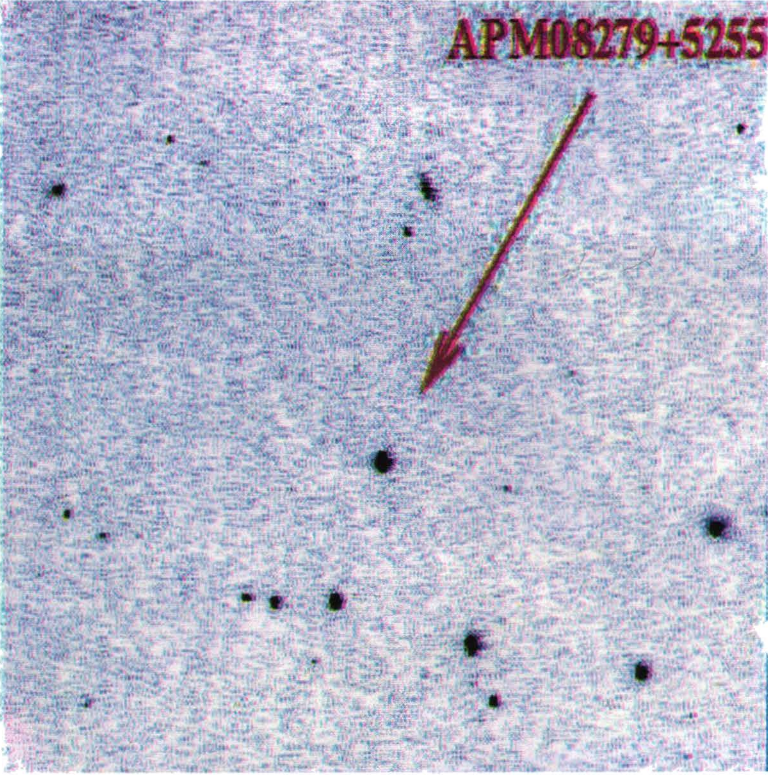
- প্রায় ১০০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বে পৌঁছে যাওয়া গ্যালাক্সী আরও ক্ষুদ্র হয়ে ক্রমান্বয়ে মহাসূক্ষ্ম বিন্দুর আকৃতি ধারণে এগিয়ে যাচ্ছে। মহাজাগতিক এক কঠিন নিয়মের বন্ধনে গ্যালাক্সীদের এই পরিনতি বরণ করতে হচ্ছে।



চিত্রঃ ১৩২

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর আধিপত্য একমাত্র আল্লাহ্‌র।" (২ ঃ ১১৬)

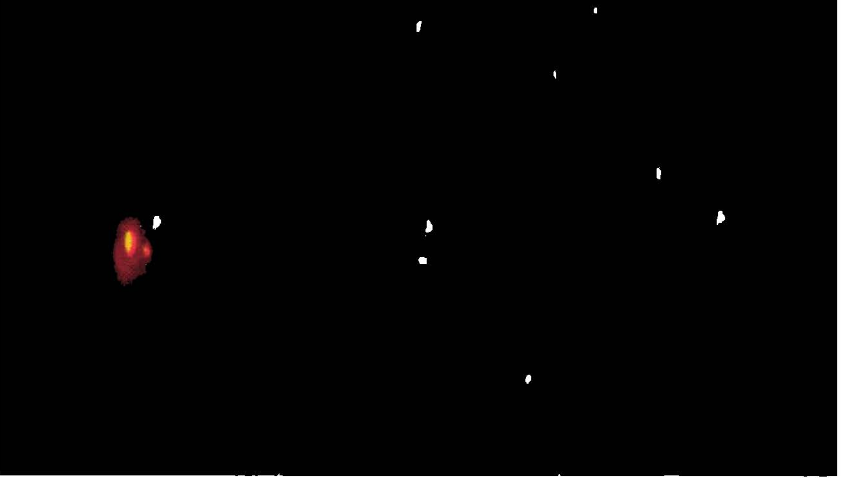
- পৃথিবী থেকে প্রায় ১৪০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বে পৌঁছে যাওয়া গ্যালাক্সী আদি আকৃতি হারিয়ে বর্তমানে বিন্দুবত আকৃতি ধারণ করতে বাধ্য হয়েছে প্রচন্ড গতি ও চাপের কারণে। এতে বিশ্ব নিয়ন্ত্রার প্রচন্ড ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।



চিত্রঃ ১৩৩

"শপথ ঐ তারকাপুঞ্জের (গ্যালাক্সীর) যখন উহারা অদৃশ্য হইয়া যায়।"
(৫৩ ঃ ১)

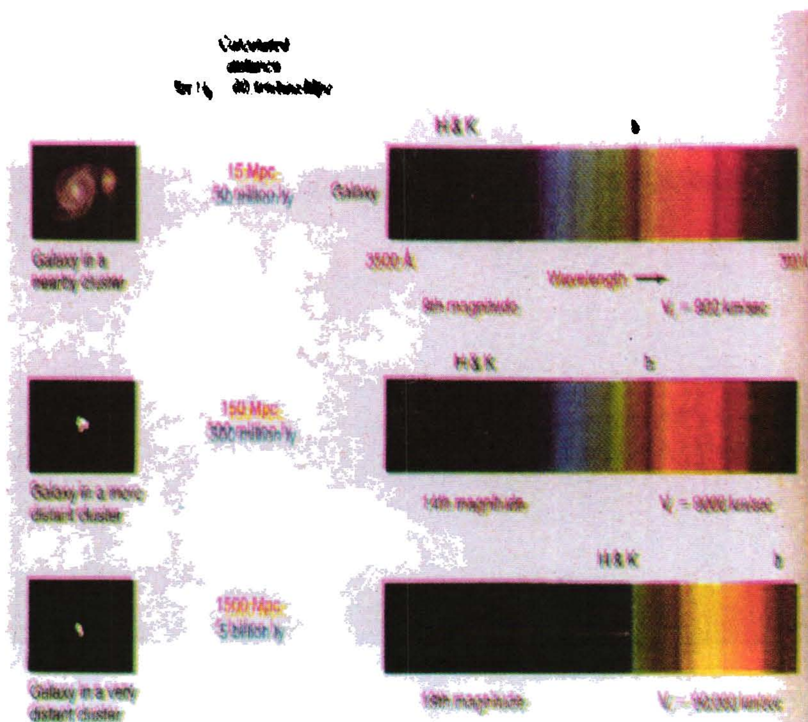
- আমাদের অবস্থান থেকে প্রায় ১৫০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বে পৌঁছে যাওয়া গ্যালাক্সী/কোয়াসার টেলিস্কোপে বিন্দুতে দেখাচ্ছে। আর স্বল্প সময় পরই মহাসূক্ষ্ম এক বিন্দুতে (Singularity) প্রবেশ করে বাহ্যিক গঠনাকৃতির বিলোপ সাধন করবে। কি ভয়ানক মহাজাগতিক এই কঠিন নিয়মে সংঘটিত সঙ্কুচিত অবস্থা? ভাবতে গেলে জ্ঞান লোপ পেয়ে যেতে চায়।



চিত্রঃ ১৩৪

"এইগুলিই প্রমাণ যে আল্লাহ্ সত্য।" (৩১ ঃ ৩৪)

- প্রায় ২০,০০০ কোটি নক্ষত্র ব্যবস্থা বুকে ধারণ করে বস্তুজগতের শেষ প্রান্তে উড়ে যাওয়া গ্যালাক্সী এখন আর তার পূর্বের অবস্থায় নেই। মহাসঙ্কোচনে পিষ্ট হয়ে ভিতরের সকল কিছু ভেংগে-চুরে মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। মহান স্রষ্টা আল্লাহ্র কৌশলের সম্মূখে মহাবিশ্বের বড় সংগঠন গ্যালাক্সীও বড় অসহায় হয়ে পড়েছে এবং জ্ঞানী সমাজের জন্য তাতে চিন্তার খোরাক জুগিয়ে দিয়েছে। যেন প্রকৃত সত্য সন্ধানে তারা পথ পেয়ে যায়।



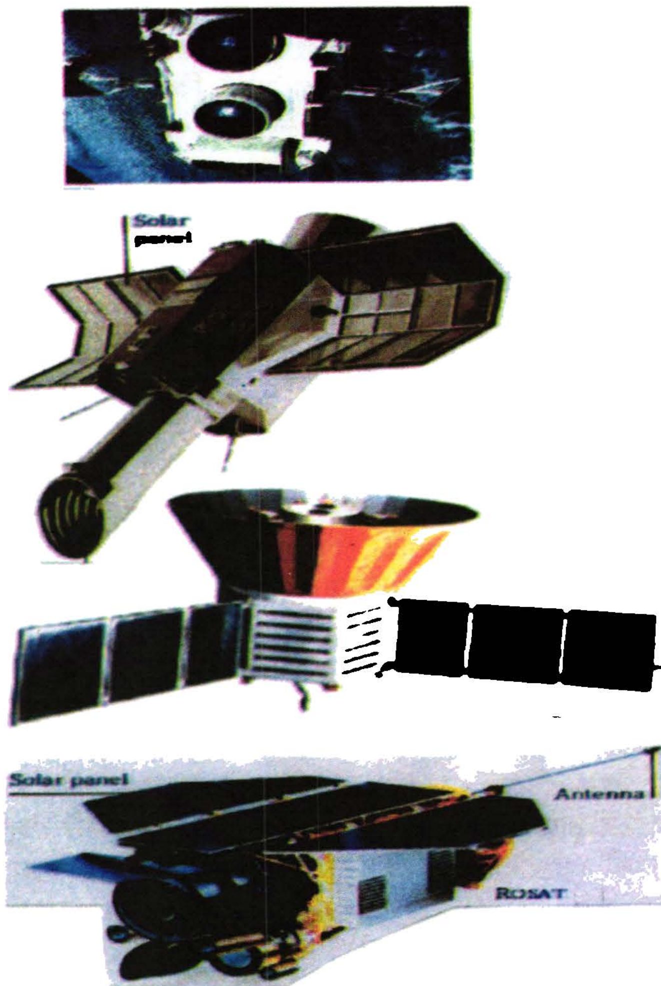
চিত্রঃ ১৩৫

"তিনিই মানুষকে জ্ঞান দান করিয়াছেন, ইতিপূর্বে সে যাহা জানিত না।"
(৯৬ ঃ ৫)

- বস্তুজগতের প্রান্তঃ সীমানায় পৌঁছে যাওয়া গ্যালাক্সী ও কোয়াসার থেকে আগত আলোকরশ্মিকে স্পেকট্রোস্কোপিতে প্রতিফলিত করে যে 'রেড ও ব্লু শিফট' পাওয়া যায়, বিজ্ঞানীগণ তা বিশ্লেষণ করে গ্যালাক্সী ও কোয়াসারের সার্বিক অবস্থা নির্ণয় করে থাকেন। ছবিতে একটি গ্যালাক্সীর বিভিন্ন 'রেড ও ব্লু শিফট'-এর পর্যাগুলোর বিভিন্ন প্রকার অবস্থা তুলে ধরেছে।

ফলে ঐ হারিয়ে যাওয়া বিন্দু থেকে প্রস্থানরত মহাজাগতিক বস্তুর আর কোন সন্ধান পাচ্ছেন না। গ্যালাক্সী এবং কোয়াসারদের ঐ চূড়ান্ত পরিণতির সময় এদের গঠনাকৃতি হারাবার সাথে সাথে কিন্তু এদের থেকে নির্গত আলোর (Radiation) পরিমানও খুব দ্রুত কমে যেতে থাকে। এক পর্যায়ে আর তা দেখা যায় না। একেবারে তাজা সে ধরণের একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে 'NASA'-র জানুয়ারী–২০০০ইং সালের এক প্রতিবেদনে।

আমেরিকান স্পেস সেন্টার 'NASA' একবিংশ শতাব্দীর শুভলগ্নে পৃথিবীর কক্ষপথে পরিভ্রমণরত 'The Compton Gamma-ray obsevatory'- কর্তৃক ১১,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বের প্রান্ত সীমায় আবিষ্কৃত 'কোয়াসার 4c 71.07 সম্পর্কে এক আশ্চর্য ধরণের সংবাদ গোটা বিশ্বব্যাপী প্রচার করেছে। বিগত কয়েক বছর থেকেই বিজ্ঞানীগণ দৃষ্টির প্রায় প্রান্ত সীমানায় আবিষ্কৃত ঐ কোয়াসারের (Quasar) ওপর নজর রাখছিলেন উক্ত 'স্যাটেলাইট' দিয়ে। ১৯৯৫ সালের ২০শে নভেম্বর বিজ্ঞানীগণ লক্ষ্য করেন কোয়াসারটি তার উজ্জলতা ব্যাপকহারে ছড়াচ্ছে। এ ঘটনার ৫৫ দিন পর এ অস্বাভাবিক উজ্জলতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে। অতঃপর ৩ মাসের মধ্যে এর পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে এবং পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে উজ্জলতা কমে যেতে থাকে। বর্তমানে এর নির্গত উজ্জলতা (Gamma-ray emission) পূর্বের সর্বোচ্চ রেকর্ডতো দূরের কথা পূর্বের স্বাভাবিক স্কেল থেকেও অনেক অনেক নীচে নেমে গেছে এবং যে কোন মুহূর্তেই চিরতরে নীভে গিয়ে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, আমাদের সৌরজগতের প্রায় দেড়গুণ সমান আয়তন বিশিষ্ট কোয়াসারটি কোটি-কোটি নক্ষত্র প্যাক্ট (Packed) অবস্থায় বুকে ধারণ করে সম্ভবতঃ আলোর গতির সমান গতিপ্রাপ্ত হওয়ার কারনে আদি আকৃতির ব্যাপক সঙ্কোচন ঘটিয়ে (কোটি কোটি নক্ষত্রের ব্যাপক ধ্বংস ঘটিয়ে) মহাজাগতিক কঠিন নিয়মের ভিতর দিয়ে 'মহাসুক্ষ্ম' বিন্দুর দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। আর তাই হয়তো এর অভ্যন্তরে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের কারণে এক পর্যায়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিকীরণ (Radiation) নির্গত করে অস্বাভাবিক উজ্জলতা প্রদর্শন করেছিল। এখন শেষ পরিণতির করুন অবস্থায় যৎসামান্য গামা-রে নির্গত (Gamma-ray emission) করছে। আর স্বল্পসময়ের ব্যবধানে হয়তোবা 'মহাসুক্ষ্মবিন্দুতে' (Singularity) প্রবেশ করে দৃশ্যমান অস্তিত্বের সম্পূর্ণরূপে বিলোপ সাধন করবে এবং গামা-রে নির্গতকরণ নিজ থেকেই নিঃশেষ করে দিবে। বিজ্ঞানের উক্ত আবিষ্কারটি মহাবিশ্বের সৃষ্টির



চিত্রঃ ১৩৬

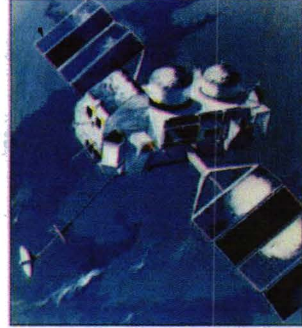
"তোমরা অবশ্যই ধাপে ধাপে (জ্ঞান-বিজ্ঞানে) উন্নতির প্রসার লাভ করিবে।"
(৮৪ ঃ ১৯)

- 'Compton Gamma-Ray Observatory' সহ বিভিন্ন প্রকার স্যাটেলাইট বিংশ শতাব্দিতে পৃথিবীর মানব মন্ডলীকে আকাশ রাজ্যের অসংখ্য অজানা রহস্যাবৃত বিষয়ের ওপর থেকে আবরণ সরিয়ে প্রকৃত 'সত্য' তথ্য সরবরাহ করে ধন্য করেছে।

Most distant quasar in soft gamma rays

Scientists using the Burst and Transient Source Experiment (BATSE) aboard the Compton Gamma Ray Observatory have discovered that a distant quasar continuously emits low energy ('soft') gamma rays interspersed by an occasional burst.

This is quite an achievement because BATSE observes the entire sky and does not have the accuracy to identify individual stars or galaxies. One way to overcome this handicap is to use the Earth as a giant occulting disk so that the signal of a particular source can be identified as it appears and disappears behind the planet.



Artist's impression of the Compton Gamma Ray Observatory in orbit. Photo: NASA.

The quasar concerned, known as 4C 71.07, lies about 11 billion light years away and is extremely bright at radio wavelengths. After painstaking research using three years of BATSE data, Angela Malizia from the University of Southampton also recognised its faint, low energy gamma-ray emissions.

This makes it the faintest and most distant object to be observed in soft gamma rays. 4C 71.07 has already been observed in gamma rays by the Energetic Gamma Ray Telescope (EGRET), another instrument aboard the Compton Gamma Ray Observatory.

The quasar is probably powered by a supermassive black hole at the centre of a newly forming galaxy. Its average flux (the amount of radiation reaching our telescopes) is about 1.3% that of the Crab Nebula, but it also bursts, although not simultaneously across the entire spectrum.

On November 20, 1995, it reached its record optical brightness. Then, 55 days later, the gamma ray emissions peaked, before fading back to the average output three months later. According to Malizia, this implies that the source is only 100 billion km (about 60 billion miles or a third of a light year) across.

The cause of the bursts remains unknown. However, the quasar population peaks at about the same distance as 4C 71.07, so the ability to observe these objects in soft gamma rays may provide astronomers with important information about their formation and internal processes.

Peter Bond

চিত্রঃ ১৩৭

"প্রত্যেক সংবাদ প্রকাশের নির্দিষ্ট সময় রহিয়াছে।" (৬ ঃ ৬৭)

- *'Compton Gamma-Ray Observatory'* মহাকাশে অবস্থান করে বস্তুজগতের প্রায় প্রান্তঃসীমানায় কোয়াসারের যে করুণ পরিণতির তথ্য ও ছবি সরবরাহ করেছে, তাতে ভূ-পৃষ্ঠের জ্ঞানী সমাজের বিবেক নাড়া খেয়েছে, তাই তারা একরাশ হতাশা ব্যক্ত করে বলছে- *'Where are we going?'*



চিত্রঃ ১৩৮

"শপথ সেই 'পতনস্থানের' যেখানে নক্ষত্রসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, যদি তোমরা জানিতে ইহা অবশ্যই এক মহা গুরুতর শপথ।" (৫৬ ঃ ৭৫, ৭৬)

- বস্তুজগতের প্রান্তঃসীমানায় গ্যালাক্সীগুলোকে সঙ্কুচিত করে মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে পৌঁছাবার জন্য প্রচন্ড গতির বাধাকে কাজে লাগিয়ে একদিকে গ্যালাক্সীর গঠনাকৃতি যেরূপ মহাজাগতিক নিয়মে ভেঙ্গে ছোট করা হচ্ছে, অপরদিকে সেইরূপ মহাজাগতিক আরেক নিয়মে প্রতিটি গ্যালাক্সীর কেন্দ্রে বৃহৎ বৃহৎ Black hole তৈরী হয়ে তার ঐশ্বরিক টানে সঙ্কোচন কাজে সহযোগীতা করছে।



চিত্রঃ ১৩৯

"আমি ঐসব মানুষের জন্য নিদর্শন ব্যক্ত করিয়া থাকি, যাহারা স্মরণকারী ও চিন্তাশীল।" (৬ ঃ ১২৬)

- মহাবিশ্বে বস্তুজগতের প্রান্তঃসীমানায় প্রচন্ড গতিতে উড়ার পথে একদিকে চাপে গ্যালাক্সীগুলো সঙ্কুচিত হয়ে ছোট হতে থাকে, অপরদিকে কেন্দ্রে বিরাজমান বিরাট-বিরাট 'ব্ল্যাক হোল' সঙ্কুচিত হয়ে পড়া নক্ষত্র সহ সকল বস্তুকে গলাধঃকরণ করে করে সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য করে দেয়। ফলে গ্যালাক্সী মহাসূক্ষ্ম একটি বিন্দুতে (Singularity তে) উপনীত হয়।

শুভক্ষণটি 'বিগ্-ব্যংগ'কে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, যেখানে এ জাতীয় মহাসুক্ষ্মবিন্দুতে (10^{-32}cm) সমস্ত বস্তুভর প্রচন্ড চাপে জমানো ছিল। তাই বর্তমান বিজ্ঞানীগণ, বস্তুজগতের প্রায় প্রান্তসীমানায় গ্যালাক্সী বা কোয়াসারের উল্লেখিত পদ্ধতিতে পর পর 'মহাসুক্ষ্ম' বিন্দুতে জমে গিয়ে অদৃশ্য হওয়াকে, শর্তপূরণ সাপেক্ষে নতুন নতুন জগত আবার সৃষ্টির সম্ভাবনার কথাই বলে চলেছেন। কেননা সমগ্র গ্যালাক্সী প্রায় ২০,০০০ কোটি নক্ষত্র সমেত মহাসুক্ষ্মবিন্দুতে ঘনায়ণের পর পরবর্তী অবস্থা-ই হচ্ছে প্রচন্ড বিষ্ফোরনের মাধ্যমে পূর্বের সঙ্কোচনের বিপরীতে মহাসম্প্রসারনে নিয়োজিত থেকে পর্যায়ক্রমে নতুনভাবে জগত সৃষ্টি করা, যা আমরা 'Big Bang Model'-এ প্রত্যক্ষ করেছি। বিজ্ঞান বিশ্ব উল্লেখিত তথ্যের সমর্থনে বেশ চাঞ্চল্যকর একটি বিষয় ইতোমধ্যেই উদ্‌ঘাটন করেছে। আর তাহলো মহাবিশ্বের প্রান্ত সীমানায় বহুদূরে 'গামা-রে বিচ্ছুরণ' (Gamma ray burst) দর্শন ও সনাক্ত করে ছবিধারণ। উক্ত 'গামা-রে বিচ্ছুরণ' এত প্রচন্ডভাবে সংঘটিত হচ্ছে যে, তা সমগ্র মহাকাশকে তার ঝলক (Flash) দিয়ে আলোকময় করে দিচ্ছে। ব্যাপারটি জাতিসংঘের তত্ত্বাবধনে পারমানবিক বিস্ফোরণরোধক (Nucleas Ban treaty Flash) কমিটি'Vela Satellite'-র মাধ্যমে মহাশুন্যে ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ওপর কড়া নজর রাখতে গিয়ে সর্বপ্রথম এ তথ্য আবিস্কার করেন। প্রথম প্রথম তারা ভেবেছিলেন ভূ-পৃষ্ঠে গোপনে কোন দেশ হয়তোবা নিষিদ্ধঘোষিত একাধিক পারমানবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে থাকবে। কিন্তু পরবর্তীতে ঐ 'গামা-রে বিচ্ছুরণের' ব্যাপকতা ও বিশালতা পরিমাপের পর তাদের সে ভুল ভেঙ্গে যায়। বিজ্ঞানীমহলে তুমুল হৈ-চৈ পড়ে যায়। পরবর্তীতে বেশ কয়েকটি উৎকর্ষিত স্যাটেলাইট(Beppo-Satellite, Compton Observatory, BATSE. Instrument ইত্যাদি) কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীগণ উল্লেখিত 'গামা-রে বিচ্ছুরণের' (GRBs) উৎসস্থান প্রাথমিকভাবে হলেও সনাক্ত করতে সমর্থ হন। যদিও এর প্রকৃত কারণ সন্ধানে এখনও তারা নিয়োজিত রয়েছেন। তবে কেউ কেউ এর কারণ সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে মন্তব্য করেছেন যে, হয়তোবা কল্পনাতীত উক্ত 'গামা-রে বিচ্ছুরণের' জন্য একাধিক 'নিউট্রন ষ্টার' বা 'ব্ল্যাক হোলের' সংঘর্ষই মূলতঃ কারণ হতে পারে। কিন্তু উক্ত প্রস্তাব বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেই গ্রহণযোগ্যতা পায় না। কেননা সদ্য সনাক্ত 'গামা-রে বিচ্ছুরণ' থেকে মুহুর্তের মধ্যে যে পরিমাণ বিকিরণ নির্গত হচ্ছে, বিজ্ঞানীগণের ভাষ্যমতে তার তুলনা হতে পারে

কেবলমাত্র 'Big Bang' বিস্ফোরণ হতে নির্গত বিকিরণের কাছাকাছি পর্যায়ের বিকিরণের সাথে, অন্য কোন বিকিরণের সাথে এজন্য তুলনা হতে পারে না কেননা, মানবসভ্যতা এখনও পর্যন্ত এ জাতীয় প্রচন্ড শক্তিশালী বিস্ফোরণের সাথে পরিচিত নয় (Gamma Ray Burst (GRBS) are the most Powerful explosions everfound by humanity)

'নিউট্রন ষ্টার' বা 'ব্ল্যাক হোলের' নিজেদের মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষের কারণে উক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকলে ঃ-

(১) তা অবশ্যই দৃশ্যমান প্রায় ১০০ কোটি গ্যালাক্সীর অভ্যন্তরেই সংঘটিত হয়ে থাকতো।

(২) কিন্তু তা না হয়ে মহাকাশের মহাশূন্যতায় এককভাবে আলাদা স্থানে সংঘটিত হচ্ছে, যেখানে কোন গ্যালাক্সী কিংবা কোয়াসার পাওয়া যাচ্ছে না।

(৩) প্রতিটি গ্যালাক্সীতে শত সহস্র 'নিউট্রন ষ্টার' ও 'ব্ল্যাক হোলের' আবাস সত্বেও এযাবত ঐ জাতীয় একটি ঘটনাও বিজ্ঞানীগণ সনাক্ত করতে ব্যর্থ হন।

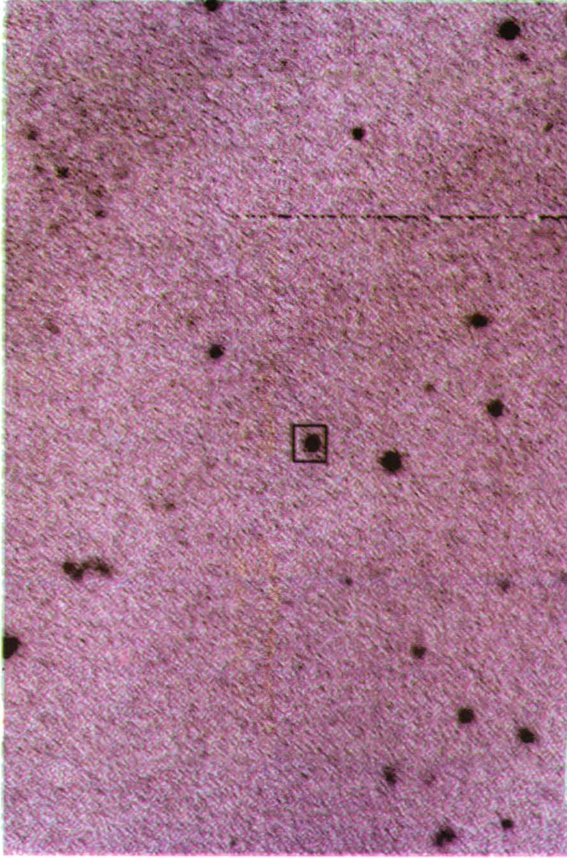
(৪) প্রায় ১৪/১৫শত কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বে যেখানে গ্যালাক্সীগুলো আলোর গতিপ্রাপ্ত হয়ে পৌঁছার কারণে মহাজাগতিক কঠিন নিয়মে সঙ্কুচিত হয়ে মহাসুক্ষবিন্দুতে (Singularity) উপনীত হচ্ছে সেখানে নিউট্রন ষ্টার, ব্ল্যাক হোল কিংবা দুটো গ্যালাক্সীর সংঘর্ষ বৈজ্ঞানিক তথ্যের দিক থেকে ন্যায্যতা পায়না।

এখন উক্ত 'গামা-রে বার্ষ্ট' (GRBs) সমূহ যে প্রকৃতপক্ষে নতুন জগত সৃষ্টির সূচনামুলক বিস্ফোরণ থেকেই বিচ্ছুরিত বিকিরণ সে কথা প্রায় অনেকটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। কারণঃ-

বিজ্ঞানীগণ বলছেন ঃ

(১) 'Gamma-Ray Burst still believed to be the most powerful explosions in the Universe.'

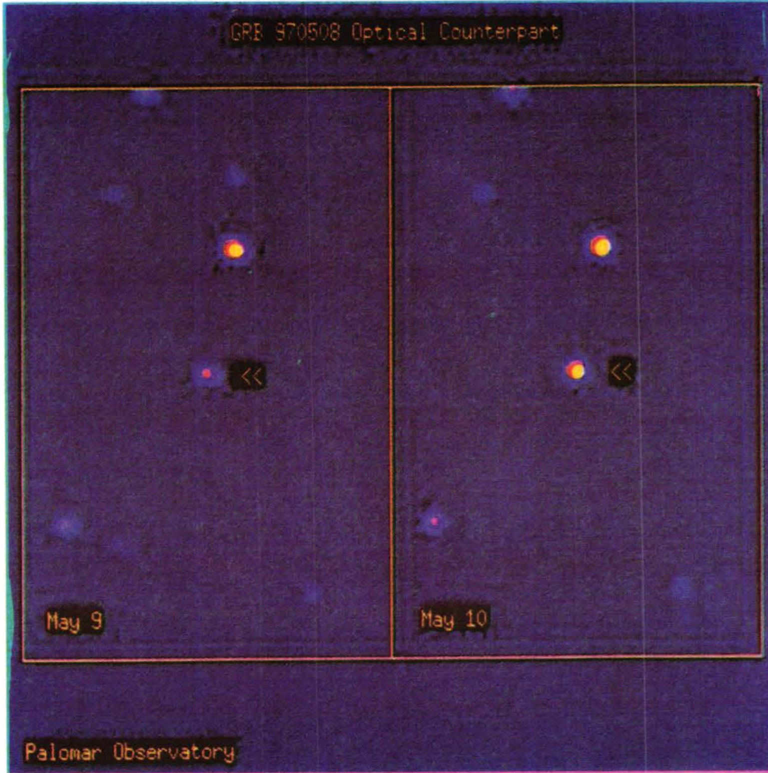
অর্থাৎ, এখনও বিশ্বাস করা হয় 'গামা-রে বাষ্ট' সর্বোচ্চ শক্তি সম্পন্ন বিস্ফোরণ আমাদের এই মহাবিশ্বে।



চিত্রঃ ১৪০

"যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করিয়াছিলাম, সেইভাবে পূণরায় সৃষ্টি করিব। প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি ইহা পালন করিব-ই।" (২১ ঃ ১০৪)

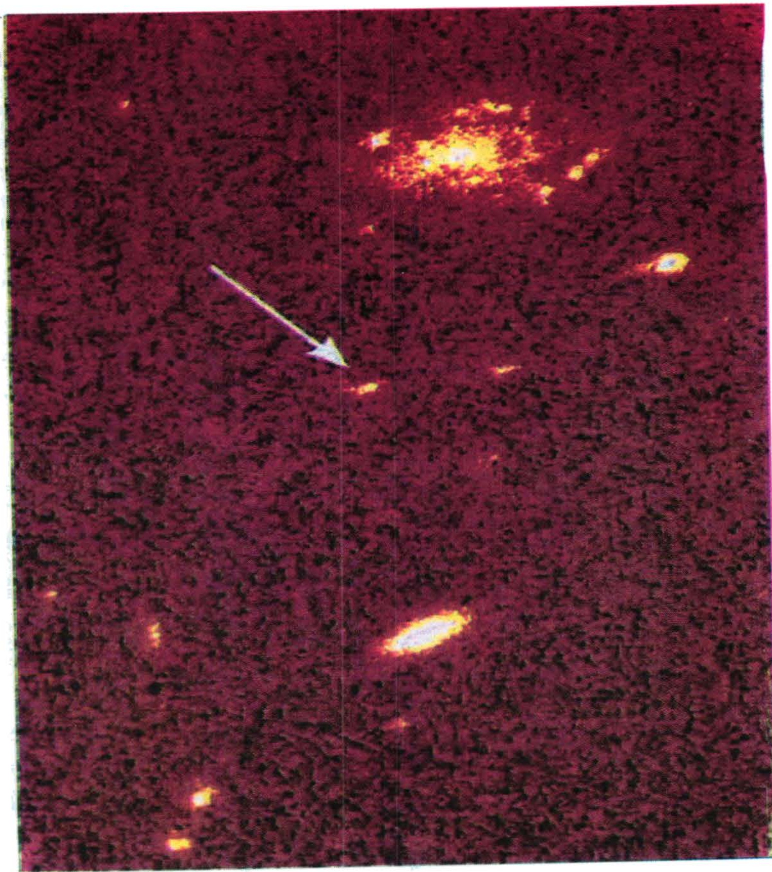
- ১৯৯৭ সালের ৮ই মে বৃহস্পতিবার ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রথমবারের মত বিজ্ঞানীগণ কক্ষপথে পরিভ্রমণরত 'Beppo-Sax Satellite' দিয়ে 'গামা-রে বার্ষ্ট' (Gamma-Ray Burst) সংঘটিত হওয়ার মাত্র এক ঘন্টার মধ্যেই ছবিটি ধারণ করেন, যা ছবিতে বক্স আকারে দেখানো হয়েছে। এর নামকরণ করা হয়েছে GRB970508 এবং এর red shift হচ্ছে 0.8, যা নির্দেশ করছে বিষ্ফোরণটি আমাদের থেকে বহু বহু দূরে (প্রায় ১৫০০ কোটি আলোকবর্ষ) বস্তুজগতের প্রায় শেষ প্রান্তে সংঘটিত হয়েছে।



চিত্রঃ ১৪১

"অবশ্যই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে পর্যবেক্ষণ শক্তি সম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য।" (১৬ ঃ ৬৭)

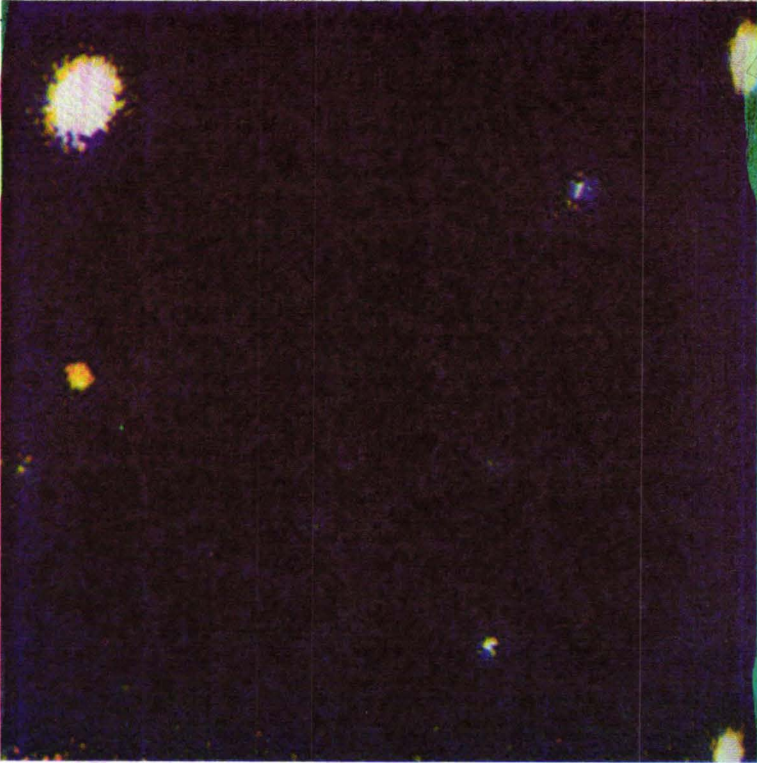
- ছবিতে 'গামা-রে বার্ষ্ট' GRB970508'-র ৯ই মে ও ১০ই মে ১৯৯৭ সালের অবস্থা দেখানো হয়েছে। যেখানে চিহ্নিত বিন্দুটি একদিনের মধ্যে তার বিস্ফোরণজাত রক্তিম আভা (Glow) ও উজ্জ্বলতা ব্যাপকভাবে তুলে ধরেছে। উক্ত উজ্জ্বলতা (Flash) সমগ্র মহাকাশকে অতুলনীয় কিরণচ্ছটায় ভরে দেয় বলে বিজ্ঞানীগণ পর্যবেক্ষণে দেখতে পান, যার সাথে তুলনা হতে পারে মানবজ্ঞানে এখনও সেরকম দর্শনযোগ্য প্রমান হস্তগত হয়নি।



চিত্রঃ ১৪২

"উহারা কি লক্ষ্য করিয়া দেখে না, কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতঃপর পূণরাবৃত্তি ঘটান? ইহাতো আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।"

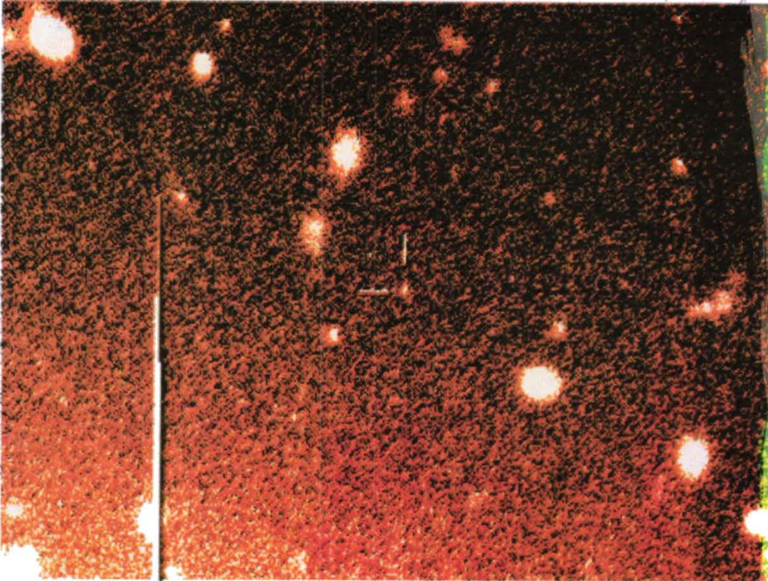
- ১৯৯৭ সালের ১৪ই ডিসেম্বর ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৬০০ কিঃ মিঃ উর্ধ্বে সংস্থাপিত 'হাবেল স্পেস টেলিস্কোপ (HST)' দিয়ে উক্ত 'গামা-রে বার্ষ্ট' (GRB)-র ছবিট ধারণ করা হয়েছে। এর 'red shift' প্রমান করছে প্রায় ১২০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বে বিস্ফোরণটি সংঘটিত হয়েছে। বিজ্ঞানীগণের ভাষ্যমতে এই বিস্ফোরণ থেকে কয়েক হাজার সুপার নোভা বিস্ফোরণের সমষ্টির সমান শক্তি (Energy) খুবই অল্প সময়ে নির্গত হয়েছে। তুলনাবিহীন এই বিষয়টি বিজ্ঞান বিশ্বকে ভাবিয়ে তুলেছে।



চিত্রঃ ১৪৩

"আদিতে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি উহার পূনরাবৃত্তি করেন।"
(২৭ ঃ ৬৪)

- বস্তুজগতের প্রান্তঃসীমানায় প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১টি করে সংঘটিত হচ্ছে 'গামা-রে বার্ষ্ট' (GRB) এর থেকে নির্গত হচ্ছে 'highly energetic Gamma-Rays' এবং স্বল্প সময়ে এত ব্যাপক পরিমাণে নির্গত হচ্ছে যে এখনও যার সাথে তুলনা করার মত দ্বিতীয় কোন তথ্য বিজ্ঞানের হাতে পৌঁছেনি। বিষয়টি মহাবিস্ময়ের বিস্ময় নয় কি?



চিত্রঃ ১৪৪

"যেদিন জমিনকে পরিবর্তন করিয়া ভিন্নরূপ জমীনে পরিণত করা হইবে এবং তদ্রূপ করা হইবে ঐ আকাশমন্ডলীকেও।" (১৪ ঃ ৪৮)

- ৩১শে জানুয়ারী ২০০০ সালে মহাকাশের দূরবর্তী অঞ্চলে সংঘটিত Gamma-Ray-Burst চিলির মান-মন্দিরে রক্ষিত VL Telescope দিয়ে ধারণ করা হয়েছে। বিজ্ঞানীগণ বলছেন এর red shift 4.5 প্রমাণ করছে যে, This vast distance indicates that GRB000131 occured just as galaxies like our Milky Way were forming. সুতরাং GRB নতুন সৃষ্টির বার্তা বহন করে চলেছে। ছবিতে মাঝখানে 'গামা-রে বার্ষ্ট' (GRB) দেখা যাচ্ছে।



চিত্রঃ ১৪৫

"যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করিয়াছিলাম, সেইভাবে পুণরায় সৃষ্টি করিব, প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি ইহা পালন করিব-ই।" (২১ ঃ ১০৪)

- ১লা মার্চ, ২০০০ সালে সংঘটিত Gamma-Ray Burst পৃথিবী প্রদক্ষিণরত স্যাটেলাই RXTE, Sun-orbiting Ulysses, Asteroid orbiting NEAR, Nordic Optical Telescope, Calar Alto Telescope, VLA Telescope, Subaru Telescope সহ প্রায় সবাই ছবিটি ধারণ করেছে, কিন্তু সবাইর একই প্রশ্ন 'What type of explosion this was?' যার নিকটবর্তী এলাকায় কোন গ্যালাক্সী কিংবা কোয়াসার কিছুই দেখা যায় না, বস্তুতঃ মহাজাগতিক নিয়মে মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে প্রবেশকৃত গ্যালাক্সী সমূহ-ই যে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নতুন জগত্ সৃষ্টি করছে তা আর না বললেও বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না।

(২) 'Gamma-Ray Burst are thought to be the most powerful explosions in the Universe.'

অর্থাৎ, মহাবিশ্বে 'গামা-রে বার্ষ্ট'কে খুবই শক্তিশালী বিস্ফোরণ হিসেবে চিন্তা করা হচ্ছে।

(৩)'The source of the incredible energy of Gamma-Ray Burst remains a mystery.'

অর্থাৎ, অকল্পনীয় শক্তির উৎস 'গামা-রে বার্ষ্ট' এখনও রহস্যপূর্ণই রয়ে গেছে।

(৪) 'Some estimate suggest that in a few seconds the burster released the equivalent energy of several hundred supernova (exsploding stars).

অর্থাৎ, অনেকের মতে মাত্র কয়েক সেকেন্ডে 'গামা-রে বার্ষ্ট' হতে যে শক্তি নির্গত হয়, তা প্রায় হাজার হাজার 'সুপার নোভা' বিস্ফোরণ হতে নির্গত শক্তির সমষ্টির সমান।

(৫) 'GRB$_S$ shines with the brightness of hundred billion Suns. (One billion = ১০০ কোটি)'

অর্থাৎ, 'গামা-রে বার্ষ্ট' হতে নির্গত বিকিরণের উজ্জলতা সহস্র কোটি নক্ষত্রের সম্মিলত উজ্জলতার সমান।

(৬) একটি গ্যালাক্সীতে গড়ে নক্ষত্রের সংখ্যাও হচ্ছে প্রায় ১০,০০০ কোটি থেকে ২০,০০০ কোটি এবং বস্তুজগতের প্রান্তসীমানায় গিয়ে সঙ্কুচিত হয়ে যদি শর্তপুরণ সাপেক্ষে (চাপ এবং তাপে) গ্যালাক্সীটি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নতুনভাবে জগতের গোড়াপত্তন করে, তাহলে ঐ বিস্ফোরণ হতে নির্গত বিকিরণের উজ্জলতা অবশ্যই সহস্রকোটি নক্ষত্রের (Hundred billion Stars) উজ্জলতার সমানই দেখাবে।

(৭) বিজ্ঞানীগণ পূর্বেই দেখিয়েছেন, গ্যালাক্সীসমূহ মহাশূন্যে উড়তে গিয়ে ক্রমান্বয়ে গতি বাড়িয়ে যে মুহুর্তে বস্তুজগতের প্রান্তসীমানার দিকে প্রায় আলোর সমান গতিপ্রাপ্ত হবে, তখন গতিমুখের অনুকুলে মহাসঙ্কোচনের কারণে বাধ্য হয়ে এক সময়ে মহাসুক্ষ্ম এক বিন্দুতে (Singularity) উপনীত হবে। ফলে 'Big Bang Model'-র ন্যায় প্রচন্ড চাপে ও তাপে বিন্দুটি

আর স্থির থাকতে না পেরে মুহুর্তেই মহাবিস্ফোরণ ঘটিয়ে নতুনভাবে জগত সৃষ্টি করবে।

(৮) 'Big Bang' বিস্ফোরণমূহুর্তের ঝলকটি (Flash) ছিল যেমন সেকেন্ডের ভগ্নাংশ, তদ্রুপ উক্ত GBRs-র বিকিরণ ঝলকটিও মূহুর্তের জন্য হয়ে থাকে। ইতোমধ্যে বিষয়টি প্রমাণিতও হয়েছে।

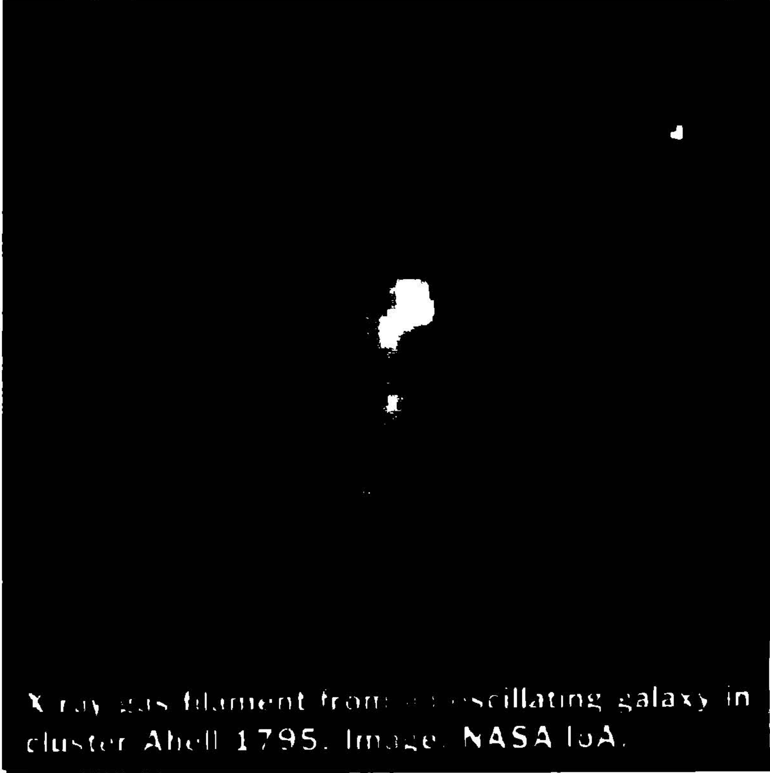
(৯) 'Big Bang Flash'-র পরে মহাবিশ্বে বড় সংগঠন একমাত্র গ্যালাক্সী বৃহৎ বস্তু হিসেবে সঙ্কুচিত হয়ে যদি চাপ এবং তাপের চুড়ান্ত মাত্রার কারণে শর্তপুরণসাপেক্ষে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে থাকে তাহলে ঐ বিস্ফোরণের Flash-ই Big Bang Flash-এর পরে স্থান পাওয়ার যোগ্য হতে পারে। অন্যকোন প্রকার বিস্ফোরণই এই মান পেতে পারে না।

(১০) প্রতিটি GRBs সংঘটিত ও সনাক্ত হচ্ছে আমাদের বর্তমান অবস্থান থেকে প্রায় ১৪/১৫ শতকোটি আলোকবর্ষ দুরত্বে। যে দুরত্বে পৌঁছার পরই গ্যালাক্সীসমুহ গতিমুখের চাপে সঙ্কোচনে বাধ্য হয়ে মহাসুক্ষ্মবিন্দুতে উপনীত হচ্ছে এবং পরবর্তীতে চাপ ও তাপের প্রচন্ডতায় বিষ্ফোরণ ঘটিয়ে আবার নতূন জগত সৃষ্টি করছে।

(১১) পৃথিবী থেকে দশ বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে আবিস্কৃত 'গ্যালাক্সীগুচ্ছ 3C294' বিষ্ফোরণ পরবর্তী বর্ধিত রক্তিম আভার (Glowing) অগ্নি গোলক হতে নতুন নতুন গ্যালাক্সীর জন্ম দিচ্ছে, তাতে প্রমানিত হচ্ছে গামা-রে বার্ষ্ট সংঘটিত হওয়ার মধ্য দিয়ে সময়ের বিবর্তনে এর থেকে নতুন নতুন জগত সৃষ্টি হয়ে চলেছে।

(১২) এতটুকু আসার পর আমরা আমাদের মহাবিশ্বের মাঝে গ্যালাক্সীদের পূর্ণ একটি জীবন পরিক্রমার (Life Cycle) চিত্র দেখতে পাচ্ছি। Big Bang বিন্দুতে মহাবিষ্ফোরণ ঘটার পর বিবর্তন ধারায় গ্যালাক্সীগুলো সৃষ্টি হয়ে মহাবিশ্বের মহাশূণ্যতায় গতির বৃদ্ধি ঘটিয়ে উড়তে গিয়ে প্রচন্ড চাপে সঙ্কুচিত হয়ে এক মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে উপনীত হচ্ছে এবং পরবর্তীতে ঐ অবস্থায় আবার বিষ্ফোরণ ঘটিয়ে পূর্বের ন্যায় নতুন গ্যালাক্সী সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় নতুনভাবে জগত সৃষ্টি করছে।

সুতরাং বিজ্ঞানের উদঘাটিত তথ্য ও তার নিজস্ব যুক্তির ভেতর দিয়েই আমরা দেখতে পাচ্ছি-'পরকাল' এক মহাসত্যতায় মন্ডিত হয়ে পৃথিবীর মানবমন্ডলীকে স্বাগত জানিয়ে আলিঙ্গন করতে এগিয়ে আসছে। ফলে পরকাল অবিশ্বাস করা বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করারই নামান্তর।

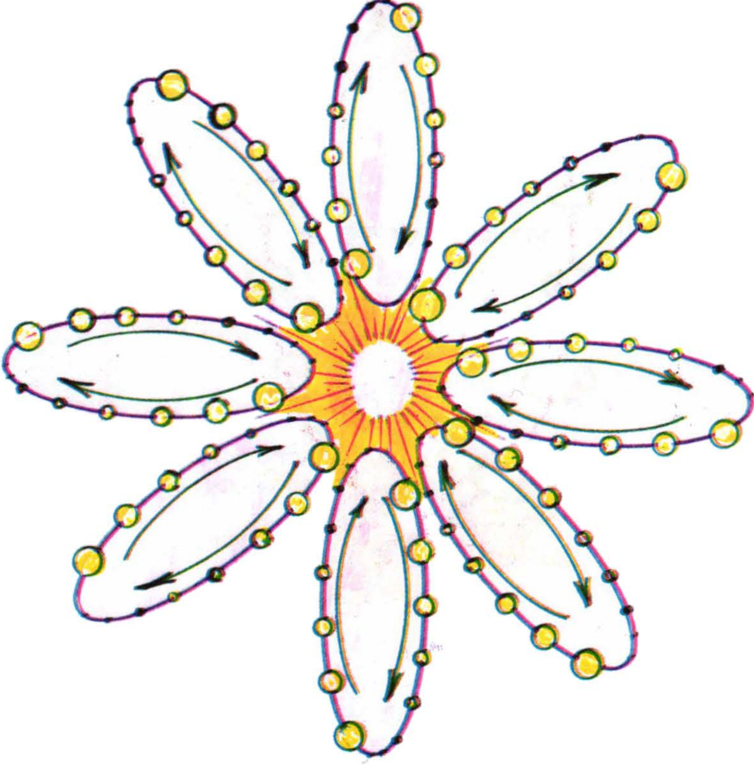


X ray gas filament from an oscillating galaxy in cluster Abell 1795. Image: NASA IoA.

চিত্রঃ ১৪৬

"ইহাতো কেবলমাত্র একটি বিস্ফোরণ, অতঃপর (সৃষ্ট নতুন জগতে) উহাদের আবির্ভাব হইবে।" (৭৯ ঃ ১৩, ১৪)

- আবিস্কৃত 'Abell 1795 cluster' অর্থাৎ 'গামা-রে বার্ষ্ট' হতে পর্যায়ক্রমে নতুনভাবে সৃষ্টি হওয়া গ্যালাক্সীগুচ্ছ প্রমাণ করছে মহাবিশ্বে 'বিগ ব্যাংগ' এর পর সৃষ্টি হয়ে মহাশূণ্যে পরিভ্রমণরত অবস্থায় এক পর্যায়ে সঙ্কুচিত হয়ে শর্ত পূরণ সাপেক্ষে আবার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নতুন জগত তৈরী করছে। সুতরাং বস্তুজগতের শেষ প্রান্তে নতুন জগত সৃষ্টি পরকালের সূচনার যে ইংগিত দিচ্ছে তা অস্বীকার করার পথ আছে কি?



চিত্রঃ ১৪৭

"উহারা কি লক্ষ্য করেনা কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতঃপর পুণরাবৃত্তি ঘটান? ইহাতো আল্লাহ্র জন্য সহজ।" (২৯ ঃ ১৯)

-'Big Bang' বিস্ফোরণের মাধ্যমে গ্যালাক্সী সমূহ সৃষ্টি হয়ে চতুর্দিকে ছুটে চলেছে, পরবর্তীতে প্রায় আলোর গতি প্রাপ্ত হয়ে মহাসঙ্কোচনের কারণে কল্পনাতীত ক্ষুদ্রত্ব বরণ করে আবার চাপ ও তাপে শর্ত পূরন হয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নতুন জগতের সূচনা করছে। এভাবে বস্তুজগত পুনঃ পুনঃ তার জীবন পরিক্রমা (Life Cycle) পূর্ণ করে চলেছে।

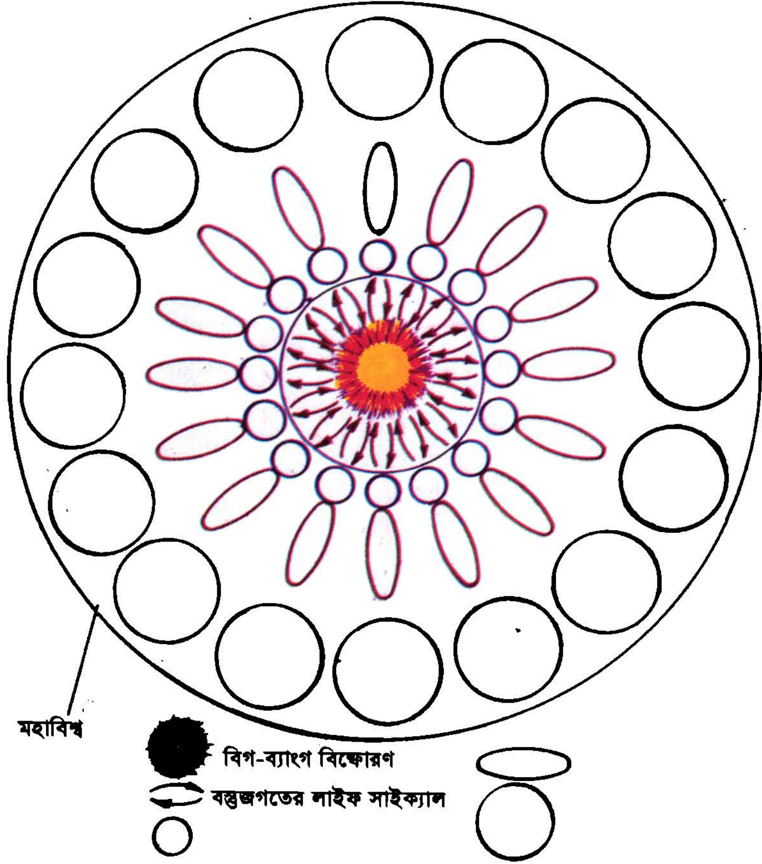


চিত্রঃ ১৪৮

"আদিতে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর তিনি উহার পূনরাবৃত্তি করেন।"
(২৭ ঃ ৬৪)

- বর্তমান সময়ে বিজ্ঞানের হাতে বিস্ময়াভূত তথ্য ও ছবির আগমন ঘটায় 'পরকালের' বাস্তবতা একশত ভাগ নিশ্চয়তা সহকারে (প্রমান সাপেক্ষে) মানবমন্ডলীর সম্মূখে উপস্থিত হয়েছে। ছবিতে গ্যালাক্সীদের (যে গ্যালাক্সীতে আমাদের পৃথিবীর ন্যায় জীবনময় গ্রহসমূহ লালিত-পালিত হচ্ছে) বিস্ফোরণের মাধ্যমে জন্ম নিতে এবং পরবর্তীতে মহাশূণ্যে উড়তে গিয়ে গতিবৃদ্ধি জনিত মহাসঙ্কোচনে পড়ে মহাসূক্ষ্ম বিন্দুতে (Singularity) উপনীত হতে দেখা যাচ্ছে। ঐ অবস্থায় পৌছার পর প্রচন্ড চাপ ও তাপের কারণে পরক্ষণেই বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নতুন গ্যালাক্সী তথা জগত তৈরী হচ্ছে।

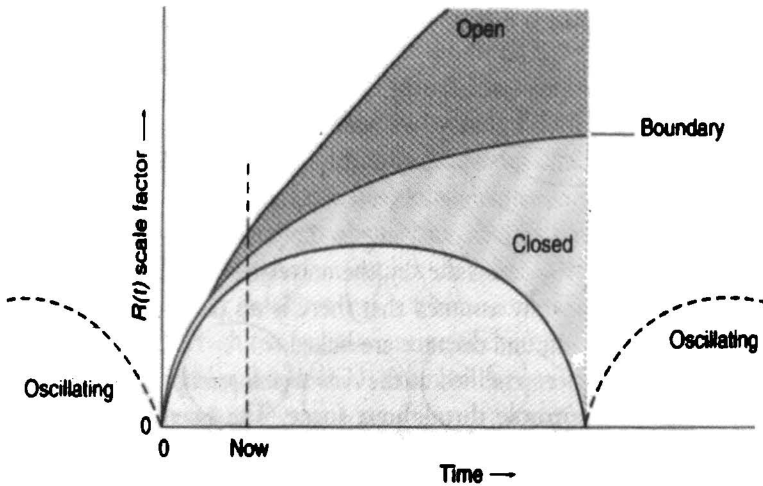
মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রনে পরিচালিত এই মহাবিশ্ব মহাবিস্ময়ের বিস্ময় হয়ে বিরাজ করছে।



চিত্রঃ ১৪৯

"তাঁহার আসন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, ইহাদের রক্ষণা-বেক্ষণ তাঁহাকে ক্লান্ত করে না, তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।" (২ ঃ ২২৫)

- আল্লাহ্ তায়ালার 'আর্‌শ মহল্লা' দ্বারা সমগ্র মহাবিশ্বটি পরিবেষ্টিত বিধায় এর অভ্যন্তরস্থ ইহজগত (বস্তুজগত) ও পরজগত ভিন্ন-ভিন্ন ব্যবস্থায় স্ব-স্ব জীবন পরিক্রমা (Life Cycle) অনুসরণ করে চলেছে।



চিত্রঃ ১৫০

"যিনি আদিতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি উহার পূনরাবৃত্তি করেন।"
(২৭ ঃ ৬৪)

- আমাদের মহাবিশ্বটি মূলতঃ একই সাথে 'Open' এবং 'Oscillating' Universe. ফলে অনরবত যেমন মহাসম্প্রসারণে কেবলই চতুর্দিকে বর্ধিত হচ্ছে তেমনি এই সম্প্রসারনের ভিতরেই পূণরায় গ্যালাক্সীসমূহ একবার সৃষ্টি আবার ধ্বংস হয়ে 'পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও ধ্বংসের' পরিক্রমা (Cycle) পূর্ণ করছে।

আজকে উন্নততর বিজ্ঞান বিশ্বে চরম বাস্তবতার আলোকে প্রমান হাজির হওয়ায় সুস্থ বিবেক সম্পন্নদের 'পরকাল' অবিশ্বাস করার সকল পথই রুদ্ধ হয়ে গেছে ।

আর সেজন্য বলতে ইচ্ছে করে, ধন্য হোক বর্তমান বিজ্ঞান, ধন্য হোক প্রকৃত জ্ঞানের সাধক বিজ্ঞানীসমাজ-যারা কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে বিরাট অজগর সাপের সন্ধান করে ফেলেছেন।

সুতরাং আমাদের মহাবিশ্বে মহাকাশের বৃহৎ সংগঠন গ্যালাক্সীসমূহ বস্তুজগতের প্রায় প্রান্তসীমায় মহাজাগতিক নিয়মে (আলোর গতির সমান গতি লাভ করে) 'মহাসুক্ষ্ম বিন্দুতে' (Singularity) উপনীত হয়ে পুনঃসৃষ্টির শর্তপূরণ সাপেক্ষে বিষ্ফোরণের মাধ্যমে পরবর্তীতে নতুন জগত সৃষ্টি করে চলেছে। যদিও আমরা তা পৃথিবী থেকে সরাসরি দেখতে পাচ্ছি না, তবে ঐ বিষ্ফোরণের ঝলক (যা গামা-রে বার্ষ্ট হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে) আমরা টেলিস্কোপ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। কি চমৎকার বিষয় তাই না? মহাকাশের মহাবিস্ময় দর্শন করে তার ব্যাখ্যা দিতে দিতে বিজ্ঞান যে একেবারে ধর্মের পদতলে এসে দাড়িয়ে গিয়েছে। সম্ভবতঃ বর্তমান বিজ্ঞান নির্ভীক, সাহসী এবং সত্যপ্রিয়, তা না হলে এমনিভাবে অকপটে ধর্মের অনুকুলে এক এক করে সাফাই গেয়ে চলবে কেন? বস্তুতঃ মহাবিশ্বে মহাজ্ঞানের এটাই স্বাভাবিক নিয়ম।

এখন যদি আমরা বক্ষমান অধ্যায়ের 'কুরআনিক' এবং 'বৈজ্ঞানিক' বক্তব্য থেকে মূল পয়েন্টগুলো বের করে পর পর সাজিয়ে নিই, তাহলে যা দাড়াবে তা হলো ঃ

কুরআনিক মূল পয়েন্টসমূহঃ

(১) প্রথম অবস্থায় যে মহান সত্ত্বা 'আল্লাহ্' দৃশ্য-অদৃশ্য অসংখ্য জগত একদম শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি এক সময় এগুলিকে তাঁর ইচ্ছামত ধ্বংস করে আবার প্রথম সৃষ্টির অনুকরণে একই পদ্ধতিতে নতুনভাবে সৃষ্টি করছেন, আর কাজটি তাঁর জন্য খুবই সহজ 'স্রষ্টা' হিসেবে।

(২) বর্তমান সৃষ্টিকে এমনভাবে ধ্বংস করা হবে যেমনিভাবে সরকারী অফিস আদালতে লিখিত দপ্তর গুটিয়ে নেয়া হয়, (ঠিক তেমনিভাবে গুটিয়ে আনা হবে জগতসমূহকে) ফলে অবশিষ্টরূপে কিছুই থাকবে না। সব শূন্য মানে (Singulairty) জমে যাবে।

(৩) একেবারে প্রথম সৃষ্টির অনুকরণেই দ্বিতীয়বার সৃষ্টিকর্ম পরিচালিত হবে, এটা স্রষ্টার ওয়াদা বিশেষ, তাই তিনি এটা অবশ্যই সম্পাদন করবেন। এর কোন ব্যতিক্রম ঘটবে না।

(৪) ধ্বংসের পরে নতুনভাবে সৃষ্টজগত নতুন চেহারায় আগমন করবে। পৃথিবীর বর্তমান আকার-আকৃতি, গড়ন সকল কিছুই পরিবর্তিত হয়ে এক বিরাট-বিশাল ময়দানে পরিণত হবে।

(৫) দ্বিতীয় বারের নতুন সৃষ্টিকার্য শুরু হবে এক বিকট শব্দ-নিনাদের (মহাবিস্ফোরনের) মাধ্যমে।

(৬) ঐ শব্দের পরে এক পর্যায়ে নূতন ভূ-পৃষ্ঠে সমস্ত মানুষই নতুনভাবে সৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে।

(৭) মহাবিশ্বের একমাত্র 'মহান স্রষ্টা ও প্রতিপালক 'আল্লাহ্' তাঁর সম্মানিত ফিরিশ্‌তাদেরকে সাথে নিয়ে ঐ মাঠে স্ব-সম্মানে উপস্থিত হবেন।

(৮) এই পৃথিবীতে প্রেরিত সকল নবী-রাসূলগণ এবং সাক্ষীগণ ও দলিল-পত্র (Document) সহ উপস্থিত হবেন।

(৯) সকল মানুষের ব্যাপারেই নিরপেক্ষভাবে 'আল্লাহ্ তায়ালা' বিচার ফায়সালা করবেন। কারও ওপর সামান্যতম জুলুমও করা হবে না।

(১০) উক্ত বিচার দিবসের দিন-ক্ষণ-সময় সবই মহান আল্লাহ্ আমাদের নিকট গোপন রেখেছেন। কেউ এর আগমন মুহূর্তটির কোন সঠিক সময় জানে না। তবে এর আগমনের পূর্বে পৃথিবীর সমগ্র পরিবেশে যে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হবে তার ভয়ে ক্রন্দন করা উচিত।

বৈজ্ঞানিক মূল পয়েন্টসমূহ ঃ

(১) এই মহাবিশ্বের মাঝে মহাজাগতিক নিয়মে সৃষ্ট সবচেয়ে বড় বস্তু হচ্ছে–গ্যালাক্সীসমূহ। প্রতিটি গ্যালাক্সীতে প্রায় গড়ে ২০,০০০ কোটি নক্ষত্র বাস করে। একটি গড় গ্যালাক্সীর ব্যাস হচ্ছে প্রায় এক লক্ষ (১০০,০০০) আলোকবর্ষ।

(২) বিজ্ঞান বর্তমান সময়ে প্রায় ১০০ কোটি গ্যালাক্সী দর্শন লাভ করার সুযোগ পাচ্ছে।

(৩) প্রায় ১৩,০০০ মিলিয়ন বা ১৩০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরত্ব (পৃথিবী থেকে) পর্যন্ত উক্ত ১০০ কোটি গ্যালাক্সী দেখা যাচ্ছে।

(৪) গ্যালাক্সীসমূহ মহাশূন্যে উড়ন্তবস্থায় বস্তুজগতের শেষপ্রান্তের দিকে ক্রমাগত ধাবিত হচ্ছে।

(৫) গ্যালাক্সীসমূহ ঘূর্ণনরত উড়ন্তবস্থায় ধাবিত হতে গিয়ে একদিকে যেমন পরস্পর পরস্পর থেকে কেবলই দূরে সরে যাচ্ছে, ঠিক তেমনি আবার একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের পরেই (৩.২৬ মিলিয়ন আলোকবর্ষ) এদের প্রস্থান গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৫০ মাইল (৭৫ কিঃ মিঃ) হারে ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(৬) গ্যালাক্সীসমূহের গতিবেগ অনবরত প্রতি ৩.২৬ মিলিয়ন আলোকবর্ষ পর পর প্রতি সেকেন্ডেই ৭৫ কিঃ মিটার হারে বৃদ্ধি ঘট্তে থাকায় পৃথিবী থেকে ১১,০০০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্ব পর্যন্ত পৌঁছার পর এদের গতিবেগ ক্রমান্বয়ে প্রায় আলোর গতির কাছাকাছি চলে যায়।

(৭) গ্যালাক্সীদের গতিবেগ বৃদ্ধির সাথে সাথে গতির অনুকুলে প্রচন্ড বাধাজনিত কারণে এদের মূল আকৃতি সঙ্কুচিত হতে থাকে। আলোর গতির সমান গতি লাভ করলে তখন আদি আকৃতি প্রায় 'শূন্যের কোঠায়' (Singularity) গমন করে।

(৮) তখন আদি আকৃতি শূন্যের কোঠায় গমন করলেও সমগ্র গ্যালাক্সীর 'ভর' বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়।

(৯) সমগ্র গ্যালাক্সী প্রায় শূন্যের কোঠায় মহাসুক্ষ্ম বিন্দুতে প্রবেশ করলে 'বিগ-ব্যাংগ' মডেলের ন্যায় বর্ণনাতীত চাপ ও তাপে শর্তপূরণ হয়ে এক প্রচন্ড বিস্ফোরণের অপেক্ষায় অপেক্ষমান থাকে।

(১০) ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হলে কল্পনাতীত তাপে এবং চাপে এক মহাবিস্ফোরন ঘটে আবার মহাসম্প্রসারন শুরু হয়ে (তাবৎ) বস্তুভর পূর্বের সৃষ্টি পদ্ধতি অনুসরণে নতুন নতুন জগতই শুধু সৃষ্টি করছে। বর্তমান বিজ্ঞান বিশ্ব উক্ত সিদ্ধান্তে প্রায় অটল বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। সেজন্য তারা এই পদ্ধতিকে নাম দিয়েছে 'Oscillating' পদ্ধতি (পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি পদ্ধতি)।

(১১) গ্যালাক্সীসমূহ সৃষ্টি হয়ে দীর্ঘ সময় পর ধ্বংস হওয়ার মধ্য দিয়ে পুনরায় সৃষ্টি হওয়ার যে প্রক্রিয়ার ছবি ও তথ্য ইতোমধ্যে বিজ্ঞানের

আবিষ্কারের মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তাতে স্পষ্টতই প্রমাণীত হচ্ছে যে আমাদের মহাবিশ্বে গ্যালাক্সীগুলো একটি জীবন পরিক্রমা (Life Cycle) অনুসরণ করছে।

সুতরাং বস্তুজগত ধ্বংস হয়ে পরজগত বা বিচারের মাঠ নতুনভাবে সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে কুরআন যে আগাম বার্তা এনেছে, বর্তমানে সেই 'পরকালে' নতুন জগত সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞান যে রিপোর্ট দিয়েছে তার নিজস্ব ষ্টাইলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে, তা যেন হুবহু 'কুরআনের' বক্তব্যকেই তুলে ধরেছে। বিজ্ঞান তার প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে 'পরকালে' নতুন জগত সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত যে বাস্তব মহাসত্যতায় মন্ডিত এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সত্যতা প্রমাণ করে বিশ্ববাসীর সামনে দিবালোকের আলোতে তুলে ধরলো, তা অস্বীকার করার কোন পথ আছে কি? জ্ঞানী সমাজের জন্য এতটুকু আবিষ্কার যথেষ্ঠ নয় কি?

আমরা অধ্যায়টির শুরুতেই বলেছিলাম যে, বর্তমান বিজ্ঞান পরকালের বিচারের মাঠ বা হাশরের মাঠ পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেই চলবে–'হাঁ', হাশরের মাঠ পর্যন্ত বিজ্ঞান যে পৌঁছতে পেরেছে আমরা তা আমাদের জ্ঞানচক্ষু দিয়ে সত্যি সত্যি দেখতে পেলাম। কিন্তু এর পর যেহেতু এক চুল পরিমান আর সামনে অগ্রসর হওয়ার মত ক্ষমতা পার্থিব বিজ্ঞান রাখে না। তাই পরবর্তী বিষয়গুলো আমরা 'কুরআনের' ঐশীবাণীর নির্দেশনায় এবং অর্জিত জ্ঞানের পরিসরে সমাধান করে নিতে পারবো, আশা করছি তাতে আমাদের বেশি বেগ পেতে হবে না। ইতোপূর্বেই আমরা 'কুরআনিক' আলোচনায় জানতে পেরেছি যে, হাশরের মাঠ তৈরী হয়ে যাওয়ার পর মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও প্রতিপালক 'আল্লাহ্‌র' নির্দেশে সমস্ত মানুষ আবার নতুনভাবে জীবন্ত হয়ে দাড়িয়ে যাবে। অতঃপর 'আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর গৌরব-গরিমা ও শ্রেষ্ঠত্বসহ উপস্থিত হয়ে সকল মানুষের পার্থিব জীবনের ইন্‌সাফভিত্তিক বিচারকার্য সম্পাদন করবেন। পরে হাশরের মাঠ থেকে বিচারে সফলতা লাভকারীগণ সরাসরি পুলসিরাতের ওপর দিয়ে পাড়ি জমায়ে দ্রুত জান্নাতে গিয়ে পৌঁছবেন আর বিচারে বিফলতা লাভকারীগণ অগ্নিময় শাস্তির স্থান জাহান্নামে গিয়ে প্রবেশ করবে। এক পর্যায়ে হাশরের মাঠ হয়ে যাবে শূন্য। বিচারকার্যের পর আর তার প্রয়োজন থাকছে না।

এখন উক্ত হাশরের মাঠ থেকে জান্নাত ও জাহান্নাম নামক দুটি আলাদা জগতে মানুষ কোন্ পদ্ধতিতে গমন করবে তার সম্ভাবনাময় দিক আমরা

পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে পর্যায়ক্রমে 'কুরআন' এবং 'বিজ্ঞানের' বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাপক আলোচনা করার প্রয়াস পাবো ইন্‌শাআল্লাহ্।

বক্ষমান অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়টি এবার 'এক নজরে' দেখে নিই।

এক নজর

আল্-কুরআন	বর্তমান বিজ্ঞান
(১) "তোমরাতো প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে অবহিত হইয়াছ, তবে কেন তোমরা অনুধাবন কর না?" (৫৬ঃ২২) "যিনি আদিতে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি উহার পূনরাবৃত্তি করিবেন।" (২৭ ঃ ৬৪) "উহারা কি লক্ষ্য করেনা, কিভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতঃপর পূনরাবৃত্তি ঘটান? ইহাতো আল্লাহ্র জন্য সহজ।" (২৯ঃ১৯) "ইহারা কি লক্ষ্য করেনা যে আল্লাহ্, যিনি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি উহাদিগের অনুরূপ সৃষ্টি করিতে সক্ষম। তিনি উহাদিগের জন্য স্থির করিয়াছেন একটি কাল, ইহাতে সন্দেহ নাই।" (১৭ ঃ ৯৯)	(১) মহাকালের হাত ধরে বিজ্ঞান পা-.পা করে অগ্রসর হলেও বর্তমান সময় পর্যন্ত অসংখ্য বিষয়ের 'রহস্য ও সঠিক তথ্য' উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে। এরমধ্যে আমাদের মহাবিশ্বের এবং এর অভ্যন্তরে দৃশ্য-অদৃশ্য সকল প্রকার মহাজাগতিক বস্তু সমূহের অধিকাংশের সৃষ্টি, কর্মতৎপরতা ও চূড়ান্ত পরিনতির অসংখ্য তথ্য উদ্‌ঘাটন করে মানবমন্ডলীর জ্ঞান রাজ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রথম দিকে মহাবিশ্বের সৃষ্টি বিষয়ক নানান ধরনের প্রস্তাব দীর্ঘদিন পর্যন্ত মানবমন্ডলীকে বিভ্রান্ত করতে সমর্থ হলেও ১৯৩৩ সালে বেলজিয়াম জগত বিজ্ঞানী 'জর্জ ল মেইটর' কর্তৃক অফিসিয়ালীভাবে সৃষ্টিতত্ত্বঃ বিগ-ব্যংগ (Big Bang) উত্থাপিত হয়ে ১৯৪০ সালে বিজ্ঞানী 'মিঃগামো' কর্তক ম্যাথমেটিক্যালী মহাবিষ্ফোরন পরবর্তী অবশিষ্ট উদ্বৃত্ত থেকে যাওয়া তাপীয় অবস্থা (Back

ground) ৩k (কেলভীন) নির্দেশীত হয়ে এবং পরবর্তীতে ১৯৬৫ সালে দু'জন আমেরিকান বিজ্ঞানী 'রবাট উইলসন' ও 'আরনেজ প্যানজাইজ' ২.৭৩k তাপ মহাশূন্যের সর্বত্র এখনো যে বিরাজমান তা হাতে নাতে বাস্তবভাবে প্রমান করে সৃষ্টিতত্ত্বঃ 'বিগ-ব্যাংগ'কে সত্য ঘটনা হিসেবে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা করেন . (দেখুন কুরআন সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিগ-ব্যাংগ)।

সৃষ্টিতত্ত্বঃ 'বিগ-ব্যাংগ' প্রস্তাবের ভাষ্য হচ্ছে কোন এক অজানা মহা আলোক শক্তির উৎস হতে বর্ণনাতীত পরিমান শক্তির প্রচন্ড ঘনায়নের চূড়ান্ত মুহূর্তে যখন তাবৎ শক্তি প্রায় $১০^{-৩৪}$ সেঃমিঃ এক মহাসুক্ষ্ম বিন্দুতে (Singularity-তে) উপনীত হয়, তখন ১০^{-43} সময়ে (প্রায়) মহাবিষ্ফোরন ঘটে গিয়ে ঐ মহাসুক্ষ্ম বিন্দুটি মুহূর্তেই বর্ধিত হয়ে মহাসম্প্রসারনের নেশায় দ্রুত চতুর্দিকে ছুট্তে থাকে, যা এখনো বিরাজমান। প্রায় ১৫ বিলিয়ন বছর পূর্বে ঘটে যাওয়া বিষ্ফোরন পরবর্তী অগ্নিগোলক থেকেই ক্রমান্বয়ে গ্যালাক্সী, কোয়াসার, নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহ ইত্যাদি সৃষ্টি হয়ে চেহারায় উপনীত হয়।

(২) "আল্লাহ্‌র আদেশ আসিবেই সুতরাং উহা ত্বরান্বিত করিতে চাহিও না।" (১৬ ঃ ১) "সেই দিন আমি আকাশ মন্ডলীকে গুটাইয়া ফেলিব যেভাবে লিখিত দফতর গুটানো হয়।" (২১ঃ১০৪)	(২) বিজ্ঞান বিংশ শতাব্দিতে মহাবিশ্বের সৃষ্টি তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করার পর এর অভ্যন্তরে মহাজাগতিক বস্তুসমূহের শেষ পরিনতি বিষয়ক ধ্বংস ও বিপর্যয় বিভিন্নভাবে পর্যবেক্ষনে নির্ণয় করতে সক্ষম হচ্ছে। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত মোট ৮টি পদ্ধতির মধ্যে 'গ্যালাক্সীর শূন্যের কোঠায় গমন' পদ্ধতিটি মহাবিশ্বের মহাশূন্যতায় পরিভ্রমনরত গ্যালাক্সীদের জন্য এক অবধারিত ব্যবস্থা। যে মহাজাগতিক কঠিন ধ্বংসীয় ব্যবস্থা থেকে কোন গ্যালাক্সীই রেহাই পাচ্ছে না এবং পাবেও না। যদিও বাকী ৭টি ধ্বংসীয় ব্যবস্থা থেকে বাঁচার সম্ভাবনা আছে। বস্তু জগতের প্রান্ত:সীমায় 'গ্যালাক্সী' দ্রুত গতির কারনে মহাসঙ্কোচনের ভিতর দিয়ে প্রায় 'শূন্যের কোঠায়' গমনে বাধ্য হলে ঐ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট গ্যালাক্সীকে গুটানো বলাই যুক্তিযুক্ত।
(৩) "যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করিয়াছিলাম সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করিব, প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি ইহা পালন করিবই।" (২১ ঃ ১০৪) "যে দিন জমিনকে পরিবর্তন করিয়া ভিন্নরূপ জমীনে পরিনত করা হইবে এবং তদ্রুপ করা হইবে ঐ	(৩) বস্তুঃজগতের প্রান্তঃসীমায় গড়ে প্রায় ২০,০০০ কোটি নক্ষত্র সহ কোন গ্যালাক্সী শূন্যের কোঠায় (Singularity-তে) গমনে বাধ্য হলে ঐ মহাসুক্ষ্ম বিন্দুতে (প্রায় $১০^{-৩৪}$ সেঃমিঃ) বস্তুর ভর, চাপ ও তাপ অস্বাভাবিক ও অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে অসীম স্কেলে চলে যাবে।

আকাশ মন্ডলীকেও।" (১৪ ঃ ৪৮) "নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীর সমুদয় বস্তুকে একটি পরিষ্কার ময়দানে পরিনত করিব।" (১৮ ঃ ৮)	ফলে মুহূর্তেই উক্ত মহাসুক্ষ্ম বিন্দুটি মহাবিষ্ফোরন ঘটিয়ে 'বিগ-ব্যাংগ' মডেলের ন্যায় একই পদ্ধতিতে আবার নতুন অসংখ্য জগত সৃষ্টি করবে। যে জগতগুলো তাদের নতুনভাবে জীবন পরিক্রমার সূচনা করবে এবং আকৃতিতে সমতল আর সমতল শুধু ময়দানে পরিনত হবে।
(৪) ইহাতো কেবল একটি বিষ্ফোরনের শব্দ।" (৭৯ ঃ ১৩) "অতঃপর আবার সিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে, তৎক্ষনাত উহারা দন্ডায়মান হইয়া তাকাইতে থাকিবে।" (৩৯ ঃ ৬৮) "তখনই ময়দানে উহাদিগের আবির্ভাব হইবে।" (৭৯ ঃ ১৪) "তোমার প্রতিপালক উপস্থিত হইবেন এবং সারিবদ্ধভাবে ফিরেশ্‌তাগণও।" (১৪ ঃ ৪৮) "আমলনামা পেশ করা হইবে এবং নবীগণকে ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হইবে, আর সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হইবে এবং তাহাদিগের প্রতি জুলুম করা হইবে না।" (৩৯ ঃ ৬৯)	(৪) বস্তু জগতের তথা সমগ্র গ্যালাক্সীর মহাসুক্ষ্ম বিন্দুতে যবনিকাপাত ঘটার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত মুহূর্তে 'বিগ-ব্যাংগ' বিষ্ফোরনের অনুরূপ শর্ত পূরন হওয়ার সেই বিন্দুটিতেও তুলনাবিহীন 'প্রচন্ডশব্দে' মহাবিষ্ফোরন ঘটবে। অতঃপর পূর্বের ন্যায় সময়ের ব্যবধানে তৈরী হবে নতুন জগত, যে জগত গুলোতে পুনরায় প্রানের আবির্ভাব মহাজাগতিক নিয়মে অবশ্যই সম্ভব, যেমনিভাবে এ পৃথিবীতেও মহাজাগতিক নিয়মে প্রানের স্পন্দন একদিন শুরু হয়েছিল।
(৫) "ইহার চরম জ্ঞান আছে তোমার প্রতিপালকের নিকটই।" (৭৯ ঃ ৪৭) "তোমরা কি এই কথায়	(৫) বিজ্ঞানজগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ এবং অনুসন্ধানের মাধ্যমে গ্যালাক্সীদের প্রায় শূন্যের কোঠায় গমন বিষয়ক রহস্য কিছুটা উম্মোচিত করতে সমর্থ

বিস্ময়বোধ করিতেছ এবং হাসি-ঠাট্রা করিতেছ ? ক্রন্দন করিতেছ না? (৫৩ ঃ ৫৭)	হলেও শত-সহস্র কোটি-কোটি মাইলের বিরাট বিশাল দূরত্বের কারনে আমাদের গ্যালাক্সীর শূন্যের কোঠায় গমনের সঠিক দিন, ক্ষণ ও সময় কিছুই জানে না। তবে সমগ্র গ্যালাক্সী জুড়ে ক্রমান্বয়ে যে ধারনাতীত ভয়ংকর বিপর্যয় শুরু হবে তাতে একমত এবং ঐ বিপর্যয় ও ধ্বংস যে মানব জ্ঞানে সবচেয়ে ভয়াবহ হবে সে ব্যাপারে ইতোমধ্যেই শঙ্কা ব্যক্ত করেছে। তাই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে কেউ কেউ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে প্রশ্ন করছেন- 'Where are we going?'

অতএব ১৪০০ বৎসর থেকে আল্-কুরআন পৃথিবী নামক এই গ্রহের মানবমন্ডলীকে কিয়ামাত ও পরবর্তীতে আবার নতুন জগত সৃষ্টির মাধ্যমে পুনর্জীবন সম্পর্কে যে বক্তব্য শুনিয়ে আসছিল, বিজ্ঞানের প্রযুক্তিগত সার্বিক উন্নতি আজ কুরআনের সেই বক্তব্যগুলিকে একশতভাগ সত্যে প্রমান করে বিবেকসম্পন্ন দোদল্যমান মানুষগুলোকে ধ্বংসের পথ থেকে রক্ষা পেয়ে সত্যিকার মঙ্গল ও কল্যানের পথে পরিচালিত হওয়ার বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে।

বিজ্ঞান ও তার প্রমানীত আবিষ্কারসমূহ যদি অস্বীকার করা না যায়, তাহলে বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে কুরআনের দাবীকৃত হাশরের মাঠ তৈরী ও পূনর্জীবন সম্পর্কিত তথ্য উদ্‌ঘাটিত ও তা যে একশতভাগই সম্ভব এ কথা প্রমানীত হওয়ার পর আর কি অমান্য করার কোন সুযোগ আছে? নিরেট সত্যকে অস্বীকার করে কি কল্যানের ভাগী হওয়া যায়?

সুতরাং বর্তমান বিজ্ঞান বিশ্বে 'পরকাল ও পুনর্জীবন' অবিশ্বাস করার যুক্তি নির্ভর ও বিজ্ঞান সম্মত সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় নীরবে তা মেনে নিয়ে পরকাল ভিত্তিক সামগ্রিক জীবন নির্বাহ করাই এখন সময়ের দাবী।

‘পরকালে ডকিং ব্যবস্থা’

আল্-কুরআনঃ

“যিনি আদিতে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনিই উহার পুনরাবৃত্তি করিবেন।” (২৭ ঃ ৬৪)

“সেইদিন জমিনকে পরিবর্তন করিয়া ভিন্নরূপ জমীনে পরিণত করা হইবে এবং তদ্রুপ করা হইবে ঐ আকাশমন্ডলীকেও।” (১৪ ঃ ৪৮)

“প্রত্যেকেই ভাসমান অবস্থায় নিজ নিজ কক্ষপথে (মহাশূন্যে নিজস্ব রুটে) পরিভ্রমণরত।” (৩৬ ঃ ৪০)

“বিদ্রোহীদের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।” (৬৭ ঃ ৫)

“নিশ্চয় জাহান্নাম ওঁত পাতিয়া রহিয়াছে, সীমা লংঘনকারীদিগের প্রত্যাবর্তনস্থল।” (৭৮ ঃ ২১-২২)

“সেইদিন জাহান্নামকে টানিয়া নিকটে আনা হইবে।” (৮৯ ঃ ২৩)

“আর জান্নাতকে নিকটস্থ করা হইবে মুত্তাকীদিগের।” (৫০ ঃ ৩০)

“এবং তোমাদিগের প্রত্যেকেই তাহা (পুলসিরাত) পার হইয়া যাইবে, ইহা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।” (১৯ ঃ ৭১)

“পরে আমি মুত্তাকীদিগকে উদ্ধার করিব এবং জালিমদিগকে সেথায় নতজানু অবস্থায় রাখিয়া দিব।” (৯ ঃ ৭২)

“সেই দিন তুমি দেখিবে মুমিন নর-নারীগণকে, তাহাদিগের সম্মূখভাগে ও দক্ষিণপার্শ্বে (ডান দিকে) তাহাদিগের নূর (জ্যোতি) দৌড়াইতে থাকিবে।” (৫৭ঃ১২)

“তাহাদিগের নূর (জ্যোতি) তাহাদিগের সম্মূখে ও দক্ষিণপার্শ্বে ধাবিত হইবে, তাহারা বলিবে, হে আমাদিগের প্রতিপালক ! আমাদিগের নূরকে পূর্ণতা দান কর এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর। তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।” (৬৬ঃ৮)

"সেইদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী মু'মিনদিগকে বলিবে, তোমরা আমাদিগের জন্য একটু থাম, যাহাতে আমরা তোমাদিগের 'নূরের' কিছু গ্রহণ করিতে পারি। বলা হইবে তোমরা তোমাদিগের পিছনে ফিরিয়া যাও এবং আলোর সন্ধান কর।" (৫৭ঃ১৩)

আমাদের সমাজে এক শ্রেনীর শিক্ষিত ও জ্ঞানী-গুনীজন পরকালের বিচার দিবস, জান্নাত-জাহান্নাম ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যবস্থাপনাকে মানতে চান না। তাদের যুক্তি হচ্ছে-'মহাবিশ্বে যেহেতু সকল কিছুই ভাসমান অবস্থায় প্রচন্ড গতি নিয়ে পরিভ্রমণে রত, সেখানে হাশরের মাঠের সাথে জান্নাত-জাহান্নাম এবং পুল্‌সিরাতের সংযোগ সাধন কিভাবে ঘটানো হবে ? তাদের কথামত মহাশূন্যে প্রতিটি বস্তুই তাদের নিজস্ব গতিতে ভিন্ন-ভিন্ন রুটে মহাজাগতিক অদৃশ্য নিয়মে ছুটে যাচ্ছে বিধায়-পরকালে হাশরের মাঠ, জান্নাত-জাহান্নাম এবং পুলসিরাত উক্ত চারটি বস্তুকে মহাশূন্যে একত্রিত করা 'অসম্ভব এবং অবাস্তব।' আর এই অজুহাত দেখিয়ে তারা 'পরকাল' মানতেই রাজী নন। আমাদের বক্ষমান অধ্যায়টি 'কুরআন' এবং 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের' আলোকে তাদের সেই অবোধগম্য চিন্তা-ভাবনাকে বোধগম্যের পরিবেশে ফিরিয়ে আনার জন্যই বিশেষভাবে উৎসর্গীত হয়েছে। এখানে আমাদের একটি বিষয় খুব সতর্কতার সাথেই মনে রাখতে হবে যে, "আল্লাহ্‌র বাণীর কোন পরিবর্তন নাই। ইহা এক মহাসাফল্য" (১০ঃ৪৬)।

তাই কুরআনের কোন 'বিজ্ঞান বিষয়ক ঐশীবাণী' বুঝে না আসলে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে, ধৈর্য্য ধরতে হবে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে ঐ জাতিয় কিছু এ পর্যন্ত আবিষ্কার বা উদ্‌ঘাটন হয়েছে কি-না তা অনুসন্ধান করতে হবে। যদি কিছু পাওয়া না যায় তাহলেও এর বিরোধিতা করা যাবে না, তখন ধৈর্যের সাথে শুধু অপেক্ষাই কব্রতে হবে। কেননা আল্লাহ্‌র বাণীর যেহেতু কোন পরিবর্তন নেই, এটা চিরন্তন ও শ্বাশত কথা, তাই হয়তোবা বিশ্বপ্রতিপালক ঐ বিষয়ে তখনো কোন ছাড় দেননি। আর তাই মানবসমাজ তখন পর্যন্ত বিষয়ের সত্যতা প্রমান করতে পারেনি। বিশ্বপ্রতিপালকের সেই অমোঘ বাণীটির প্রতি একবার লক্ষ্য করুন- "প্রত্যেক সংবাদ প্রকাশের একটা নির্দিষ্ট সময় রহিয়াছে" (৬ঃ৬৭)। অতএব, কোন বিষয়ের জ্ঞান স্রষ্টার পক্ষ থেকে পৃথিবীতে আগমন না করা পর্যন্ত ঐ বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করে প্রকৃত অবস্থার বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করা অন্ততঃ জ্ঞানবানদের জন্য কখনোই শোভনীয় হতে পারে না। কারণ পরবর্তীতে

যখন এর সত্যতা দিবালোকের আলোতে প্রকাশিত হয়ে প্রমাণিত হয় তখন তাদেরকে লজ্জিত হতে হয়। বিগত একশত বৎসরে বিশ্বের অনেক নামী-দামী বিজ্ঞানী এবং পন্ডিত ব্যক্তিরা এ ধরনের অবস্থার শিকার হয়ে দারুণভাবে লজ্জিত হয়েছেন, এর ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে। তাই কোন বিষয় কখনও কারও বুঝে আসে না বলেই এটাকে অস্বীকার করা, এর বাস্তবতাকে প্রত্যাখ্যান করা চরম বোকামী ছাড়া আর কি বা বলা যেতে পারে ! জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্তমান অগ্রযাত্রায় আমরা আশা করছি ১৪০০ বৎসর থেকে 'কুরআনের' পেশকৃত পরকালীন ব্যবস্থার বাস্তবতা ও সম্ভাবনা ইহ্‌জগত থেকে বাস্তবভাবেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো।

অধ্যায়ের শুরুতে উদ্ধৃত ঐশীবাণীসমূহের মূলবক্তব্য হচ্ছে–মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও প্রতিপালক মহান 'আল্লাহ্' শুরুতে এ মহাবিশ্ব একাই সৃষ্টি করেছেন এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে এর পুনরাবৃত্তি তিনিই করে থাকেন। জীবনময় জগতের 'কিয়ামাত' ঘটাবার পর এর পৃষ্ঠদেশের জবাবদিহিমূলক প্রাণীদের সুষ্ঠ বিচারকার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে পরবর্তীতে সৃষ্ট জগতকে তিনি নতুনভাবে নতুন ডিজাইনে তৈরী করেন। যেহেতু সে জগতটির উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বিচার ও পুরস্কার বিতরণীমূলক কর্মকান্ডেই সীমাবদ্ধ, এর অন্য কোন উদ্দেশ্য হয় না, তাই 'হাশরের' ময়দানটিকে একেবারে সমতল করে খোলা মাঠে পরিণত করা হবে। আকাশীয় ব্যবস্থাও বর্তমানের ন্যায় না হয়ে বরং ভিন্নরূপে আবির্ভূত হবে।

আমাদের এই মহাবিশ্বের সীমানার মধ্যেই পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, গ্যালাক্সীসমূহ, জান্নাত, জাহান্নামসহ সবই বিরাজ করছে। এক কথায় সপ্তাকাশের মধ্যেই সব বিরাজমান। স্রষ্টা তাঁর নিজের পরিকল্পনাতেই এর মধ্যে দুটি ভাগ করেছেন। একভাগ হচ্ছে ইহ্‌জগত এবং অপর ভাগ হচ্ছে পরজগত। আমরা এখন ইহ্‌জগতে আছি এবং বিজ্ঞানীগণ টেলিস্কোপ দিয়ে পৃথিবী থেকে যতটুকুনই দেখতে পাচ্ছেন তাও ইহ্‌জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পরজগত কোন অবস্থায়-ই ইহ্‌জগত থেকে দেখা যাবে না এবং দেখা না যাওয়ার মত করেই এটা সৃষ্টি করা হয়েছে (এ বিষয়ে যথাস্থানে আমরা আলোচনা পাব ইন্‌শাআল্লাহ্)। এখন এই ইহ্‌জগত এবং পরজগতে স্রষ্টা যা কিছুই সৃষ্টি করেছেন, তার সকল কিছুই বিস্ময়কর ব্যবস্থ্বপনার মধ্য দিয়ে খুঁটিবিহীন অবস্থায় ভাসমান ও গতিশীল রেখেই চূড়ান্ত ভারসাম্য আনয়নের মাধ্যমে টিকিয়ে রেখেছেন। দৃশ্যমান বস্তুজগতের নক্ষত্র, গ্রহ, ও

উপগ্রহের মত পরজগতে জান্নাত ও জাহান্নামও এদের ন্যায় মহাশূন্যে ভাসমান ও চলমান। ফলে উভয়জগতে সৃষ্ট সকল কিছুই তাদের স্রষ্টার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট নিয়মে নির্ধারিত করে দেয়া কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করে চলেছে। ইহ্জগতে আমরা তা বাস্তবভাবে দেখতে পাচ্ছি বিধায় পরজগতেও অনুরূপ হবে বলে বিশ্বাস করছি। 'কুরআন' আমাদেরকে সেই ধারণাই দিচ্ছে।

পৃথিবীতে বিদ্রোহীতামূলক আচরন যারা করছে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা স্বরূপ অগ্নিময় 'জাহান্নাম' প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। পরকাল আগমন করা মাত্র 'জাহান্নাম' কে বিচারের জন্য সৃষ্ট নতুন 'হাশরের মাঠের' নিকটে আনা হবে। একইভাবে পূর্বেই সৃষ্ট 'জান্নাতকেও' নিকটে আনা হবে। হাশরের মাঠ থেকে মানুষেরা তখন বাস্তব চোখে 'জান্নাত ও জাহান্নামকে' দেখতে পাবে। অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা সকল মানুষের পার্থিব জীবনের হিসেব গ্রহণ করবেন এবং ফায়সালা শুনিয়ে দিবেন।

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফায়সালা শুনিয়ে দেবার পর জাহান্নামে প্রবেশ করার জন্য অপরাধীরা এবং জান্নাতে গমন করার জন্য বিশ্বাসীরা পুল্‌সিরাত নামক সেতুর ওপর দিয়ে যেতে থাক্‌বে, যে পুল্‌সিরাত জাহান্নামের ওপর দিয়ে তৈরী হয়ে এক প্রান্ত 'হাশরের মাঠের' সাথে এবং অপরপ্রান্ত 'জান্নাতের সাথে' ভিড়ানো থাকবে। অর্থাৎ, 'হাশরের মাঠের' সাথে 'জাহান্নাম ও পুল্‌সিরাত' উভয়ই ভিড়ানো থাকবে, আর 'জান্নাত' থাকবে 'জাহান্নামের' অপরদিকে, তবে সংযোগ থাকবে শুধু পুলসিরাতের অপর প্রান্তের সাথে। আল্লাহ্ তায়ালার সিদ্ধান্ত এবং ব্যবস্থা অনুযায়ী পুল্‌সিরাত নামক সেতুর ওপর দিয়ে গমন করার সময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 'নুর' (আলো) আগমন করে বিশ্বাসীদেরকে জান্নাতে দ্রুত গতিতে পৌঁছাবার জন্য তাদের সম্মূখে এবং ডানপার্শ্বে আগে-আগে দৌঁড়াতে থাকবে। কিন্তু তারা চলার পথে পুলসিরাতের নীচেই অবস্থানরত ভয়ংকর অগ্নিকুন্ড জাহান্নামের ভয়ার্ত রূপ দেখে ভয়ে আল্লাহ্‌কে ডেকে বলবে তাদের নূরের উজ্জলতা যেন আরও বাড়িয়ে দেয়া হয়। যদিওবা 'জাহান্নামের' তীব্রতা বা রুদ্ররোষ জান্নাতীদের কোন ক্ষতি-ই করতে পারবে না।

অপরদিকে অপরাধীরা পুল্‌সিরাতের ওপর উঠে অন্ধকারে কোন পথই পাবে না তা পার হয়ে যাওয়ার। বিশ্বাসীদেরকে ডাকতে থাকবে তাদের থেকে সামান্য হলেও একটু আলোর ব্যবস্থা পাওয়ার জন্য। কিন্তু সে আলো

তারা পাবে না; বরং তাদেরকে কেবল পিছনের দিকেই ফিরিয়ে দেয়া হবে। অপরাধীরা ব্যর্থতার চরম গ্লানী বহন করতে থাকবে। এক পর্যায়ে আল্লাহ্ তায়ালা সকল বিশ্বাসীদেরকে অনন্ত নেয়ামতে পরিপূর্ণ 'জান্নাতে' স্ব-সম্মানে পৌঁছিয়ে দেবেন। আর অপরাধীদেরকে পুলসিরাতের নীচে অনন্ত অগ্নিকুন্ড 'জাহান্নামে' নিক্ষেপ করবেন। অতঃপর জান্নাতিরা-জান্নাতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক দীর্ঘ শান্তিময় জীবন লাভ করবে এবং জাহান্নামীরাও জাহান্নামে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক দীর্ঘ শাস্তিময় জীবন লাভ করবে। উল্লেখিত পবিত্র ঐশীবাণীসমূহের এই হচ্ছে মূলবক্তব্য।

উল্লেখিত বক্তব্যে আমাদের সামনে 'পরকালের' প্রথম ধাপের বিচার বিষয়ক অবস্থার একটি চিত্র মোটামুটিভাবে ফুটে উঠেছে, যে চিত্রে আমরা পরকালীন চারটি মহাজাগতিক বস্তু তথা–হাশরের মাঠ, জাহান্নাম, জান্নাত এবং পুল্‌সিরাত কে পরস্পর পরস্পরের সাথে সুষ্ঠুভাবে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে মহানস্রষ্টা 'আল্লাহ্' তায়ালার আদেশ বাস্তবায়ন করতে অন্তর চক্ষুদিয়ে আপাতত দেখতে পেলাম, পরজগতে ইন্‌শাআল্লাহ্ আমরা সবাই প্রত্যক্ষ্যভাবেই তা অবলোকন করতে পারবো।

এখন কথা হলো–হাশরের মাঠ (একটি গ্রহ), জাহান্নাম (অগ্নিময় নক্ষত্রের মত প্রকান্ড অগ্নিপিন্ড), জান্নাত (জীবনময় ও বর্ণনাতীত সৌন্দর্যের সমারোহে পরিপূর্ণ বিশাল এক গ্রহ) এবং পুল্‌সিরাত (একটি সেতু বা জেট) আমাদের মহাবিশ্বের মাঝে পরজগতে মহাজাগতিক বস্তুসম্ভার হিসেবে সবাই অন্যান্যের মতই নিজ নিজ গতিবেগে নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণরত। এ অবস্থায় ওরা কিভাবে কোন পদ্ধতিতে উক্ত সংযোগ সাধন করবে এবং কার্যশেষে কিভাবে মহাশূন্যে উড়ন্ত অবস্থায় আবার পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে স্ব-স্থানে ফিরে যাবে, কুরআনের দাবীকৃত এই বিষয়টি আমরা বর্তমান বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণ করতে চাই।

বিজ্ঞানঃ

সকলক্ষেত্রেই বিজ্ঞান তার কৃতিত্বের ছাপ রেখে উর্ধ্বশ্বাসে দ্রুতগতিতে দৌড়ানো ঘোড়ার ন্যায় কেবলই সামনের দিকে দৌঁড়াচ্ছে। ফলে ভূ-পৃষ্ঠের মানব মন্ডলীর জ্ঞানবানরা তাদের ইহ্জাগতিক ও পারলৌকিক অনেক অমিমাংশীত বিষয়ের ক্রুটিমুক্ত, জ্ঞানপূর্ণ ও স্বচ্ছ সমাধান হাতের মুঠোয় পেয়ে ব্যাপকভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। আমাদের বক্ষমান অধ্যায়টিও অনুরূপ একটি জটিল বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত। বেশ কিছু দিন থেকে

বর্তমান বিজ্ঞান এ বিষয়ে এত বেশি সাফল্য বয়ে এনেছে যে, ‘পরকালীন ডকিং ব্যবস্থা, অর্থাৎ ‘হাশরের (বিচারের) মাঠ, জান্নাত-জাহান্নাম, এবং পুল্‌সিরাতের মধ্যে মহাশূন্যে মহাজাগতিক বস্তুরূপে উড়ন্ত অবস্থায় পরস্পর পরস্পরের সাথে সংযোগ স্থাপন করা যে কঠিন কোন ব্যাপার নয় বরং সহজ এবং সম্ভব তা খুবই আশ্চর্যজনকভাবেই প্রমাণ করে চলেছে। ধন্যবাদ জানাতে হয় বিজ্ঞানকে এ জন্য যে, পরকালীন দৃশ্য দর্শন লাভ করতে না পারলেও ইহ্‌কালীন বিভিন্ন কর্মসূচীকে বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরকালীন ব্যবস্থাসমূহের একশত ভাগ সম্ভাব্যতাকে প্রমাণ করে সমগ্র মানবজাতিকে বাস্তব ‘সত্য’ অথচ ‘অদৃশ্য’ এক অনন্ত জীবনের দিকে দৃঢ় পদে কল্যাণের প্রত্যাশায় এগিয়ে যেতে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করছে।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ, ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল রাশিয়ান নভোচারী ‘ইউরি গ্যাগারিন’ ভূ-পৃষ্ঠের মানবমন্ডলীর মধ্যে সর্বপ্রথম রকেটের সাহায্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসার পর মহাকাশ অভিযান নিয়ে মানবসমাজে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়। ‘রাশিয়া’ এবং ‘আমেরিকা’ এ ব্যাপারে স্বল্প সময়ে বেশ এগিয়ে যায়। আমরা লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন সময় ‘চন্দ্র বিজয়’ অভিযানে Orbiter Transfer Vehicle থেকে Luner Lander বিচ্ছিন্ন হওয়া ও কর্মশেষে আবার উড়ন্তবস্থায় সংযোজন হওয়াসহ বহুবার ‘Space Craft’ ও ‘Space Station’ এর মধ্যেও মহাকাশে পরস্পর সংযোজন ও প্রয়োজন শেষে উড়ন্ত অবস্থায় আবার বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনাও পৃথিবীবাসী হিসেবে আমরা বাস্তব চোখে দর্শন লাভ করতে সমর্থ হয়েছি। এ সম্পর্কীয় অসংখ্য ছবি মহাকাশ থেকে ধারণ করা হয়েছে। যার কয়েকটি সুহৃদ পাঠকের অবগতির জন্য এখানে মেলে ধরেছি। উল্লেখিত সকল কাজগুলিই ভূ-পৃষ্ঠে নির্মিত Mission Control থেকে নিয়ন্ত্রন করা হয়েছে বিজ্ঞতার সাথে।

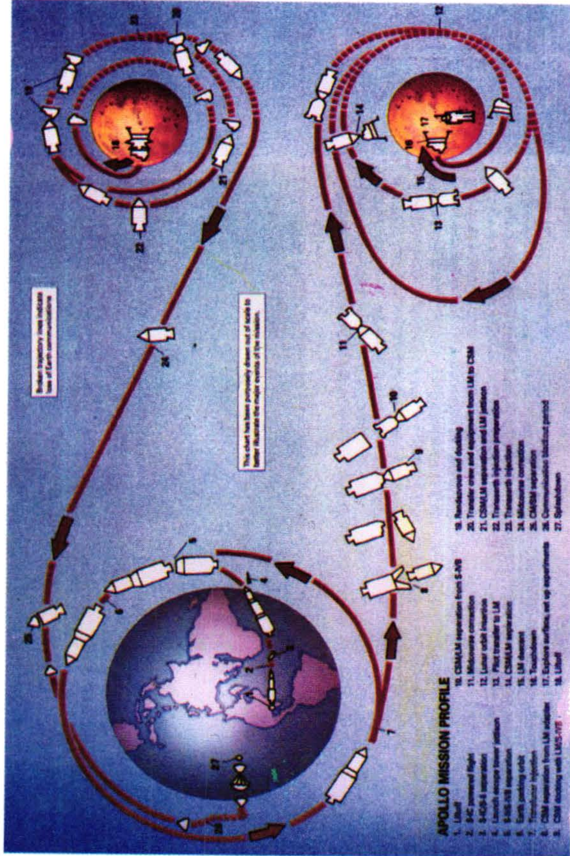
’৭০-র দশকে আমেরিকা মহাকাশ গবেষনায় ‘ভাসমান’ গবেষণাগার হিসেবে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করে ‘স্কাইল্যাব’ (Skylab)। অপর দিকে রাশিয়া ’৮০-র দশকে পৃথিবী থেকে ‘২০০’ মাইল উপরে পৃথিবীর কক্ষপথে ‘ভাসমান’ গবেষণাগার ‘Mir’ কে স্থাপন করে। আমেরিকান গবেষনাগার ‘Skylab’ ১৯৭৯ সালে মেয়াদ উত্তীর্ণের কারণে পৃথিবীর আবহমন্ডলে ধ্বংস করার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এতে অসংখ্যবার গবেষণামূলক কাজের ব্যাপারে মালামাল এবং নভোচারীদের নিয়ে মহাকাশযান যাতায়াত



চিত্রঃ ১৫১

"তোমরা ধাপে ধাপে অবশ্যই (জ্ঞান-বিজ্ঞানে) উন্নতির প্রসার লাভ করিবে।"
(৮৪ ঃ ১৯)

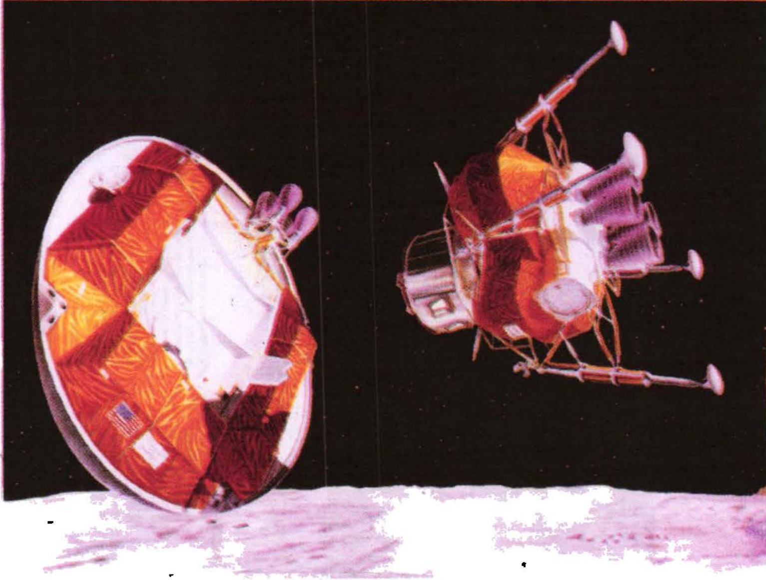
- ১৯৬১ সালের ১২-ই এপ্রিল রাশিয়ান নভোচারী 'ইউরি গ্যাগারিন' ভূ-পৃষ্ঠ থেকে রকেটযোগে মহাশূন্যে বেরিয়ে গিয়ে সর্বপ্রথম পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে বিংশ শতাব্দিকে যুগের চাকায় অবিস্মরণীয় করে রাখে। এর ফলে মহাকাশের মহাশূন্যতায় মানব সমাজের বিভিন্ন প্রকার অভিযান ও কর্মকান্ড যে সম্ভব তা পরীষ্কারভাবে ফুটে উঠে। পরবর্তীতে হয়েছেও তাই। আজকের দিন পর্যন্ত এই প্রায় ৪০টি বৎসরে বিজ্ঞান বিশ্ব হাজারো রকেট, স্যাটেলাইট, ভাসমান গবেষণাগার ইত্যাদি তেরী করে পৃথিবীর চারপাশে মহাশূন্যের পরিবেশকে নানান ধরনের তৎপরতায় জমজমাট করে ফেলেছে।



চিত্রঃ ১৫২

"এই নভোমন্ডল ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সমস্তকেই তিনি স্বীয় পক্ষ হইতে তোমাদিগের জন্য করিয়াছেন আয়ত্ত্বাধীন, নিঃসন্দেহে গভীর চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রহিয়াছে অনেক শিক্ষনীয় নিদর্শন।" (৪৫ ঃ ১৩)

- চন্দ্র বিজয় অভিযানে মহাশূণ্যে Orbiter Transfer vehicle ও Luner lander কে একাধিক বার ভাসমান ও উড়ন্তবস্থায়-ই প্রয়োজনমত বিচ্ছিন্ন ও সংযোজন হতে হয়েছে নির্দিষ্ট করা মাপ ও গতির উপর ভিত্তি করে।



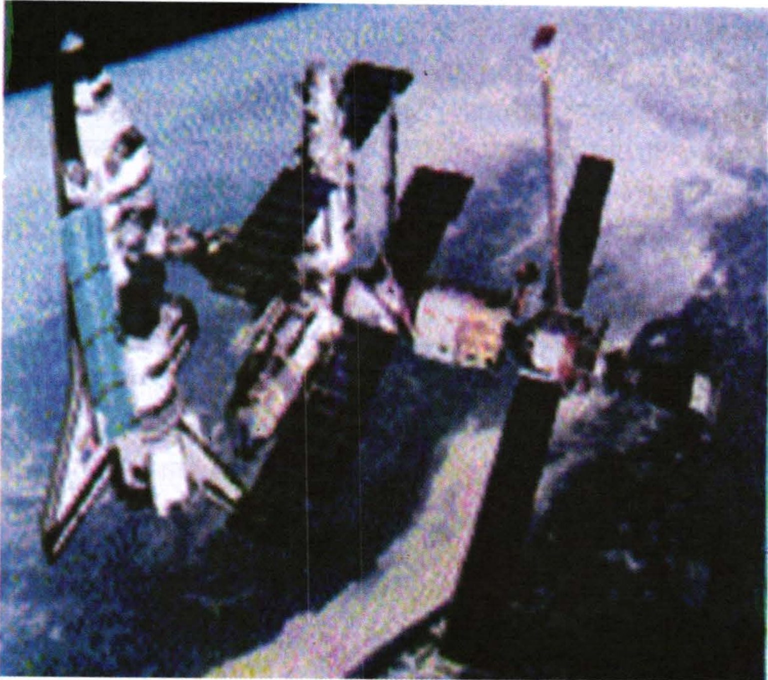
চিত্রঃ ১৫৩

"তিনিই মানুষকে অবহিত করিয়াছেন, ইতিপূর্বে সে যাহা জানিত না।"
(৯৬ ঃ ৫)

- ছবিতে 'চন্দ্র অভিযানের' সময় Orbiter Transfer vehicle হতে Luner landerকে মহাশূন্যে ভাসমান ও চলমান থাকাবস্থায় নির্দিষ্ট হিসেব মতে পৃথক হয়ে যেতে দেখা যাচ্ছে। প্রয়োজনীয় কাজ সমাপান্তে আবার একই পদ্ধতিতে ওরা সংযোজন কাজ সম্পন্ন করে এক অবিশ্বাস্য বিষয়কে বিশ্বাসের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ব্যাপারটি আশ্চার্য হবার মত নয় কি? মানুষ নিজ থেকে কোন বিষয়কে অসম্ভব মনে করলেই তা বাস্তবে অসম্ভব হয়ে যায় না।

করে। একইভাবে রাশিয়ান 'Mir' স্পেস ষ্টেশন-এ মালামাল ও নভোচারীদের নিয়েও মহাকাশযান যাতায়াত করেছে। 'Skylab' ঘন্টায় প্রায় ২৮০০০ মাইল প্রচন্ড গতিতে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছিল, অনুরূপভাবে 'Mir'-ও প্রতি ৯০ মিনিটে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করেছে নিজ কক্ষপথে প্রচন্ড গতি নিয়ে। নিঃসন্দেহে এদের এই দ্রুতগতিকে খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নেই। এখন কথা হলো, স্পেস ষ্টেশন (Space Station) গুলোতে মালামাল এবং নভোচারীদের আনা-নেয়ার জন্য যাতায়াতকারী মালামাল বহনকারী ঐ মহাকাশ যানগুলোকে উড়ন্ত অবস্থায়-ই এদের নির্দিষ্ট করা গবেষণাগার বা Space Station-র সাথে ভিড়তে হয়েছে। ভাসমান ও প্রচন্ড গতিসম্পন্ন Space Station-এর 'Docking Module'-র সাথে মহাকাশযানের (Space Suttle) 'Docking Module' সংযোজন করতে হয়েছে। আর 'Docking' করতে গিয়ে মহাকাশযানের নভোচারীগণ উড়ন্ত অবস্থায় উভয়ের গতি এবং দূরত্বের মাঝে সঠিক হিসেব করে সতর্কতার সংগে নিজ যানের গতি নিয়ন্ত্রণ করে যথাযথভাবে 'Docking' বা ভীড়ানোর কাজটি সম্পদান করেছেন। ফলে প্রচন্ড গতিতে ধাবমান এবং মহাশূন্যে ভাসমান থাকা সত্ত্বেও এদের পরস্পরের মধ্যে আসা-যাওয়া ও আদান-প্রদানে কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটেনি এবং এখনো ঘট্‌ছে না। প্রয়োজনীয় কাজ সমাপনান্তে আবার পূর্বের নিয়মে উড়ন্তবস্থায় প্রচন্ড গতির ভিতর দিয়েই উভয়ে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে যার কাজে ফিরে যাচ্ছে। এছাড়াও বিজ্ঞান আমাদের দেখিয়েছে ১৯৭৫ সালের ১৭ই জুলাই প্রথমবারের মত আমেরিকান 'স্পেস্ ক্রাফট্ এ্যাপোলো' (Space Craft Apollo) এবং রাশিয়ান 'স্পেস্ ক্রাফট্ সুয়ুজ' (Space Craft Soyuz) মহাকাশের মহাশূন্যতায় প্রচন্ড গতি নিয়ে পৃথিবীর কক্ষপথে পরিভ্রমণরত অবস্থায় পরস্পর 'docking' করে নভোচারীগণ 'করমর্দন' করতে সক্ষম হন।

অনুরূপভাবে ১৯৯৫ সালে আমেরিকান 'Space Shuttle Atlantis' রাশিয়ান Space Station 'Mir'-এর সাথে Docking System-এ সংযুক্ত হতে সক্ষম হয়। উভয়ের উড়ন্তবস্থায় তীব্র গতি থাকা সত্ত্বেও এদের Docking-এ কোন অসুবিধা হয়নি। পরস্পর নিকটবর্তী হওয়ার পর Space Shuttle Atlantis-এর নভোচারীগণ দূরত্ব ও যানের গতি হিসেব করে O.1 kmh এ (O.06 mph-এ) কমিয়ে দেন। ফলে সহজভাবে উভয়ের 'Docking module' পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ



চিত্রঃ ১৫৪

"তোমরা তোমাদের প্রভুর এই বাস্তব নিদর্শনমূলক (বিজ্ঞানসম্মত) বাণীকে মিথ্যা মনে করিয়া কি অস্বীকার করিতে পার?" (৫৫ ঃ ৩৪)

- ছবিতে পৃথিবী থেকে কয়েকশত কিলোমিটার উর্ধ্বে মহাশূন্যে প্রচন্ড গতিতে ভাসমান ও চলমান Space Station-এর সাথে একই অবস্থায় চলমান Space Croft (মহাকাশ যান) ডকিং ব্যবস্থায় সংযোজন সম্পন্ন করে প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করছে। এক সময় মানবসভ্যতা যা অবিশ্বাস করতো পরবর্তীতে বিজ্ঞানের অবদানে তা চূড়ান্ত বাস্তবে রূপ নিয়েছে।



চিত্রঃ ১৫৫

"এই সমস্ত অদৃশ্য জগতের তথ্য তোমাকে ওহী দ্বারা অবগত করিয়াছি, যাহা ইহার পূর্বে তুমি জানিতে না কিংবা জানিত না তোমার সম্প্রদায় (মানবমন্ডলী)।" (১১ ঃ ৪৯)

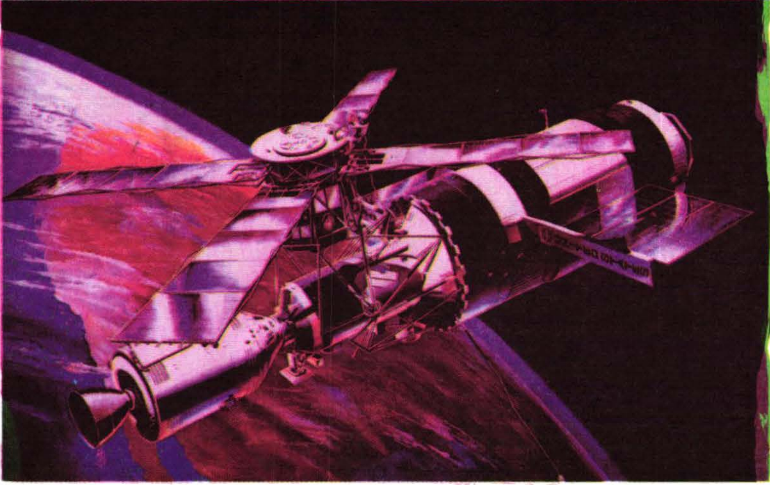
- পৃথিবীর চারপাশে মহাশূন্য এলাকায় সকল প্রকার কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের পিছনে সক্রিয় রয়েছে ভূ-পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত 'Mission Control' যার সুষ্ঠ যোগাযোগ ও নির্দেশনার বাইরে কৃত্রিম উপগ্রহ, রকেট কিংবা ভাসমান গবেষণাগার সহ সকল প্রকার আকাশ কার্যক্রম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। এই যদি হয় প্রকৃত অবস্থা, তাহলে ভাসমান সমগ্র মহাবিশ্বটির সুষ্ঠ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের পিছনে মহাজ্ঞানী 'আল্লাহ্' তায়ালার 'Suprime Control' কি ভেসে উঠে না?



চিত্রঃ ১৫৬

"তাঁর মহাবাণী অবশ্যই সত্য।" (৬ ঃ ৭৩)

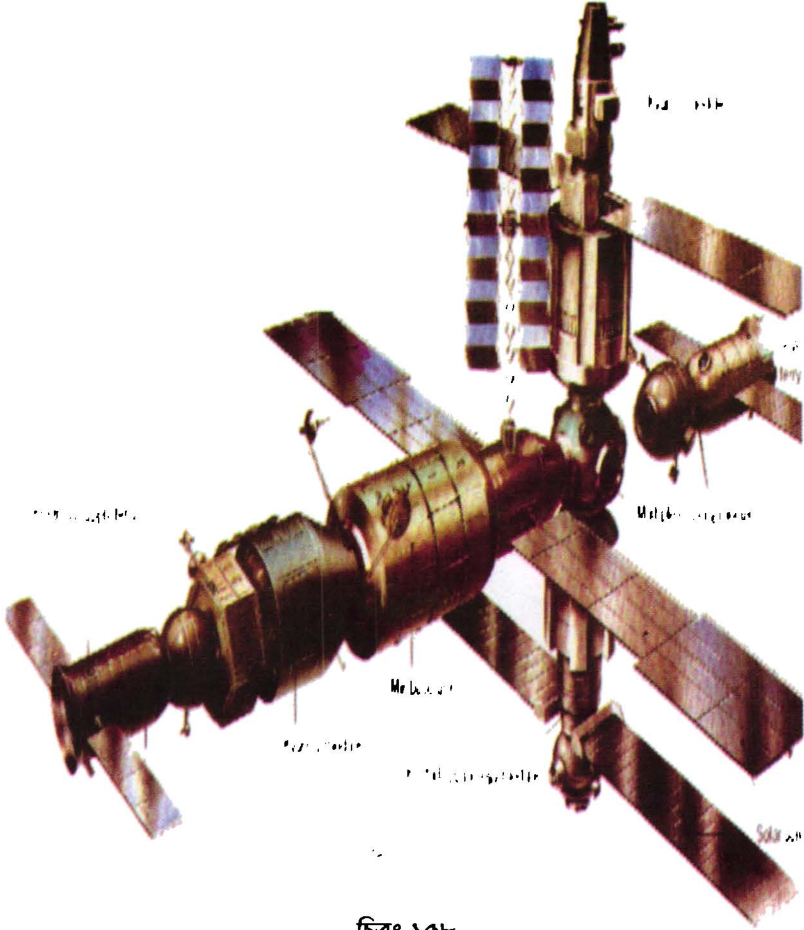
- আমেরিকা যুক্তরাষ্ট ৭০-এর দশকে মানবজাতির মধ্যে সর্বপ্রথম মহাশূন্যে কক্ষপথে ভাসমান ও চলমান গবেষণাগার 'Skylab' সংস্থাপন করে। গবেষণাগারটি প্রচন্ড গতিতে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করার সাথে সাথে বিভিন্ন সময়ে গবেষণার প্রয়োজনে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উৎক্ষিপ্ত আকাশ যানের সাথে নির্দিষ্ট করা নিয়মে সংযোজন ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যথাযথভাবে কার্য সমাধা করেছে। প্রমাণ করেছে উড়ন্তবস্থায়ও একাধিক ভাসমান বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক গড়া সম্ভব।



চিত্রঃ ১৫৭

"নিশ্চয় ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছে পর্যবেক্ষণ শক্তি সম্পন্ন জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।" (১৫ ঃ ৭৫)

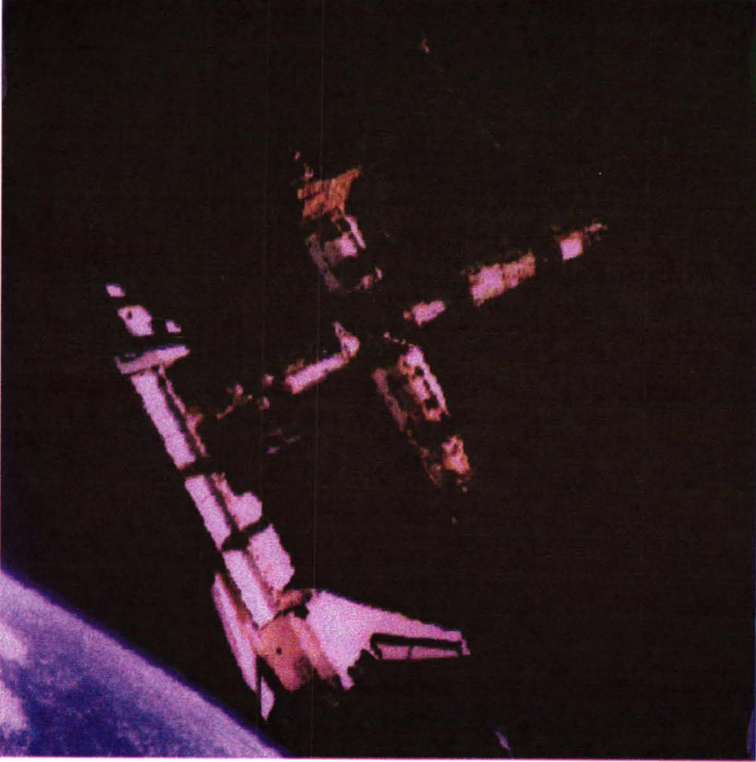
- ছবিটিতে মহাশূন্যের কক্ষপথে পরিভ্রমণরত গবেষণাগার 'Skylab'-এর 'ডকিং মডিউল' (Docking Module) দেখা যাচ্ছে, যেখানে আগত আকাশ যানের 'ডকিং মডিউল' প্রবেশ করে এয়ার লকিং পদ্ধতিতে সংযুক্ত হয়ে মজবুতভাবে আঁকড়িয়ে ধরে। প্রয়োজন শেষে উক্ত লকিং খুলে দিয়ে বস্তু দু'টিকে সুষ্ঠভাবে বিচ্ছিন্ন করে নেয়া হয়। মানব সমাজ কর্তৃক উক্ত কাজটি সম্পাদিত হতে পারলে মহাজ্ঞানী ও স্রষ্টা 'আল্লাহ্‌র' পক্ষে 'পরকালে' একইভাবে মহাকাশীয় দুটি বস্তুতে কেন সংযোগ-সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব হবে না? এ ধরনের বাস্তবতা বিবর্জিত চিন্তা-চেতনার কোন মূল্য আছে কি?



চিত্রঃ ১৫৮

"কুরআন তোমাদিগকে জ্ঞান-চক্ষু হিসেবে তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতীর্ণ। সুতরাং যে দেখিতে পাইল, সে নিজেরই কল্যাণ সাধন করিল।" (৬ ঃ ১০৪)

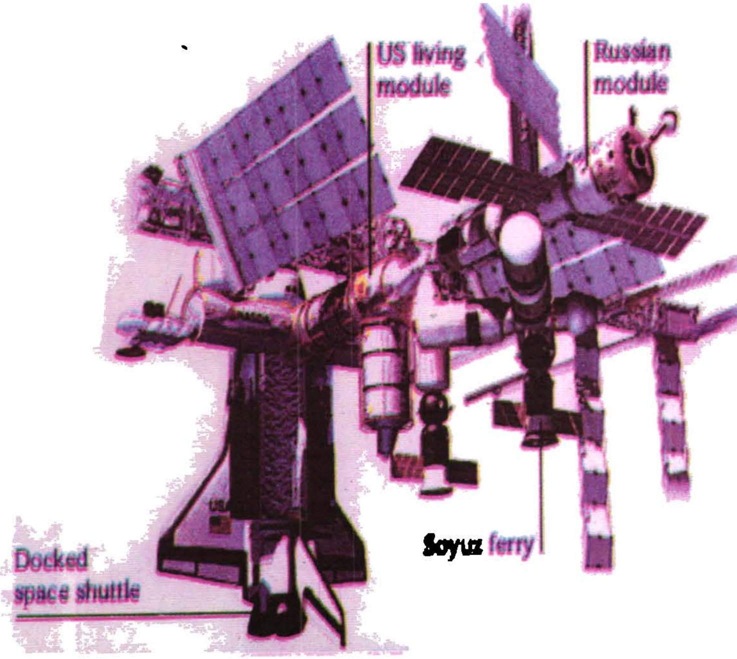
- ছবিতে ভূ-পৃষ্ঠ হতে প্রায় ২০০ মাইল ওপরে মহাশূন্যে কক্ষপথে স্থাপিত রাশিয়ান স্পেস ষ্টেশন 'Mir' কে দেখা যাচ্ছে। প্রতি ৯০ মিনিটে প্রচন্ড গতিতে এটি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছে। উক্ত ছবিতে চতুর্দিকে কয়েকটি 'ডকিং মডিউল' দেখা যাচ্ছে, যেখানে বহুবার আকাশযান সমূহ উড়ন্তবস্থায় সংযোগ সাধনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করেছে।



চিত্রঃ ১৫৯

"আকাশজগত ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত বস্তুপুঞ্জের মধ্যে জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে।" (২ ঃ ১৬৪)

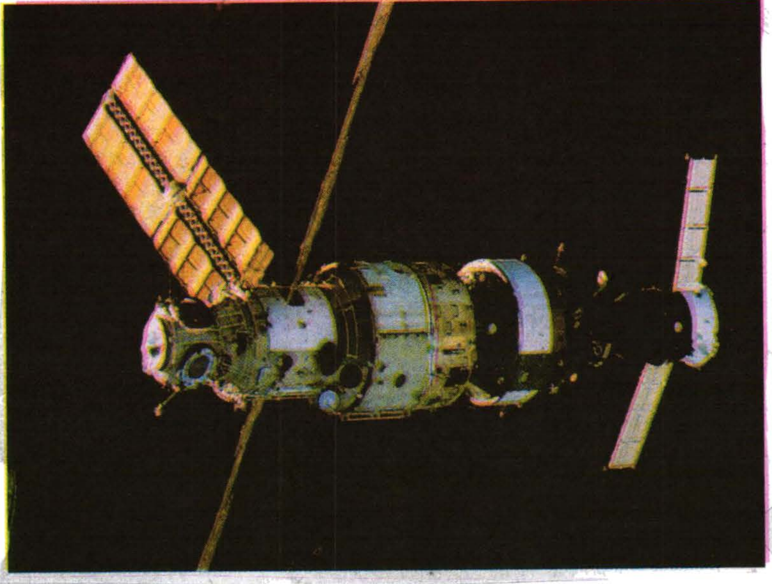
- ছবিতে রাশিয়ান Space Station -এর সাথে আকাশ যান (Space Ship) ভাসমান অবস্থায় ডকিংরত দেখা যাচ্ছে। এখানে উভয় বস্তুই পূর্বেই নির্দিষ্ট করা নিয়ম-পদ্ধতিতে কাজটি সমাধা করে মানব সমাজের কৃতিত্ব প্রকাশ করেছে। নগন্য মানুষ যদি এই ধরনের অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারে, তাহলে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কি পরকালের জন্য প্রয়োজনীয় ডকিং ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে পারবেন না? অবশ্যই পারবেন। তিনি শুধু 'হও' বলতেই তা সাথে সাথেই হয়ে যাবে।



চিত্রঃ ১৬০

"মূলতঃ গোলামদের মধ্যে জ্ঞানীরাই আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া চলে।" (৩৫ ঃ ২৮)

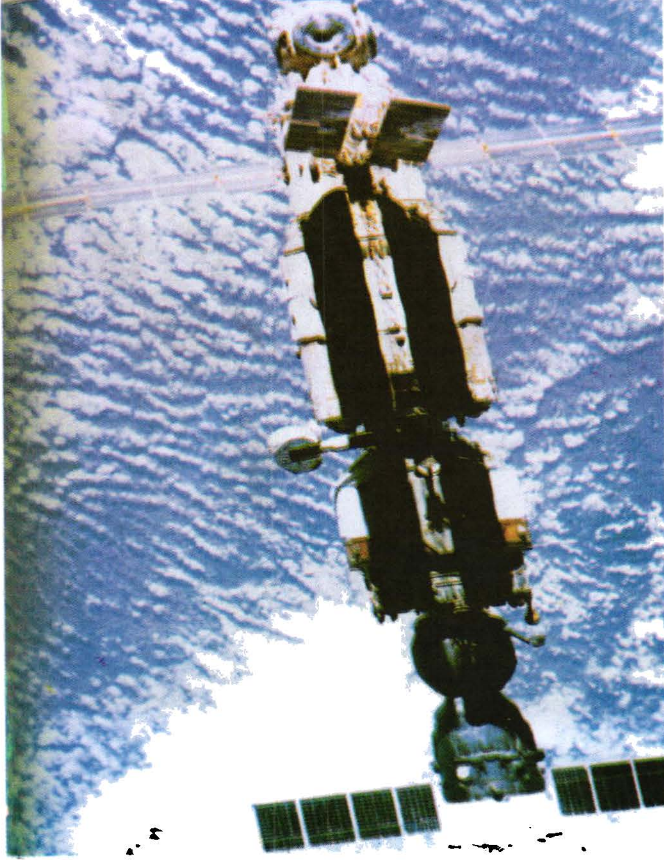
- ছবিতে একটি আকাশযান (Space Ship) 'স্পেস স্যাট্‌ল' কে 'স্পেস ফেরী সুয়ুজ' এর সাথে মহাশূন্যে ভীড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। মহাকাশের মহাশূন্যতায় এদের এই সংযোগ সাধন পরকালের হাশরের মাঠ, জান্নাত, জাহান্নাম ও পুলসিরাতের মধ্যে সংযোগ সাধনের বাস্তবতাকে একশতভাগ সম্ভব করে তুলেছে। বিজ্ঞানের বদৌলতে বিষয়টি অবিশ্বাস করার সুযোগ এখন আর থাকলো না। 'পরকাল' অস্বীকার করতে চাইলে এখন বাস্তব বিজ্ঞানকেই প্রথমে অস্বীকার করতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই।



চিত্রঃ ১৬১

“তিনি তোমাদিগকে বহু নিদর্শন দেখাইয়া থাকেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহ্র কোন্ কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করিবে?” (৪০ ঃ ৮১)

- ছবিতে মহাশূন্যে ভাসমান একটি গবেষণাগারের শেষ প্রান্তে ‘ডকিং মডিউল’ (Docking Module) দেখা যাচ্ছে। পৃথিবী থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে পাঠানো আকাশযানটি এখানে পৌঁছার পর নিজ ডকিং মডিউল ধীরে ধীরে গবেষণাগারের মডিউলের সাথে ঘাটে ঘাটে মিলে এয়ার লক (Air Lock) পদ্ধতিতে মজবুতভাবে আঁকড়িয়ে ধরে। ফলে উড়ন্তবস্থায় পৃথিবী প্রদক্ষিনরত উভয় বস্তু পরস্পর সংযোগ স্থাপন করে প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করে নেয়। বিজ্ঞানের উক্ত ব্যবস্থা যদি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পায় তাহলে, পরকালের ডকিং ব্যবস্থা যে সম্ভব তা মেনে নিতে আপত্তি কোথায়?



চিত্রঃ ১৬২

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রহিয়াছে তাহারা সমস্তই প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু ঐ সব বিষয়ের প্রতি তাহারা উদাসীন।" (১২ ঃ ১০৫)

- ওপরের ছবিতে মহাকাশে উড়ন্ত একটি 'Space Station' দেখা যাচ্ছে। এর প্রতিটি প্রান্তে-ই আছে 'ডকিং মডিউল' (Docking module) ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থা একাধিক আকাশযানের ভীড়ার কাজটি সমাধা করে পরকালের ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি জানাচ্ছে। সমাজের জ্ঞানীরা বিষয়টি বুঝে নিতে কষ্ট হয় না।



চিত্রঃ ১৬৩

"তাঁর মহাবাণী অবশ্যই সত্য।" (৬ ঃ ৭৩)

- পৃথিবীর চারপাশে মহাশূন্যে কক্ষপথ পরিক্রমনরত একটি ভাসমান গবেষণাগার, যার দু-প্রান্তে রয়েছে প্রয়োজনে অন্যান্য আকাশযান ভীড়ার জন্য একাধিক 'ডকিং মডিউল'। বিজ্ঞান বিশ্ব বিগত অর্ধ শতাব্দি ধরে মহাশূন্যে ভাসমান উড়ন্ত Space Ship ও Space Station সমূহকে প্রয়োজনে পরস্পর পরস্পরের সাথে ভীড়ায়ে বিভিন্ন বিষয়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার সাথে সাথে পরকালের নির্ধারিত বস্তুদের ভীড়ার (docking) ব্যাপারটিকেও সত্যায়ন করে চলেছে। বিজ্ঞানের বর্তমান সাফল্য পরকালীন ব্যবস্থাকে অস্বীকার করার মানসিকতা বাস্তবে তিরোহীত করেছে।



চিত্রঃ ১৬৪

"হে মানুষ! কোন জিনিষ তোমাকে তোমার প্রভু হইতে মোহান্ধ করিয়া রাখিয়াছে? (৮২ ঃ ৬)

- বর্তমান বিজ্ঞান তার নিত্য-নতুন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত যে কুরআনের প্রস্তাবকৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলোকে দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত করে চলেছে, তা একটু গভীর দৃষ্টি দিয়ে তাকালেই বুঝতে পারা যায়। ছবিতে প্রচন্ড গতিতে ধাবমান কৃত্রিম মহাকাশীয় একটি গবেষণাগারকে দেখা যাচ্ছে। বস্তুটির চতুর্দিকেই রয়েছে উড়ন্তবস্থায় অন্যান্য বস্তুর সাথে ভীড়ানোর (Docking) প্রয়োজনীয় 'ডকিং মডিউলের' সুবিধা। এর ফলে পরকাল ও তার সকল ডকিং ব্যবস্তা অস্বীকার করার কোন সুযোগ বর্তমান বিজ্ঞান বিশ্বে থাকলো না।

করে শক্তভাবে আটকিয়ে ধরে। এভাবে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে যাওয়ার পর মডিউলের (Module)-র টানেলের ভিতর দিয়ে নভোচারীগণ গমন করে একে অপরের সাথে মিলিত হন। তাদের প্রয়োজনীয় কাজ শেষে আবার তারা মহাশূন্যে ভাসমান ও চলমান থাকার পরও তাদের আকাশযান নিয়ে সহজভাবেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যান।

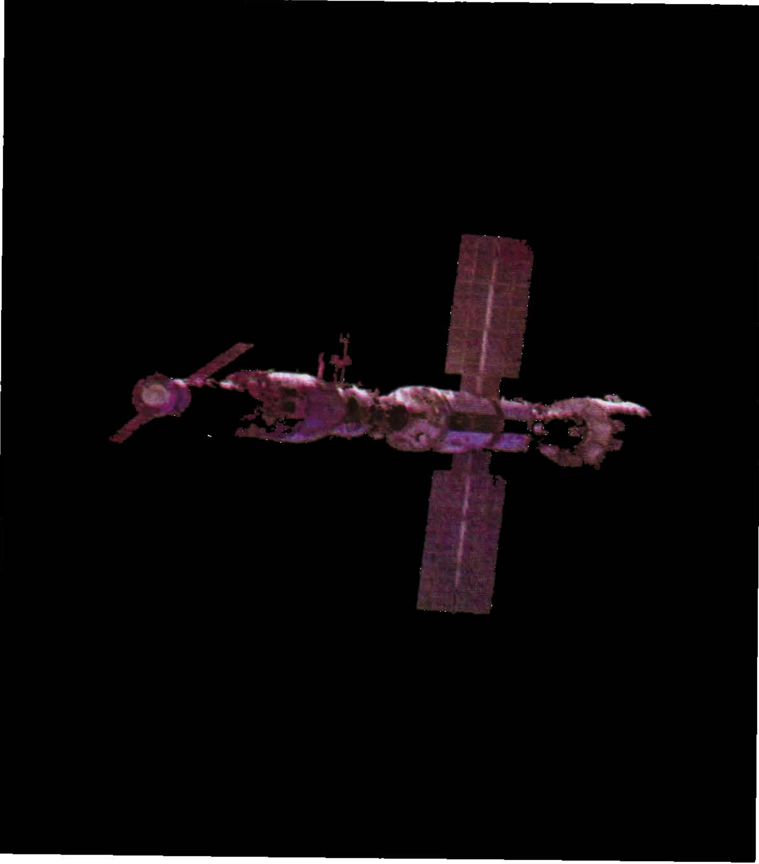
বর্তমান বিজ্ঞান প্রায় দুটি খেলার মাঠের সমান আয়তন বিশিষ্ট 'ইন্টারন্যাশনাল স্পেস্ ষ্ট্যাশন-ফ্রিডম' (International Space Station-Freedom) নামে এক বিরাট আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণাগার ১৯৯৮ সালের ২০শে নভেম্বর থেকে মহাশূন্যে তৈরী শুরু করেছে। এর সম্পূর্ণরূপে তৈরী হতে সময় লাগবে মোট ছয় বৎসর। খরচ পড়বে প্রায় 'চল্লিশ বিলিয়ন ডলার'। মজার ব্যাপার হচ্ছে ছয় বৎসরের মধ্যে এর প্রয়োজনীয় মালামাল পৌঁছাবার জন্য পৃথিবী থেকে 'স্পেস ক্রাফ্‌ট' বা 'স্পেস সাট্‌ল'কে সর্বমোট ৪৫টি বার 'সফর' করতে হচ্ছে। ইতোমধ্যেই এর বেশ উল্লেখযোগ্য 'সফর' সাফল্যজনকভাবেই সম্পন্ন করেছে এবং তাতে কাজ বেশ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। এখানেও কিন্তু একই পদ্ধতিতে মহাকাশযান তার মালামাল নিয়ে 'ইন্টারন্যাশনাল স্পেস্ ষ্টেশন-ফ্রিডমের' সাথে মহাশূন্যে উড়ন্তবস্থায় 'Docking' করে মালামাল হস্তান্তর করছে এবং নিরাপদভাবেই কাজ শেষে পৃথক হয়ে ফিরে আসছে। আগামীতে যে আরও ব্যাপক ও বিশাল আকারে মহাশূন্য গবেষণাগার তৈরী করে মহাবিশ্বের অনেক অজানা বিষয়ে অবদান রাখতে বিজ্ঞান এগিয়ে যাবে তা এখানে অনেকটা প্রতীয়মান হচ্ছে। আমাদের বক্ষমান অধ্যায়ের জন্য এখানে যে বার্তা (Message) তা হলো–মহাকাশযান এবং মহাকাশ গবেষণাগার মহাশূন্যে ভাসমান অবস্থায় প্রচন্ড গতি নিয়েও প্রমাণ করেছে–মহাকাশে বস্তু ছোট হোক কিংবা বৃহৎ হোক, গতি কম কিংবা বেশি হোক, সকল ক্ষেত্রেই এরা পরস্পর সংযুক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে প্রয়োজনীয় আদান-প্রদান সম্পন্ন করতে পারে এবং প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে যথানিয়মে আবার পরস্পর বিচ্ছিন্নও হতে পারে, এটা খুবই সম্ভব এবং খুবই বাস্তব। এতে অবাস্তবতার কিছুই নেই। বর্তমান বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে আরও দেখা যায় মহাশূন্যে উড়ন্ত অবস্থায় সামরিক বিমানগুলোতে প্রয়োজনে পাইপ সংযোগের মাধ্যমে উড়ন্ত অন্য বিমান হতে জ্বালানী ভর্তি করা হয়। আশ্চর্য হলেও বাস্তব নয় কি? ক্ষুদ্র প্রাণী মানুষের পক্ষে মহাকাশের মহাশূন্যতায় ভাসমান ও চলমান থেকেও যদি উল্লেখিত বিষয়গুলো সুষ্ঠভাবে ঘটানো



চিত্রঃ ১৬৫

"কিন্তু সেই দিন যাহাতে কোন সন্দেহ নাই, তাহাদের কি অবস্থা হইবে, যেদিন আমি তাহাদিগকে একত্র করিব?" (৩ ঃ ২৫)

- ১৯৭৫ সালের ১৭ই জুলাই প্রথমবারের মত আমেরিকান Space Craft Apollo ও রাশিয়ান Space Craft Suyoz মহাকাশে পরস্পরের সঙ্গে ভীড়াতে সক্ষম হলে উভয়ের নভোচারীগণ একত্রিত হয়ে মিলিত হয়ে আনন্দ প্রকাশ করে। এভাবেই পরকালে হাশরের মাঠ, জাহান্নাম, জান্নাত ও পুলসিরাত পরস্পরের সাথে ভীড়ে মানবমন্ডলীর বিচার কার্য সম্পাদনে এগিয়ে যাবে।



চিত্রঃ ১৬৬

"বস্তুতঃ উহাদিগের নিকট সত্য আসিবার পরে উহারা তাহা প্রত্যাখান করিয়াছে। ফলে উহারা সংশয়ে দোদুল্যমান।" (৫০ : ৫)

- ছবিতে সদ্য নির্মাণাধীন International Space Station 'Freedom' কে দেখা যাচ্ছে। ১৯৯৮ সালের ২০শে নভেম্বর থেকে এটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে মহাশূন্যে। কৃত্রিম মাহাকাশীয় বস্তুরূপে অসংখ্য আকাশযান (Space Ship) এতে একই সংগে ভীড়ানোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বর্তমান বিজ্ঞানের এ এক বিরাট সাফল্য। যা একই সাথে পরকালীন ডকিং ব্যবস্থাকেও একশতভাগ স্বীকৃতি জানাচ্ছে।

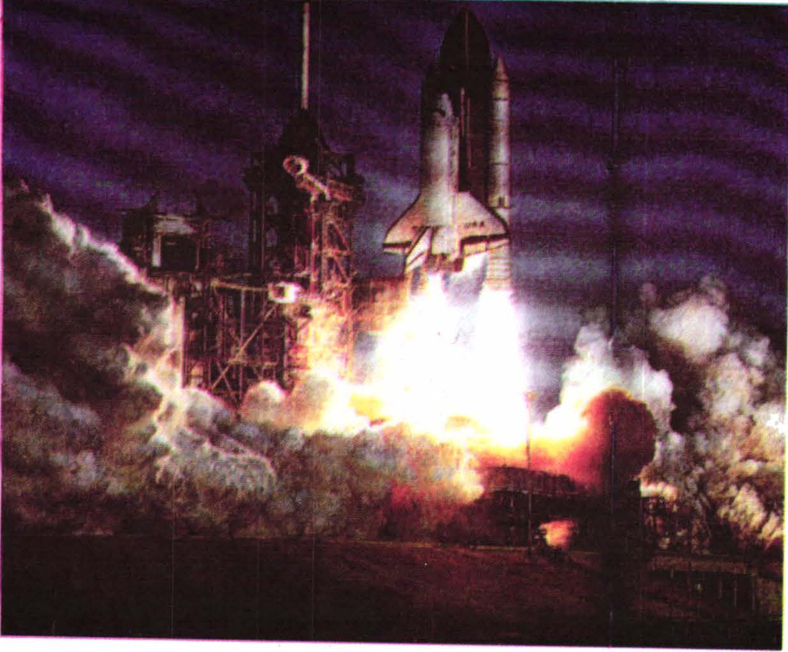


চিত্রঃ ১৬৭

"মানুষ সৃষ্টিগতভাবে ত্বরা প্রবন, শীঘ্রই আমি তোমাদিগকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাইব, সুতরাং তোমরা আমাকে ত্বরা করিতে বলিও না।" (২১ ঃ ৩৭)

- ছবিতে International Space Station এর একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান এবং তাতে পৃথিবীর এই ক্ষুদ্র নগন্য প্রাণীর সার্বিক কর্মকান্ড গড়ে উঠছে একমাত্র ডকিং মডিউলের (docking module) মাধ্যমে মহাশূন্যে একাধিক আকাশযান সমূহের পরস্পর ভীড়ানো প্রক্রিয়ার সফলতার ওপর। একইভাবে একাধিক মহাজাগতিক বস্তুর সফল ডকিং ব্যবস্থায় সমাধা হবে পরকালিন বিচার ও ফলাফল লাভের সার্বিক বিষয়টি।

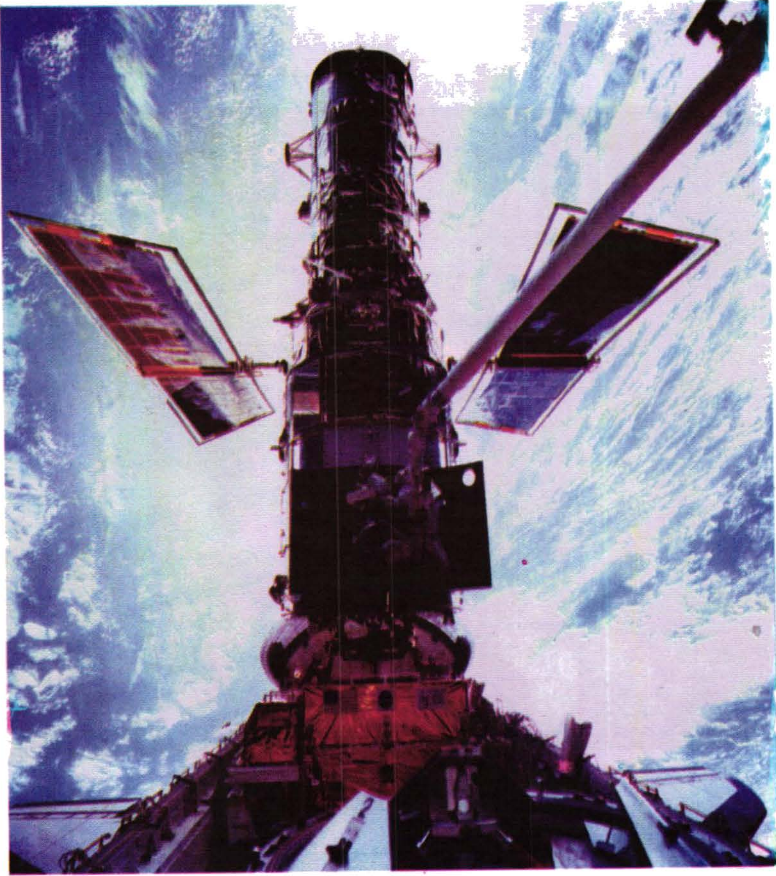
বিজ্ঞানের বর্তমান সাফল্য, পরকালের সার্বিক ব্যবস্থাপনাকেও দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা দিয়ে যাচ্ছে।



চিত্রঃ ১৬৮

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে নিদর্শন রহিয়াছে বিশ্বাসীদের জন্য।" (৪৫ ঃ ৩)

- ছবিতে International Space Station-এর জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল বহন করে মহাকাশের মহাশূন্যতার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাচ্ছে মহাকাশযান, এভাবে সর্বমোট ৪৫ টি সফরের মাধ্যমে শেষ হবে Station-টির নির্মাণ কাজ। নগন্য মানুষ যদি মহাশূন্যে বস্তুদের ভীড়ানোর (ডকিং) কাজকে সফল করে তার ইচ্ছা পূরণ করতে পারে, তাহলে মহাজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পরকালে ৪টি বস্তুকে ভীড়ায়ে তাঁর ইচ্ছা পূরণে বাধা থাকে কোথায়?



চিত্রঃ ১৬৯

"ইহাতেতো নিদর্শন রহিয়াছে পরম ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।"
(১৪ ঃ ৫)

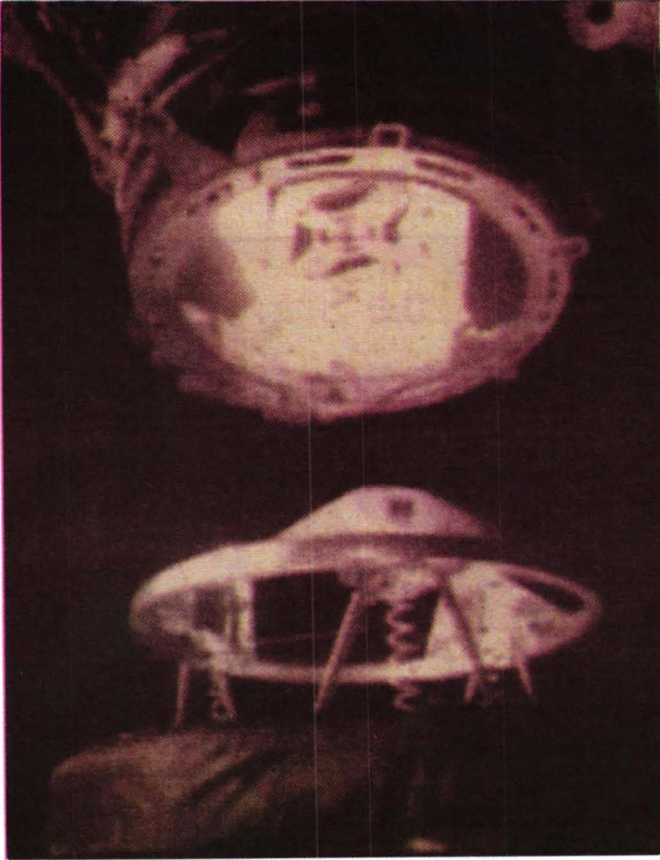
- ছবিতে পৃথিবীপৃষ্ঠ হতে প্রায় ৬০০ কিলোমিটার উর্ধ্বে মহাশূন্যে কক্ষপথে স্থাপিত হাবেল স্পেস টেলিস্কোপের সাথে মহাকাশযানকে ভীড়ে থেকে টেলিস্কোপের প্রয়োজনীয় রক্ষনাবেক্ষণ করতে দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে মহাশূন্যে বস্তুদের ডকিং ব্যবস্থা একটি নিয়মিত কাজে পরিণত হয়েছে, যা পরকালীন ডকিং ব্যবস্থাকে হাতে কলমে প্রমাণ করছে।



চিত্রঃ ১৭০

"উহারা কোন নিদর্শন দেখিলে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং বলে, ইহাতো চিরাচরিত যাদু।" (৫৪ ঃ ২)

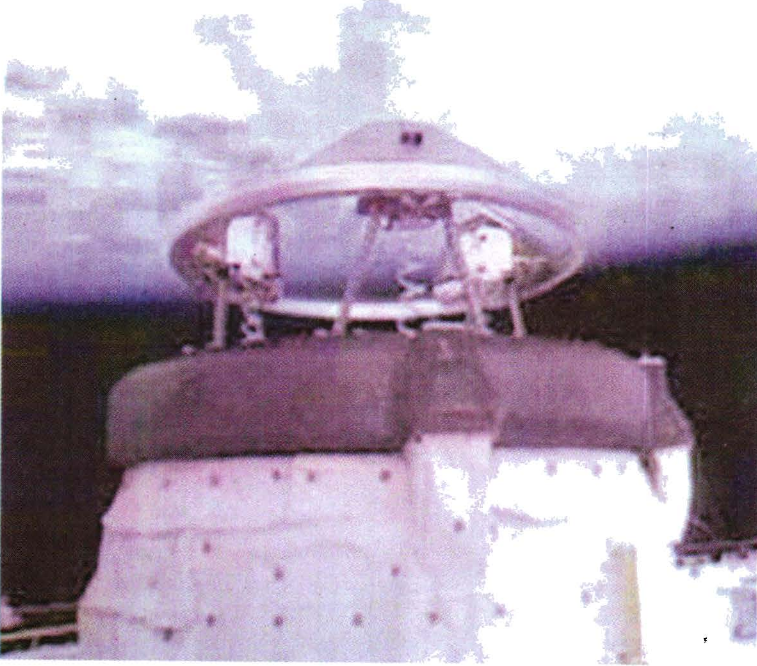
- ছবিতে একটি উড়ন্ত বিমানের পৃষ্ঠদেশে অন্য একটি উড়ন্ত বিমানের নিরাপদে অবতরণ এবং উড্ডয়ন পৃথক পৃথকভাবে দেখানো হয়েছে, যা পরকালে মহাজাগতিক বস্তুরূপে আবির্ভূত হাশরের মাঠ (গ্রহ), জান্নাত (বিশাল জীবনময় জগত বা গ্রহ), জাহান্নাম (সূর্যের চেয়ে কোটি কোটি গুণ বৃহৎ নক্ষত্রতুল্য অগ্নিপিন্ড) ও পুলসিরাত (সেতু বা ধাতব পদার্থ ও ধূলা-বালি দিয়ে তৈরী জেট্) ভাসমান ও চলমান থাকার পরও পরস্পর সংযোগ সাধনের সম্ভাবনাকে বাস্তবভাবে প্রমাণীত করেছে।



চিত্রঃ ১৭১

"ইহাতে অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশ মুমিন নহে।"
(২৬ ঃ ১০৩)

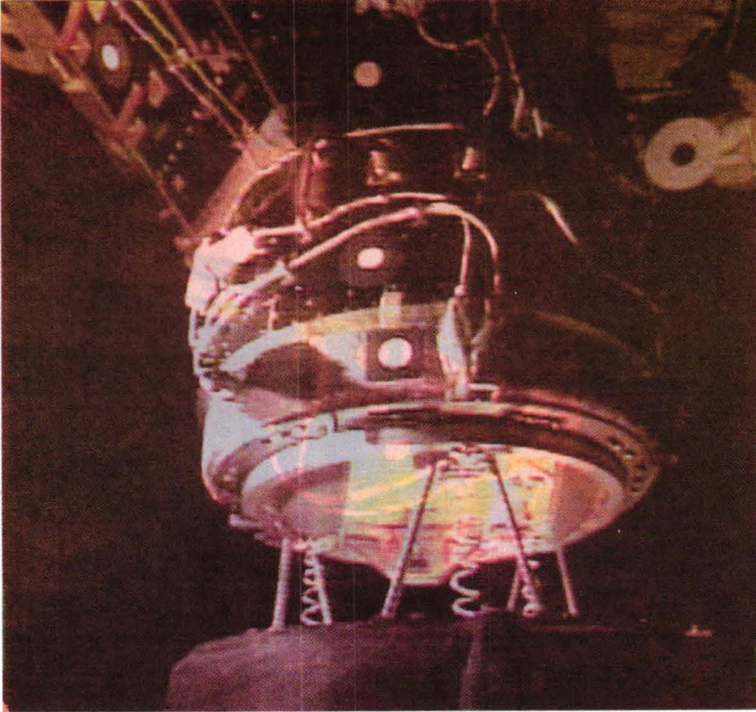
- ছবিতে আকাশযান সমূহের মধ্যে পরস্পর সংযোগ সাধনের জন্য তেরী 'ডকিং মডিউলের' (Docking Module) প্রকৃত দৃশ্য দেখানো হয়েছে। মহাশূন্যে আকাশযানের গতি, দূরত্ব ও সময়ের সূক্ষ্ম হিসেবের ওপর ওদের পরস্পর সংযুক্ত করে দাঁড়ানোর কাজটি সমাধা করা হয়ে থাকে। মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে মহাশূন্যে এই কাজটি সমাধা করতে পারলে, আল্লাহর পক্ষেতো পরকালে একই ধরনের কাজ সম্পন্ন করা খুবই সহজ হবে, কেননা তিনি সর্বশক্তিমান ও মহাজ্ঞানী হিসেবে 'হও' বলতেই সব যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়ে যায়।



চিত্রঃ ১৭২

"আমি উহাদিগের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করিব বিশ্ব জগতে এবং উহাদিগের নিজেদের মধ্যে। ফলে উহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, উহাই সত্য। ইহা কি যথেষ্ট নহে যে, তোমার প্রতিপালক সর্ব বিষয়ে অবহিত?"
(৪১ ঃ ৫৩)

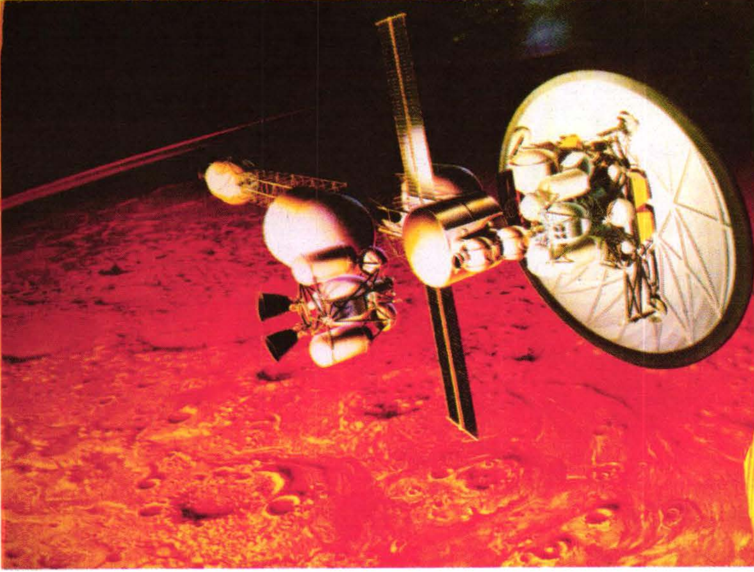
- ছবিতে মহাশূন্যে ডকিং ব্যবস্থা সম্পন্নের নিমিত্তে এগিয়ে যাওয়া 'ডকিং মডিউলের' (Docking Module) ছবি দেখা যাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে পরকালীন ব্যবস্থাকে অস্বীকারকারীদের জ্ঞানচক্ষু খুলে দেয়ার জন্য এটি যথেষ্ট হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।



চিত্রঃ ১৭৩

"অবিশ্বাসীরাই আল্লাহ্‌র নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক করে, সুতরাং দেশে দেশে তাহাদিগের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে।" (৪০ ঃ ৪)

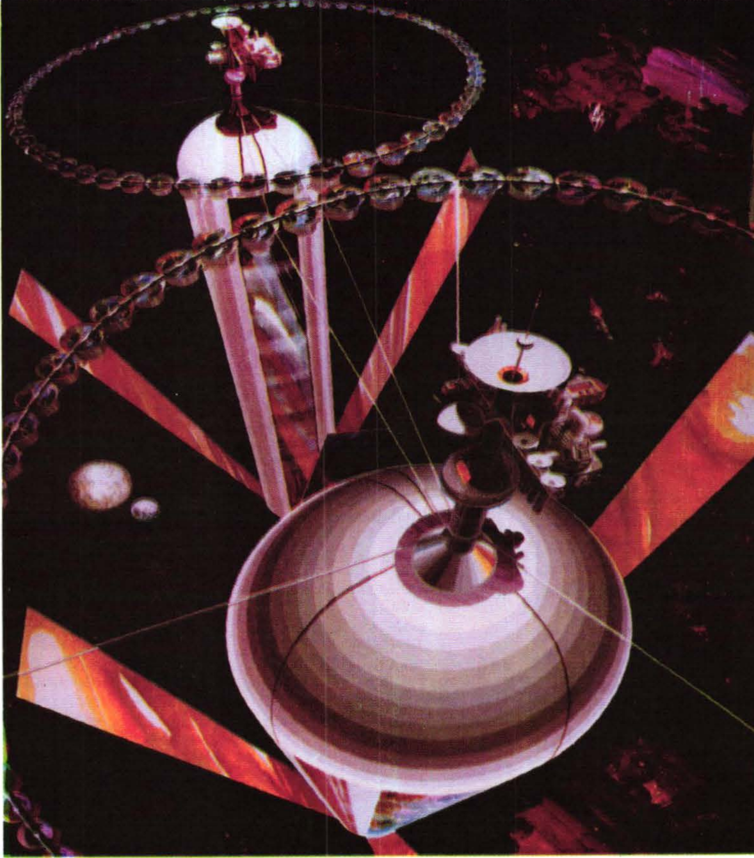
- ওপরের ছবিতে মহাশূন্যে দুটি আকাশযানের 'ডকিং মডিউলের' (Docking Module) একটি অপরটিতে প্রবেশ করে লকিং ব্যবস্থায় দৃঢ়ভাবে আটকিয়ে ধরতে দেখা যাচ্ছে। প্রয়োজন শেষে আবার একই নিয়মে ওরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে মহাশূন্যে নিজ নিজ কক্ষপথে ছুটে যাবে। সুতরাং পরকালীন ভীড়ানো পদ্ধতি (Docking System) যে বাস্তবভাবে সম্ভব সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে কি?



চিত্রঃ ১৭৪

"কেহ আল্লাহ্‌র নিদর্শন প্রত্যাখান করিলে আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।"
(৩ ঃ ১৯)

- ছবিতে আগামী দিনে 'মঙ্গল গ্রহে' মানুষের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার লক্ষে 'Mars lander' কে 'Orbiter Transfer vehicle' এর সাথে docking module-র মাধ্যমে সংযুক্ত করে মহাকাশ অভিযানের প্রস্তুতি নিতে দেখা যাচ্ছে। বিজ্ঞানের মহাশূন্যতায় এই জাতিয় প্রকল্পগুলো পরকালের বাস্তবতাকে একশতভাগ 'সত্যে' প্রমাণ করছে।



চিত্রঃ ১৭৫

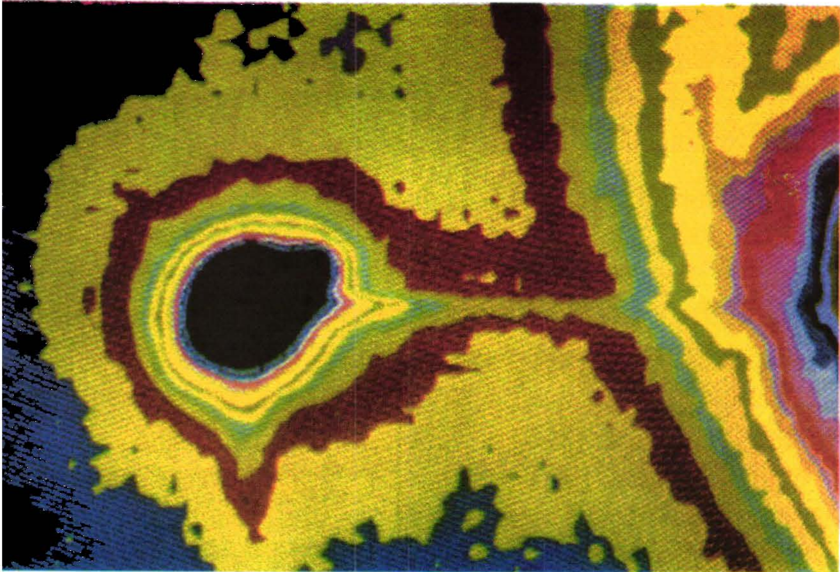
"মানুষের জন্য আমি এই সকল দৃষ্টান্ত দেই; কিন্তু কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিরাই ইহা বুঝে।" (২৯ ঃ ৪৩)

- আগামী দিনে পৃথিবীর আবাসযোগ্যতা কোন কারণে বিপদজনক হয়ে উঠলে সম্ভবমত মানবসমাজকে রক্ষাকল্পে মহাশূন্যের মাঝে কৃত্রিমভাবে জীবনধারণে সক্ষম বিশাল প্রকল্পের কথা বিজ্ঞান বিশ্ব ভেবে চলেছে। যেখানে রিং আকৃতির স্থাপনার চতুর্দিকের গোলাকার স্থাপনায় হাজার হাজার বনি আদম বাস করতে সক্ষম হবে। প্রতিটি গোলাকার স্থাপনার সাথেই থাকবে অসংখ্য 'docking module' যাতে করে একই সময় বহু সংখ্যক আকাশযান ভীড়তে পারে ও প্রয়োজনীয় কাজ সারতে পারে। বিজ্ঞান বিশ্বের ভবিষ্যত উক্ত চিন্তা-ভাবনাও পরকালে সৃষ্ট ডকিং ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি জানাচ্ছে।

যেতে পারে, তাহলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষে উল্লেখিত পরকালের ব্যবস্থাপনা কেন সুষ্ঠভাবে সম্পাদিত হতে পারবে না। এর কি কোন যক্তি আছে?

এতক্ষণ পর্যন্ত মনুষ্য তৈরী 'আকাশযান' বা 'উপগ্রহের' মহাকাশে উড়ন্তবস্থায় দ্রুতগতিতে চলার পথে পরস্পরের মাঝে সংযোগ স্থাপন এবং প্রয়োজন শেষে আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজ নিজ কর্মে ফিরে যাওয়ার তথ্যই আকাশ বিজ্ঞানের কৃতিত্ব হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এবার মহাবিশ্বে মহাজাগতিক নিয়মে সৃষ্টি হওয়া বস্তুদের বেলায়ও যে অনুরূপ ঘটনা ঘটে চলেছে, পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান সেরূপ দু'একটি উদাহরণ তুলে ধরতে চাই।

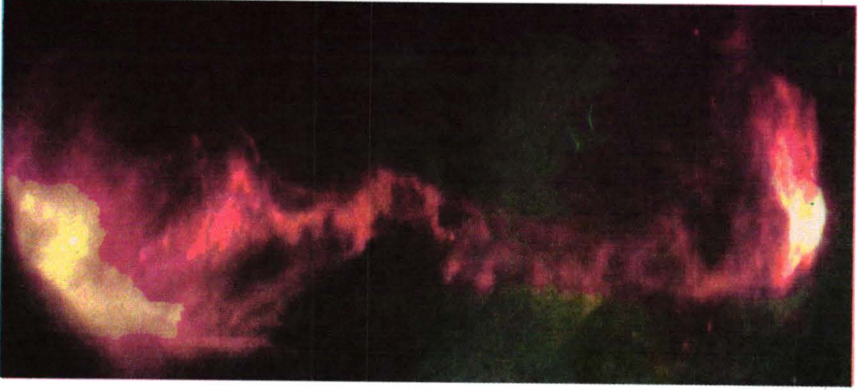
বিজ্ঞানবিশ্ব মহাবিশ্বের অজানা-অচেনা বস্তুদের প্রতিনিয়ত টেলিস্কোপের সাহায্যে খুঁজে বের করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ফলে কখনো কখনো মহাকাশের মহাশূন্যতায় হঠাৎ করে এমন এমন সব মহাজাগতিক বস্তু আবিষ্কৃত হচ্ছে যে, তা দর্শন করে খোদ মহাকাশ বিজ্ঞানীগণই অভিভূত হয়ে পড়ছেন শতবিস্ময়ে। অতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত 'কোয়াসার Markarian-205'এবং 'গ্যালাক্সী NGC 4319' বিজ্ঞানীগণকে রীতিমত তাক লাগিয়ে দিয়েছে। তারা বস্তু দুটিকে টেলিস্কোপে পাশাপাশি দেখতে পান এবং 'কোয়াসারটি' তার 'Jet' দিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্যালাক্সীর সাথে যে সেতুবন্ধন রচনা করেছে তাও স্পষ্ট দর্শন লাভ করেন। পরে বিজ্ঞানীগণ এদের আগত আলোক রশ্নিকে 'স্পেকট্রোস্কোপিতে' (Spectroscopy) পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পান– গ্যালাক্সীর 'রেড শিফ্‌ট' (Red – shift) প্রমাণ করছে ওটা পৃথিবী থেকে মাত্র ৬৯ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্বে আছে। অপরদিকে 'কোয়াসারের রেড শিফ্‌ট' প্রমাণ করছে ওটা পৃথিবী থেকে প্রায় ৮৫০ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে আছে। ফলে উভয়ের মাঝে সংযোগ স্থাপনকারী জেট্‌ (Jet) টি যে প্রায় ৭৮১ মিলিয়ন আলোক বর্ষ লম্বা তা তো একেবারে নিশ্চিত করেই বলা যায়। এক্ষেত্রে বর্তমান বিজ্ঞান আমাদেরকে জানাচ্ছে যে, প্রায় গড়ে ২০,০০০ কোটি নক্ষত্র ধারণ করে একটি গ্যালাক্সী, প্রায় গড়ে ২টি সৌরজগতের সমান আয়তনের 'কোয়াসারের' সাথে মহাকাশে উড়ন্তাবস্থায় প্রচন্ড গতি নিয়ে চলার পরও জেট্‌ (Jet)-র মাধ্যমে সংযোগস্থাপন করে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে 'বস্তুভর' (mass) আদান-প্রদান করছে, তাতে প্রমাণ হয় মহাকাশের যে কোন স্থানে যে কোন সময়



চিত্রঃ ১৭৬

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রহিয়াছে। তাহারা এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করে; কিন্তু তাহারা এই সকলের প্রতি উদাসীন।" (১২ ঃ ১০৫)

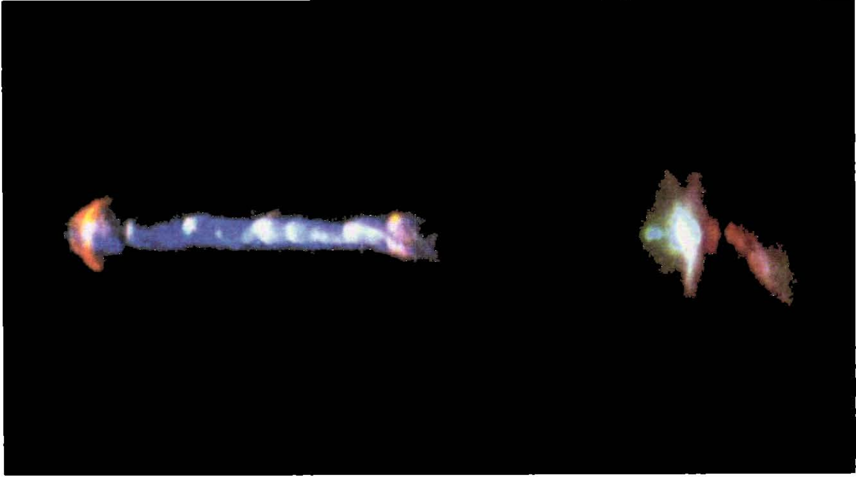
- ওপরের ছবিতে দৃশ্যমান 'গ্যালাক্সী NGC 4319 ও 'কোয়াসার মার্কারিয়ান-২০৫' (ছোট বলয়টি) প্রায় ৭৮১ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্ব সম্পন্ন বিরাট-বিশাল লম্বা জেট্ দিয়ে পরস্পর ডকিং (সংযোগ) সাধন করে পরকালের বাস্তবতাকে অস্বীকার করার সঁকল প্রকার পথই বন্ধ করে দিয়েছে। পরকালেও অনুরূপভাবে একাধিক মহাজাগতিক বস্তু পরস্পর সংযোগ সাধনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কার্য সমাধা করবে।



চিত্রঃ ১৭৭

"বল, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহার প্রতি লক্ষ্য কর। নিদর্শনাবলী ও ভীতি প্রদর্শন অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উপকারে আসে না।"
(১০ ঃ ১০১)

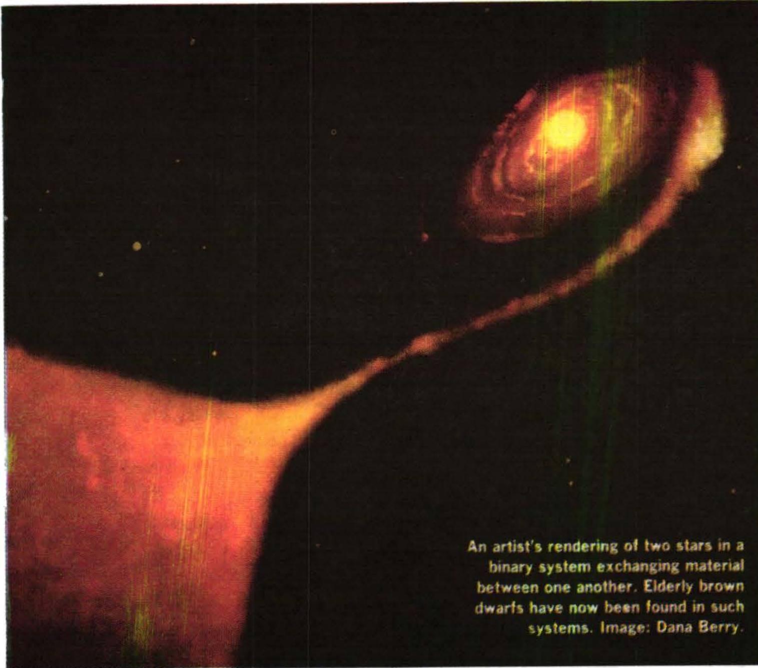
- ছবিতে 'Gum Nebula'-র নিকটবর্তী 'HH-47 Star Jet' দেখা যাচ্ছে। নক্ষত্রের উক্ত Jet-টি প্রায় ট্রিলিয়ন কিলোমিটার লম্বা, যা প্রমান করছে মহাবিশ্বের মহাশূন্যতায় পরিভ্রমনরত একাধিক বস্তুর মাঝে প্রয়োজনে জেট্-এর মাধ্যমে সংযোগ সাধন সম্ভব। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের কারণে আজ পরকালীন ব্যবস্থা এক বাস্তবসত্য বিষয় রূপে মানবসমাজের সামনে উপস্থিত হয়েছে।



চিত্রঃ ১৭৮

"যাহারা আমার নিদর্শন ও পরকালের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে তাহাদিগের কার্য নিষ্ফল হয়। তাহারা যাহা করে তদানুযায়ী তাহাদিগকে প্রতিফলন দেওয়া হইবে।" (৭ ঃ ১৪৭)

- ছবিতে অপর একটি 'HH-111 Star Jet' দেখা যাচ্ছে উক্ত 'জেট'টিও প্রায় ১২ আলোকবর্ষ লম্বা এবং ঐ দূরত্বের মাঝে পর পর তিনটি নক্ষত্রকে একই লাইনে সংযুক্ত করেছে। এটি আবিস্কৃত হয়েছে 'Orion belt'-এ। এতে প্রমাণ হচ্ছে পরকালে সর্বশক্তিমান 'আল্লাহ' হাশরের মাঠ নামক গ্রহ, জান্নাত নামক বিশাল গ্রহ, জাহান্নাম নামক বর্ণনাতীত প্রকান্ড অগ্নিময় পিন্ড ও পুলসিরাত নামক জেট্ দিয়ে পরস্পরকে একই সাথে ডকিং করে নির্ধারিত কাজটি সমাধা করবেন। বর্তমান বিজ্ঞান এই ব্যাপারে সকল প্রকার সন্দেহ-সংশয় তিরোহীত করেছে।

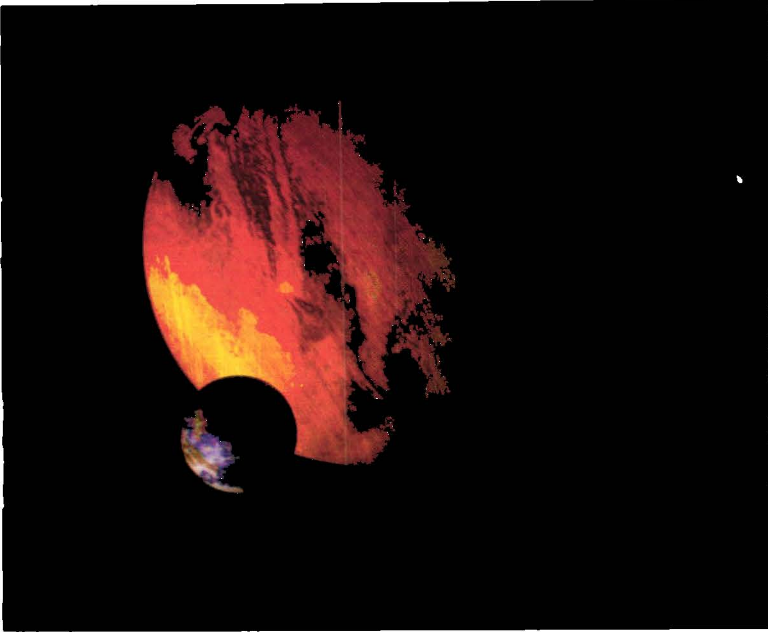

An artist's rendering of two stars in a binary system exchanging material between one another. Elderly brown dwarfs have now been found in such systems. Image: Dana Berry.

চিত্রঃ ১৭৯

"যাহারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখান করে এবং অহংকারে উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়, তাহাদিগের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হইবে না এবং তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিতেও পারিবেনা,যতক্ষন না সূঁচের ছিদ্র পতে উষ্ট্র গমন করে। এইরূপে আমি অপরাধীদিগের প্রতিফল দিব।" (৭ ঃ ৪০)

- ছবিতে আবিস্কৃত 'বাইনারি ষ্টার' পদ্ধতিতে নক্ষত্র দুটি 'জেট্'-এর মাধ্যমে ডকিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন করে একটি হতে অপরটিতে পদার্থ (material) আদান প্রদান করতে দেখা যাচ্ছে।

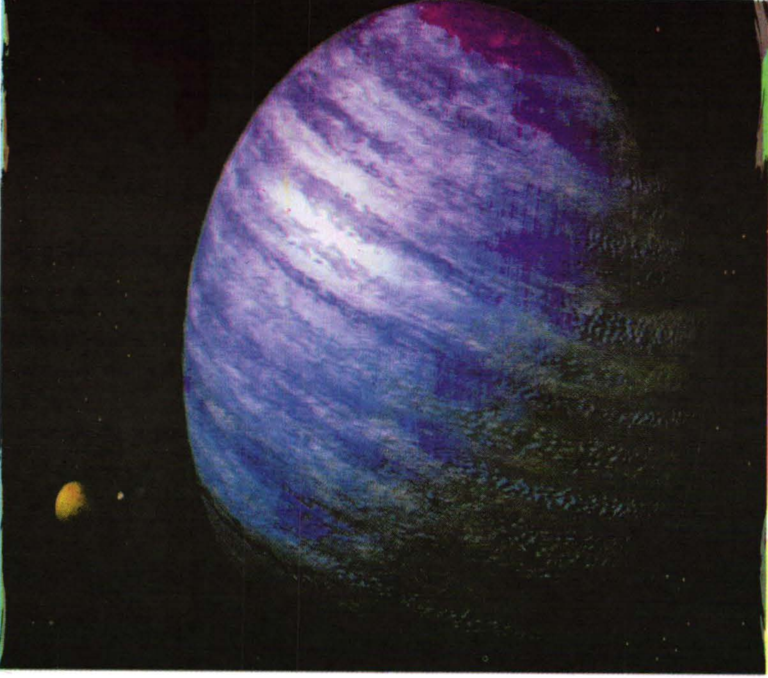
সুতরাং পরকালের ডকিং ব্যবস্থাও আর কল্পনার রাজ্যে থাকলো না। বিজ্ঞান তার আবিষ্কারের মাধ্যমে বিষয়গুলোকে পরম ও চরম বাস্তবতার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে।



চিত্রঃ ১৮০

"সেইদিন জমিনকে পরিবর্তন করিয়া ভিন্নরূপ জমীনে পরিণত করা হইবে, এবং তদ্রুপ করা হইবে ঐ আকাশমন্ডলীকেও।" (১৪ ঃ ৪৮)

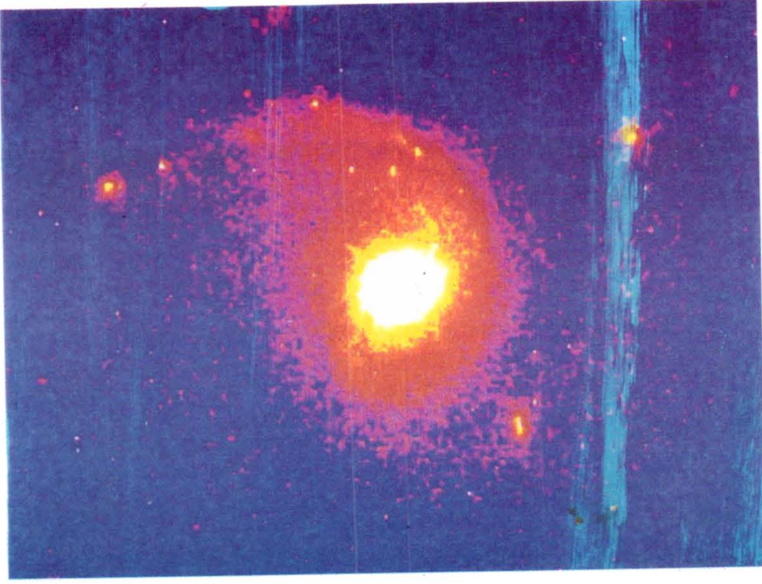
- পরকালীন ব্যবস্থার প্রথম ধাপ হচ্ছে হাশরের মাঠ। উক্ত ময়দানটি মূলতঃ একটি বিরাট গ্রহরূপে আবির্ভূত হবে। এর পৃষ্ঠভাগ সর্বত্রই সমতল আর সমতলে রূপ নিবে, কোথাও কোন উঁচু-নীচু থাকবেনা। সকল মানুষ উক্ত ময়দানে হিসেব প্রদানের নিমিত্তে নতুনভাবে জন্ম নিবে।



চিত্রঃ ১৮১

"(সেইদিন) জান্নাতকে নিকটস্থ করা হইবে মুত্তাকীদিগের।" (৫০ ঃ ৩০)

- পরকালের 'জান্নাত' হচ্ছে বর্ণনাতীত সৌন্দর্যে ও সবচেয়ে উত্তম জীবন উপকরণ সমৃদ্ধ এক বিশাল প্রকান্ড জীবনময় গ্রহ। যার প্রাকৃতিক রূপ ও সৌন্দর্য এবং বিভিন্ন সামগ্রী ও উপকরণ এই ধূলীর পৃথিবী থেকে অনুমান করাও এক অসাধ্য ব্যাপার। হাশরের দিন এই বিস্ময়কর সৌন্দর্যমন্ডিত গ্রহটি নিজ কক্ষ পথে পরিভ্রমণ করাকালে বিচারের মাঠ নামক গ্রহটির নিকটবর্তী হবে। মাঝখানে অবশ্য এর পূর্বেই কক্ষপথ পাড়ি দিয়ে 'জাহান্নাম' এসে উপস্থিত হবে।

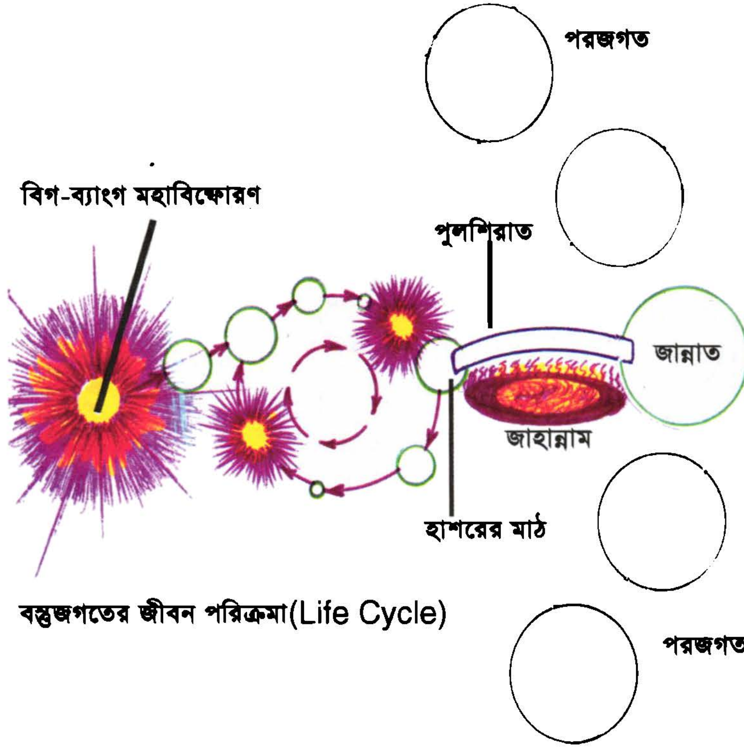


চিত্রঃ ১৮২

"সেইদিন জাহান্নামকে টানিয়া নিকটে আনা হইবে।" (৮৯ ঃ ২৩)

- পরকালের 'জাহান্নাম' হচ্ছে আবিস্কৃত 'কোয়াসারে'র মত (যে কোয়াসারের প্রতিটিতে কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি সূর্যের সমষ্টির চেয়েও বেশি উত্তাপ সম্পন্ন অগ্নিগোলক বিরাজমান) প্রচন্ড তেজিস্ক্রিয়তা সম্পন্ন বিশাল এক 'অগ্নিগোলক' যার জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে 'পাথরখন্ড' নামক 'সলিড ইউরেনিয়াম' (Solid Uranium)। ফলে এর ভয়াবহতা বর্ণনা করা মানবীয়জ্ঞানে সম্পূর্ণরূপে এক অসাধ্য ব্যাপার। ছবিতে একটি কোয়াসারকে মহাশূন্যে দেখা যাচ্ছে, এতে জাহান্নামের ভয়বহতার কিঞ্চিৎ পরিমাণ হলেও ভাবতে সহজ হবে। একটি কোয়াসারের উজ্জ্লতা ১০,০০০ গড় গ্যালাক্সীর উজ্জলতা অপেক্ষা আরও অধিক।

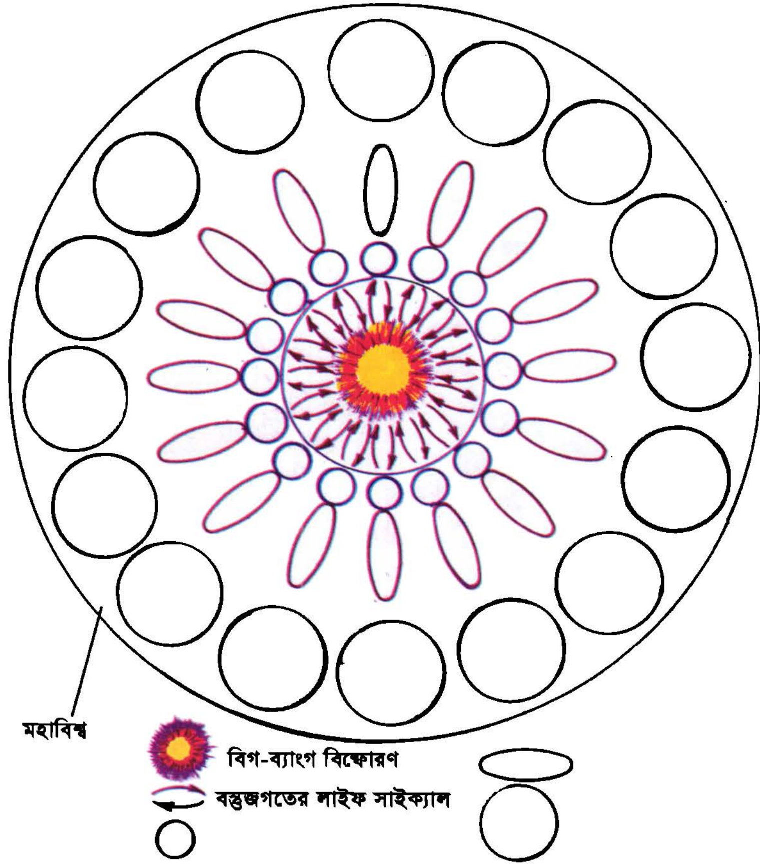
বিচারের দিন 'জাহান্নাম' নামক অগ্নিগোলকটি নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে হাশরের মাঠ নামক গ্রহ ও 'জান্নাত' নামক গ্রহটির মাঝখানে অবস্থান নিবে। পরে 'পুলসিরাত' বা 'জেট্' এসে অগ্নিগোলকের উপর দিয়ে অবস্থান নিয়ে একপ্রান্ত 'হাশরের' মাঠের সাথে এবং অপর প্রান্ত 'জান্নাতের' সাথে ডকিং সম্পন্ন করে ব্যবস্থাপনাটি পূর্ণ করবে।



চিত্রঃ ১৮৩

"এবং তোমাদিগের প্রত্যেকেই তাহা (পুলসিরাত) পার হইয়া যাইবে। ইহা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।" (১৯ ঃ ৭১)

- আল্-কুরআন আমাদেরকে এই বস্তুজগতের শুরু থেকে পরজগতের শেষ পর্যন্ত যে ধারণা দেয়, তা এখানে অংকিত চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। 'বিগ-ব্যাংগ' মহাবিষ্ফোরণ হতে হাশরের মাঠ পর্যন্ত বস্তুজগত এবং তার পর থেকেই শুরু পরজগতের। বস্তুজগত যেমনি নিজ জীবন পরিক্রমা (life cycle) একদিকে চালিয়ে যাচ্ছে, তেমনি পরজগতও মহাশূন্যে নিজ জীবন পরিক্রমা (life cycle) চালিয়ে যাচ্ছে। মূলতঃ সবাই মহাশূন্যে পরিভ্রমনেরত। "প্রত্যেকেই ভাসমান অবস্থায় নিজ নিজ কক্ষপথে (মহাশূন্যে নিজস্ব রুটে) পরিভ্রমণরত।" (৩৬ ঃ ৪০)



চিত্রঃ ১৮৪

"তাঁহার 'আরশ' আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছে। ইহাদের রক্ষণা-বেক্ষণ তাঁহাকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।" (২ ঃ ২৫৫)

- আল্-কুরআনের ভাষায় সমগ্র মহাবিশ্বটি মহাজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান ও মহান 'আল্লাহর' আর্‌শ দিয়ে ঘিরে আছে। বস্তুজগত ও পরজগত সবই এর মাঝে মহাশূন্যে নিজ নিজ নির্ধারিত কক্ষপথে ভাসমান ও চলমান (motion) হয়ে ব্যবস্থিত হয়ে আছে। বিগ-ব্যাংগ মহাবিস্ফোরণটি মহাবিশ্বের কেন্দ্রে সংঘটিত হয়ে পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে বস্তুর সৃষ্টির মাধ্যমে সমভাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে যেতে থাকে, যে মহাসম্প্রসারণ এখনও দূর্বার গতিতে কেবলই চতুর্দিকে সংঘটিত হচ্ছে এবং তাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রমান্বয়ে মহাবিশ্বের আকৃতি।

মহাজাগতিক যে কোন বস্তু অপর যে কোন বস্তুর সাথে পরিভ্রমণরত অবস্থায়-ই সংযোগ স্থাপন করে প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করতে পারে তা অসম্ভব কিছুই নয়; বরং পুরামাত্রায় সম্ভব এব বাস্তবসম্মত। বর্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞানের এ নতুন উদ্‌ঘাটন অবশ্যই অদৃশ্য জগতের জন্য 'Land mark' হিসেবে বিবেচিত হতে বাধ্য।

ওপরে উদ্ধৃত দীর্ঘ আলোচনায় প্রথমে আল্-কুরআন এবং পরে বর্তমান বিজ্ঞান মহাবিশ্বের মধ্যে ইহ্‌জগত কিংবা পরজগতে সর্বত্রই মহাশূন্যের মাঝে গতিশীল ভাসমান মহাজাগতিক বস্তু কিংবা মনুষ্য তৈরী উপগ্রহও পরস্পর নিকটবর্তী হয়ে একে অপরের সাথে সংযুক্ত হতে পারে এবং প্রয়োজনে আবার অক্ষত অবস্থায় বিচ্ছিন্নও হতে পারে, এটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়ার পর আর 'পরকাল' সম্পর্কে অর্থাৎ হাশরের মাঠ, জান্নাত জাহান্নাম ও পুল্‌সিরাত পরস্পর পরস্পরের সাথে সংযোগস্থাপন করে প্রথমে মানবমন্ডলীর বিচার এবং পরে ফলাফল অনুযায়ী সেখান থেকে কেউ জান্নাতে আবার কেউবা জাহান্নামে পুলসিরাত পাড়ি দিয়ে যে যাবে, সে কথায় কি আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ-সংশয় থাকতে পারে? বিজ্ঞানের নামে মানুষ যদি সেরূপ ব্যবস্থার সমন্বয় ঘটিয়ে মহাকাশে অসংখ্য সাফল্য বয়ে আনতে পারে, তাহলে 'পরকালে' মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা, প্রচন্ড ক্ষমতা ও মহাজ্ঞানের মালিক 'আল্লাহ্' অনুরূপ ব্যবস্থা ঘটাতে কি সক্ষম নন? বর্তমান বিজ্ঞানের মাধ্যমে পরকালীন বিচার অনুষ্ঠান যথার্থভাবে প্রমাণিত হওয়ার পর এটাকে, এটার বাস্তবতাকে অস্বীকার করার সকল পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং মানবসমাজের জ্ঞানবানরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাপকাঠিতেই 'পরকালকে' মেনে নিয়ে পার্থিব জীবন যাপন করা সমিচীন হবে।

"তোমার প্রভুর বাক্য সম্পূর্ণ সত্য ও ন্যায়সংগত। তাঁহার বাণী কেহ্ই মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে পারিবে না, তিনি সমস্ত বিষয়ই অবগত রহিয়াছেন।"
(৬ ঃ ১১৫)

"এই গুলি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের নিদর্শন।" (১০ ঃ ১)

অতএব 'আল্-কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স' এক মহা সত্যতায় উদ্ভাসিত।

এবার অধ্যায়ের আলোচিত বিষয় সমূহ এক নজরে দেখে নিন।

এক নজর

আল্-কুরআন	বর্তমান বিজ্ঞান
(১) সেই দিন জমিনকে পরিবর্তন করিয়া ভিন্নরূপ জমীনে পরিনত করা হইবে এবং তদ্রুপ করা হইবে ঐ আকাশ মন্ডলীকেও।" (১৪:৪৮) "প্রত্যেকেই ভাসমান অবস্থায় নিজ নিজ কক্ষপথে (মহাশূন্যে নিজস্ব রুটে) সন্তরনশীল।" (৩৬:৪০)	(১) আমাদের মহাবিশ্বে মহাজাগতিক প্রতিটি বস্তু-ই গতির (motion) কারনে উড়ন্ত অবস্থায় মহাকর্ষ বলের মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণভাবে ব্যবস্থিত হয়ে আছে। উড়ন্ত অবস্থায় (motion) না থাকলে শুধু মহাকর্ষ বল দিয়ে উক্ত ব্যবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব হতো না। "উল্লেখিত গতি (motion) এবং মহাকর্ষ বল (Gravity) ঠিক রেখে মহাজাগতিক বস্তুদের মহাজাগতিক নিয়মে আকৃতিগত বিপর্যয় ঘটলেও আবার পূনরাকৃতিতে আবির্ভাব ঘটা সম্ভব, যেহেতু সৃষ্টির শুরুতে প্রথমবার সেরূপ ঘটেছে বিধায় পরবর্তীতে অনুরূপ বার-বার ঘটা সম্ভব, অসম্ভব কিছুই না।
(২) "বিদ্রোহীদের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।" (৬৭ঃ৫) "নিশ্চয় জাহান্নাম ওঁত পাতিয়া রহিয়াছে, সীমালংঘনকারীদিগের প্রত্যাবর্তনস্থল।" (৭৮ঃ২১,২২)	(২) বিংশ শতাব্দির ক্রান্তিলগ্নে আবিষ্কৃত 'কোয়াসার' মহাকাশে এ যাবতকালের মধ্যে সবচেয়ে বড় অগ্নিগোলক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে, যার আয়তন এক বা একাধিক সৌরজগতের সমান অথচ তাতে শত-সহস্র কোটি নক্ষত্র মহাজাগতিক ব্যবস্থায় প্যাক্ট

"সেইদিন জাহান্নামকে টানিয়া আনা হইবে নিকটে।" (৮৯ ঃ ২৩) "আর জান্নাতকে নিকটস্থ করা হইবে মুত্তাকীদিগের।" (৫০ ঃ ৩০)	(Packed) হয়ে আছে (দেখুন সিরিজ-৫)। "মহাকাশে এ পর্যন্ত প্রায় ১০,০০০ 'কোয়াসার' আবিষ্কৃত হয়েছে এবং প্রতিটি কোয়াসার থেকেই প্রতিনিয়ত নির্গত হচ্ছে ভয়ানক ক্ষতিকর আলোক রশ্মি 'গামা-রে' (highest energy radiation)। মহা জাগতিক বস্তু হিসেবে এরাও মহাশূন্যে ভাসমান অবস্থায় বিচরনশীল। মহাবিশ্বের মহাশূন্যতায় সকল প্রকার বস্তুই একই নিয়মের অধীন হওয়ায় সবাই ভাসমান এবং গতিশীল। আবার গতিশীল থাকাবস্থায় পরস্পর পরস্পরের সাথে সংযোগ স্থাপন করছে এবং প্রয়োজন শেষে পরস্পর বিচ্ছিন্নও হয়ে যাচ্ছে। মনুষ্যবাহী আকাশ-যানের পক্ষে তা সম্ভব করে তোলা হয়েছে। সুতরাং মহাশূন্যে সকল প্রকার কৃত্রিম কিংবা প্রাকৃতিক ডকিং ব্যবস্থা সম্পন্ন করা সম্ভব।
(৩) "এবং তোমাদিগের প্রত্যেকেই তাহা (পুলসিরাত) পার হইয়া যাইবে, ইহা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।" (১৯ ঃ ৭১)	(৩) প্রচন্ড অগ্নিময় 'কোয়াসার'র প্রায় প্রতিটির মূল অগ্নিগর্তের (নিউক্লিয়াস) সাথে সাথে রয়েছে বিশাল লম্বা জেট, যা ভয়াবহ অগ্নি দিয়ে পরিপূর্ণ। উক্ত জেট্ (Jet) গড়ে প্রায় দেড় লক্ষ আলোক বর্ষ লম্বা। ('মার্কারিয়ান - ২০৫' কোয়াসারটির জেট্ প্রায় ৮০০

“পরে আমি মুত্তাকীদিগকে উদ্ধার করিব এবং জালিমদিগকে সেথায় নতজানু অবস্থায় রাখিয়া দিব।” (৯ ঃ ৭২)	মিলিয়ন আলোক বর্ষ লম্বা)। ‘কোয়াসার’দের উল্লেখিত প্রচন্ড অগ্নিময় (highest energy radiation) তেজষ্ক্রিয়তা সম্পন্ন আকৃতি এবং এদের সাথে জড়িত অগ্নিভর্তি Jet কি জন্য সৃষ্টি হয়েছে, বিজ্ঞান এখনও তা যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটন করতে সমর্থ হয়নি।
“সেইদিন মুনাফিক পুরুষও মুনাফিক নারী মুমিনদিগকে বলিবে, তোমরা আমাদিগের জন্য একটু থাম, যাহাতে আমরা তোমাদিগের নূরের কিছু গ্রহণ করতে পারি, বলা হইবে তোমরা তোমাদিগের পিছনে ফিরিয়া যাও এবং আলোর সন্ধান কর।” (৫৭ ঃ ১৩)	আবিষ্কৃত অধিকাংশ কোয়াসারই বস্তুজগতের প্রায় প্রান্ত সীমানার (Far distance) দিকে আবিষ্কৃত হয়েছে। ‘মার্কারিয়ান-২০৫ কোয়াসারটি’ আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমানীত হয়েছে মহাশূন্যে উড়ন্ত অবস্থায় মহাজাগতিক বস্তুসমূহ তাদের প্রয়োজনে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়তে পারে আবার প্রয়োজন শেষে সম্পর্ক ছিন্নও করতে পারে এবং তা একশত ভাগই সম্ভব ও বাস্তব সম্মত।

সুতরাং ওপরের জ্ঞানগর্ভ পর্যালোচনায় আমাদের সম্মুখে স্পষ্টভাবেই প্রমানীত হয়েছে যে, ‘পরকালে’ বিচারের মাঠ, জান্নাত, জাহান্নাম ও পুলসিরাত একদিকে যেমন বাস্তব সত্য তেমনি অপরদিকে এগুলিও পরকালের মহাজাগতিক জ্যোতিষ্ক বিধায় মহাবিশ্বের মহাশূন্যতায় প্রয়োজনে একে অপরের সাথে ভাসমান ও উড়ন্তবস্থায় চলমান থেকেও পরস্পর পরস্পরের সাথে সংযোগ সাধন করতে পারে এবং প্রয়োজনে নিরাপদে বিচ্ছিন্নও হয়ে যেতে পারে। বিষয়টি বর্তমান বিজ্ঞানের অবদানে আর অস্বীকার করার কোন পথ নেই। সময়ের আবর্তনে মানবজাতি একদিন বিষয়টি বাস্তব চোখেই দর্শন লাভ করবে এতে কোনই সন্দেহ নেই। সন্দেহের আশ্রয় নিতে চাইলে বিজ্ঞানের বর্তমান সাফল্যজনক অগ্রগতিকেই

প্রথমে অস্বীকার করতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই। অতএব বর্তমান বিজ্ঞানের এক কঠিন বাস্তবতার আলোকে প্রমানীত হয়েছে 'পরকাল' এবং এর সকল ব্যবস্থাপনাই পরম সত্যতায় মন্ডিত।

"এই গুলিই প্রমাণ যে আল্লাহ্ সত্য" (৩১ ঃ ৩৪)

"অতএব হে জ্ঞানী সমাজ ! আল্লাহ্কে ভয় করিয়া চল, যাহাতে তোমরা পরিত্রাণ পাইতে পার।" (৫ ঃ ১০০)

- সুতরাং 'আল্-কুরআন'-এর মূল উৎস ও 'বিজ্ঞান' নামক বিশেষ জ্ঞানের উৎসও যে এককভাবে মহাবিশ্বের স্রষ্টা একমাত্র মহান 'আল্লাহ্' এবং পৃথিবীর মানবমন্ডলীকে যথার্থভাবে পরীক্ষা করার জন্যই উভয় বিষয়ের মাঝে প্রায় দেড় হাজার বছরের ব্যবধান সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তা সমাজের জ্ঞানীদের সামনে স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে। এ অবস্থায় সর্বশক্তিমান ও শ্রেষ্ঠ সত্ত্বার সম্মূখে নগন্য মানুষরূপী মানবমন্ডলীর নিজ কল্যাণার্থেই মস্তক অবনত করে ধন্য হওয়ার চেষ্টা করা জরুরী। নতুবা নিরেট বাস্তবতার বিপরীতে বিভ্রান্তিমূলক চিন্তা-ধারায় আচ্ছন্ন হয়ে অবস্থান গ্রহণ মানবমন্ডলীর জন্য শুধু ক্ষতির-ই কারণ হয়ে দাড়াবে, যা সময়ের প্রবাহমান স্রোতে একদিন সম্মূখে এসে দাড়িয়ে যাবে। সেদিন মহাসত্যের পক্ষাবলম্বন ও সে মতে চলার শত চেষ্টার উদ্যোগ গ্রহণ সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

শেষ কথাঃ

সুপ্রিয় পাঠক ! বইয়ের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হয়ে বিনয়ের সাথে আকণ্ঠ তৃপ্তি নিয়ে মহাবিশ্বের মহাবিস্ময়কর প্রচন্ড শক্তি-ক্ষমতা ও মহাজ্ঞানের অধিকারী একমাত্র স্রষ্টা মহান 'আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামিনের' সম্মূখে নিজ মস্তক অবনত করে দিচ্ছি, যিনি করুনা করে আমাদেরকে তাঁর পরিকল্পিত ও নিয়ন্ত্রিত মহাবিশ্বের কার্যক্রমের নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির যৎসামান্য কিছুটা হলেও আঁচ করতে সাহায্য করে ধন্য করেছেন। যে বিষয়ে প্রত্যেকটি মানুষ কিছু না কিছু ভেবেই থাকেন। যদিও এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানের বক্তব্য থেকে সঠিক উত্তর না পেয়ে শুধু অপেক্ষাই করছিলেন। আজকের বর্তমান পরিবেশে এসে সে অবস্থার অবসান ঘট্ছে এক এক করে। আমরা আশা করছি আগামীতে হয়তোবা বিষয়গুলো বিজ্ঞান আরও সহজ করে প্রত্যেকের বোধগম্যের সীমায় এনে হাজির করতে সক্ষম হবে। অবশ্য এখনি প্রাপ্ত তথ্যের কারনে 'পরকালকে' অস্বীকার করা বিবেক বানদের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। মহাবিশ্বের গ্যালাক্সীদের ধ্বংস এবং এদের পুনঃপুনঃ সৃষ্টির প্রক্রিয়া উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ায় বিচার দিবস অমান্য করার সকল রুট বন্ধ হয়ে গেছে, নিরেট বাস্তবতার কারণে। সকল জীবনময় জগত ক্রমান্বয়ে বিচার অনুষ্ঠানের নিমিত্তে নতুন এক জগতের দিকে পা-পা করে এগিয়ে চলেছে, যেখানে পৌঁছে তারা বলবে। "হায! আমরা কতইনা গাফলতের মধ্যে ছিলাম?"

আশ্চর্যের বিষয় যে, বিজ্ঞানের বাস্তব সত্য তথ্য ও ছবি গুলো মানব সমাজে গর্বের সাথে তুলে ধরার পরও সেই বিজ্ঞানীমহলের একটা অংশ কেন জানি বিশ্বাসীদলের অন্তর্ভূক্ত হতে পারেন না। তারা না-কি বিশ্ব প্রভুকে স্ব-চক্ষে দেখতে না পেলে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন না। তাদের উপস্থাপিত দাবীটির নিঃসন্দেহে গুরুত্ব আছে, তা আমিও অস্বীকার করছি না। কিন্তু কথা হলো বাস্তবতার নিরীখে উক্ত দাবীটি সকলক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; বরং ক্ষেত্রবিশেষে অবাস্তবও বটে। কেননা, যারা এই দাবীতে অনড় আছেন, তারা কি তাদের জীবনের সকল ব্যাপারেই অনুরূপ অনড় ও অবিচল অবস্থান নিতে পারেন ? বাস্তবভাবে তা কখনই সম্ভবপর নয়। একটু মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করুন, যে সকল বিজ্ঞানী বলছেন যে, 'বাস্তব চোখে না দেখা পর্যন্ত 'আল্লাহ্কে' বিশ্বাস করবেন না', তাদের প্রতি প্রশ্ন করতে চাই, 'আপনারা যে বিজ্ঞানের বদৌলতে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছেন,

খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেছেন, সেই বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত ও সত্য ঘটনারূপে প্রতিষ্ঠিত সৃষ্টিতত্ত্ব 'বিগ-ব্যাংগ' বিষ্ফোরণ কি আপনারা স্ব-চক্ষে দেখেছেন? মধ্যাকর্ষণ (Gravity) শক্তির চেহারা কেমন বা কি রং তা কি দর্শন লাভ করেছেন? 'মুক্তি গতি' (Escape velocity) কি চোখে দেখে তারপর ওটাকে বিশ্বাস করেছেন? কিংবা ব্ল্যাক হোলের আভ্যন্তরীণ কাঠামো কি দর্শন লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন? যে বাতাস ছাড়া বাঁচা যায় না, তার কি কোন রং বা কাঠামো দেখতে পেয়েছেন? এরকম শত শত বাস্তব অথচ অদৃশ্য বিষয়ের ওপর বিজ্ঞানীগণ তাদের জীবননির্বাহ করে চলেছেন এবং এদের অদৃশ্য কাঠামোর ওপরই নির্ভর করে তাদের প্রতি দিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে বিভিন্ন আবিষ্কারের মাধ্যমে নিজেদের সুনাম-সুখ্যাতি বিশ্বময় ছড়িয়ে চলেছেন, অথচ বিশ্বজাহানের 'প্রতিপালকের' বেলায় অযৌক্তিক এবং স্ব-বিরোধী বক্তব্য টেনে এনে অবিশ্বাসীদের প্রেতাত্মা মাথায় বহন করে চলেছেন, যা সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণও বটে। একদিকে তারা অদৃশ্য হাজারো বিষয়ের ওপর নিজেদের সকল কার্যক্রমের ভীত রচনা করেছেন, আবার অপরদিকে অদৃশ্যের দোহাই দিয়ে 'বিশ্ব প্রভুর' দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে হঠকারিতামূলক আচরণ প্রদর্শন করছেন। জ্ঞানবান সমাজের এই জাতিয় ডাবল ষ্ট্যান্ডার্ড একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। সম্ভবতঃ সে কারণেই 'কুরআন' তার শুরুতেই ঘোষণা করেছে এই বলে যে, "(বিশ্বাসী তারাই) যারা সকল ক্ষেত্রে অদৃশ্যের ওপর বিশ্বাসস্থাপন করে থাকে" (২ঃ ৩)।

জ্ঞানী পাঠক, আমাদের বর্তমান সময়ে উল্লেখিত প্রতিথযশা বিজ্ঞানী মহলের অবস্থা হয়েছে গ্রামের সেই বালকটির মতো, যে বালক প্রতিদিন তার নানীকে নামাজ পড়তে দেখে একদিন বেধড়ক প্রশ্ন করেই বস্‌লো, 'নানী ! তুমি যে প্রতিদিন নামাজ পড় তুমি কি 'আল্লাহ্‌কে' দেখতে পাও?' বুদ্ধিমতি নানী-নাতীর পাহাড় সমান প্রশ্নের ভারে দিশেহারা না হয়ে বরং গাম্ভীর্যতা রক্ষা করে উত্তর দিলেন– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌কে দেখতে পাই, তা না হলে এত কষ্ট স্বীকার করে নামাজ পড়বো কেন?' নানী এবার আস্তে করে নাতীকে প্রশ্ন করলো–'তুমি কি আল্লাহ্‌কে দেখতে পাও না?' নাতী জবাব দিল–'আমি যদি আল্লাহ্‌কে দেখতে পেতাম তাহলে আমিও তো তোমার মত নামাজ পড়তাম ! তুমি কি আমাকে 'আল্লাহ্' দেখাতে পার ? নানী সুযোগ পেয়ে বল্‌লো–'অবশ্যই' আমি তোমাকে আল্লাহ্ দেখাবো। তুমি আগামীকাল সকালবেলা আমার নিকট আসবে যখন আমি ডাল ভাঙার

চাকতি ঘুরাবো তখন তোমাকে সেখানেই আল্লাহ্ দেখাবো ইন্‌শাআল্লাহ্। নাতি তার নানীর কথায় খুবই আনন্দিত হল এবং হাত তালি দিয়ে উচ্চস্বরে বলে উঠ্‌লো, "কি মজা! কি মজা! আগামীকাল 'আল্লাহ্' দেখবো।"

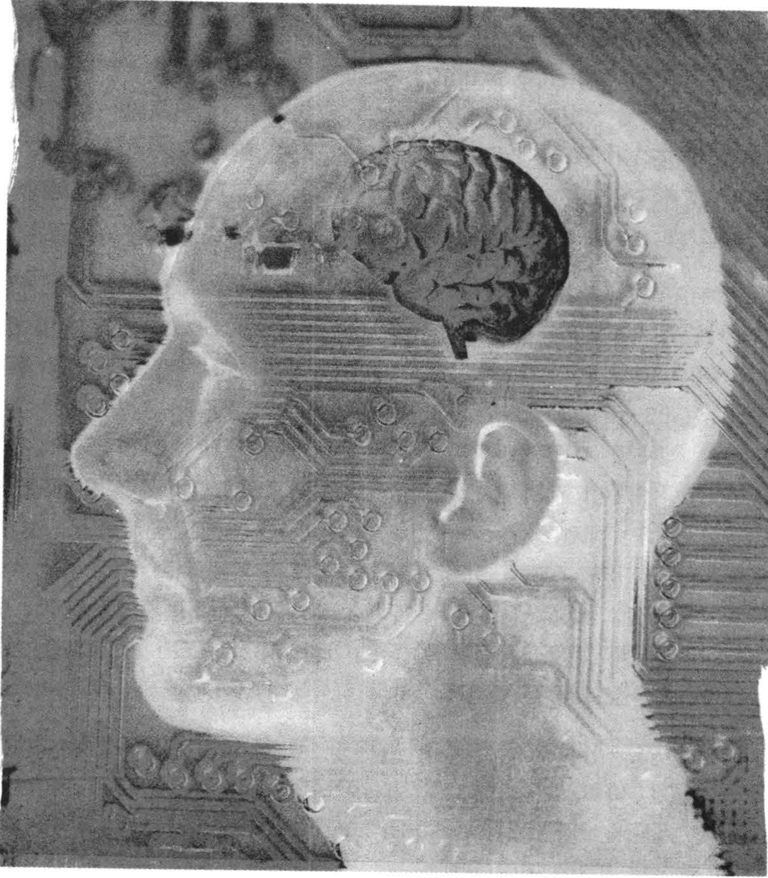
যেই কথা সেই কাজ, পরদিন নাতি ঠিক সময়মতো নানী হাত দিয়ে ঘুরানো ডাল ভাঙার চাক্‌তির পাশে গিয়ে বসলো এবং বললো–'নানী! হাজির, এবার আপনি আপনার ওয়াদা মতো আমাকে 'আল্লাহ' দেখান, নানী বললো, 'ঠিক আছে, তাই হবে তবে 'আল্লাহ্' দেখাবার পূর্বে আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা কর।' নাতি উত্তর দিল–'একশ বার, আমি প্রস্তুত'। নানী তার নাতিকে প্রথম প্রশ্ন করলো–'আচ্ছা নাতি! আমাদের পৃথিবীর আকৃতি কেমন তুমি কি বলতে পার? নাতি বললো– 'নানী! তুমি কি তা জান না? আমাদের পৃথিবীর আকৃতি গোলাকার, তবে কমলা-লেবুর মত একটু চ্যাপ্টা।' নানী এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন করলো–'আচ্ছা নাতি! পৃথিবী কি স্থির, না-কি চলমান?' নাতি তার নানীর দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে বললো–'নানী, তুমি তাও জান না? পৃথিবী স্থির থাকবে কেন? পৃথিবী বরং সূর্যের চারদিকে কেবলই ভোঁ-ভোঁ করে ঘুরছে।' 'নানী জিজ্ঞাসা করলো–'তুমি কি বিশ্বাস কর? 'নাতি জবাব দিল 'কেন বিশ্বাস করবো না? বিজ্ঞানীগণ তা প্রমাণ করেছেন।'

এবার নানী, প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে নাতিকে জিজ্ঞাসা করলো–'আচ্ছা নাতি! বল দেখি, আমার এই ডাল ভাঙার চাক্‌তিটি ঘুরছে না-কি স্থির হয়ে আছে?' নাতি জবাব দিল–'নানী ! তোমার চাক্‌তিওতো দেখছি খুব ঘুরছে!' নানী পরক্ষণেই বললো–'তাই না কি? তো চাক্‌তি কি নিজ থেকেই ঘুরছে না-কি কেউ তাকে ঘুরাচ্ছে বলেই ঘুরছে?' উত্তরে নাতি বললো–'নানী, চাক্‌তি কি নিজ থেকে ঘুরতে পারে? তুমি হাত দিয়ে ওটাকে ঘুরাচ্ছ বলেই তো চাক্‌তিটি ঘুরতে পারছে।' নানী এবার নাতির চোখে চোখ রেখে বললো– 'নাতি আমি চাক্‌তিটি ঘুরাচ্ছি বলেই যদি ওটা ঘুরতে পারে নতুবা নয়, তাহলে এই প্রকান্ড পৃথিবীকে তোমার কোন নানা ঘুরাচ্ছে যার কারণে সূর্যের চারদিকে ভোঁ-ভোঁ করে ঘুরতে পারছে? শুধু পৃথিবী কেন মহাশূন্যে অসংখ্য বস্তু নির্দিষ্ট নিয়মে নিজ নিজ পথে সবাই ভাসমান অবস্থায় দৌড়াচ্ছে, কে তাদেরকে ঐ অবস্থায় রেখেছে?' নাতি ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে ভাবলো–সত্যিইতো সেখানেতো আর মানুষের হাত নেই, 'আল্লাহ্' যদি না থাকবেন তাহলে কে মহাশূন্যে ভাসমান অবস্থায় এদের ঘুরাতে থাকবে?

নাতি তার সামান্য জ্ঞান দিয়েই মহাবিশ্বে 'আল্লাহ্‌কে' দেখতে পেলো এবং ডান হাতে মাথা চুল্‌কাতে চুল্‌কাতে নানীকে বললো–'নানী! আমি আল্লাহ্‌কে দেখতে পেয়েছি, আজ থেকে আমিও তোমার সাথে নামাজ নিয়মিতভাবে আদায় করবো।' নানী প্রচন্ড আবেগ নিয়ে নাতিকে জড়িয়ে ধরলো এবং আদর করে নাতির দু'গালে দুটি চুমু খেয়ে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে বললো–'হে প্রভু তুমি কবুল কর।'

বিজ্ঞানীগণ অবশ্য এখনো ওপরে উল্লেখিত বালকটির একধাপ পিছনেই রয়ে গেছেন, তাদের দূর্ভাগ্যই বলতে হবে। নাতির ভূমিকায় বালকটি যুক্তির কাছে মাথা নত করলেও বিজ্ঞানীগণ (যারা এখনও অবিশ্বাসী) কিন্তু জ্ঞানের ধারক হয়েও দ্বিমূখী নীতি-ই অবলম্বন করে চলেছেন। হাজারো অদৃশ্য সৃষ্টবস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে তাদের ওপরই ভিত্তি করে বর্তমান বিজ্ঞানকে সম্মূখপানে ক্রমাগত এগিয়ে নিয়ে গেলেও মহাবিশ্বের সকল বস্তুর একমাত্র স্রষ্টা 'আল্লাহ্'কে অদৃশ্য থেকে কেন দৃশ্যমান হচ্ছেন না সেই অজুহাতে অস্বীকার করেই চলেছেন। অথচ মানব মন্ডলীর জন্য বড় পরীক্ষা স্বরূপ 'আল্লাহ্' নিজে অদৃশ্য থেকে বাকী মহাবিশ্বের সর্বত্র তাঁর বাস্তব উপস্থিতির লক্ষ লক্ষ নিদর্শন (চিহ্ন) ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছেন, গভীর মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করলেই যা দৃষ্টিগোচর হয়।

পানি বহু গড়িয়েছে, এবার আমরা আশা পোষণ করবো–উল্লেখিত বিজ্ঞানীমহল এবং সমাজের মধ্যে বসবাসকারী ঐ জাতীয় চিন্তাধারার সম্মানিত জ্ঞানী বন্ধুরাও অতুলনীয় গুণাবলী সম্পন্ন এক মহান প্রভাব প্রতিপত্তিশালী সত্ত্বার সামনে দ্বি-মুখী নীতিসম্পন্ন হঠ্‌কারিতামূলক আচরণ পরিহার করে নাতির মতই বিনয়ের সাথে নিজ মস্তক অবনত করে দিয়ে ধন্য হবেন ইহ্‌জগতে এবং সফলতা লাভ করবেন পরজগতে। যে পরজগত বর্তমান প্রশংসিত বিজ্ঞান তার উৎকর্ষিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে হাতে-কলমে প্রমাণ সাপেক্ষে নিরেট বাস্তবতার এক উজ্জল সম্ভাবনাময় পরিবেশে এনে দাঁড় করিয়েছে। 'আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে সেই সফলতা লাভের তৌফিক প্রদান করুন।' আমীন।



চিত্রঃ ১৮৫

"বস্তুতঃ চক্ষুতো অন্ধ নয়, অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়।" (২২ ঃ ৪৬)

- কি অদ্ভুদ ও বিচিত্র কর্মকৌশলের সুক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম পরিমিতি ও বৈদ্যুতিক সিগন্যালের মাধ্যমে প্রতিটি মূহুর্তে মানব মস্তিষ্ক সকল প্রকার চিন্তা-ভাবনা, কাজ-কর্ম ও আবিষ্কারসমূহ সম্পন্ন করতে পারলেও মহাবিশ্বের স্রষ্টা সম্পর্কে কিন্তু 'দোদুল্যমান' ভূমিকা পালন করছে, যে কাজটি বিবেকবান সমাজে 'পন্ডিত-মূর্খ্য' হিসেবে বিবেচীত হতে বাধ্য। সমাজের জ্ঞানীদের বিষয়টি ভেবে দেখা জরুরী নয় কি?

"আল্লাহ্‌র কাছে নিকৃষ্টতম জীব তাহারা, যাহারা (বিবেক সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও) জ্ঞান খাটায় না, যাহারা (স্ব-বাক হওয়া সত্ত্বেও) মূক এবং যাহারা (শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও) বধির।" (৮ ঃ ২২)

সবশেষে সম্মানিত পাঠকের জ্ঞানের তরীতে সিরিজের পরবর্তী খন্ডগুলোকেও সংযোজনের নিমিত্তে সংগ্রহের ও অধ্যয়নের আহবান জানিয়ে এখানেই ইতি টানছি।

সত্য-সঠিক জ্ঞান-ই মানবতার কল্যানের জন্য হোক একমাত্র অবলম্বন।

ওয়ামা তৌফিকী ইল্লা বিল্লাহ্।

Glossary – (পরিভাষা সংগ্রহ)

Atom (পরমাণু): বস্তুর উপাদানের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অংশ, যা রাসায়ণিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকে।

Asteroid (গ্রহানু): ছোট পাথুরে বস্তু বা শীলাখন্ড যা সূর্যকে কেন্দ্র করে এর চতুর্দিকে আবর্তন করে থাকে। সৌরজগতের ভিতর মঙ্গল এবং বৃহস্পতিগ্রহের মাঝখানে লক্ষ-লক্ষ শীলাখন্ড দিয়ে বিরাট বেল্ট তৈরী হয়ে আছে। তাছাড়া শনিগ্রহের চতুর্দিকেও অনুরূপ পাথুরে-শীলাখন্ডের বেল্ট বর্তমান আছে।

Astronomy (জ্যোতির্বিজ্ঞান): মহাবিশ্ব এবং এর অভ্যন্তরে যত প্রকার বস্তু বর্তমান আছে, এদের বিজ্ঞানভিত্তিক (Scientific) পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ-ই (Study) হচ্ছে 'এ্যাস্ট্রোনোমি' (জ্যোতির্বিজ্ঞান)।

Atmosphere (বায়ুমন্ডল): মহাকাশে নক্ষত্র, গ্রহ বা উপগ্রহের চতুর্দিকে পরিবেষ্টনকারী গ্যাসীয় স্তরকে Atmosphere (বায়ুমন্ডল) বলা হয়।

Aurora (মেরু জ্যোতি): গ্রহের মেরুদ্বয়ের নিকটবর্তী স্থানে সূর্যের প্রবহমান উত্তপ্ত বায়ু (Solar wind)-র দ্বারা উর্ধ্ব আবহ্মন্ডলে আলোর যে বৈচিত্রময় রংয়ের প্রদর্শনী সৃষ্টি হয়, এটাকেই Aurora বা মেরুজ্যোতি বলা হয়। মেরুজ্যোতি সবসময়ই নয়নাভিরাম দৃশ্যের অবতারণা করে থাকে।

Big Bang (সৃষ্টিতত্ত্ব): যে মতবাদ কল্পনাতীত এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কীয় ধারাবাহিক বর্ণনা পেশ করে, এটাই 'Big Bang' নামে পরিচিত।

Binary Star (যুগ্ম নক্ষত্র): খুবই পাশাপাশি অবস্থানরত দুটি নক্ষত্রের একটি অপরটিকে ঘিরে যদি আবর্তন করে এবং পরস্পর পরস্পরের অভিকর্ষ (Gravitation) বল দ্বারা আবদ্ধ থাকে তাহলে ঐ নক্ষত্রদ্বয়কে Binary star বলা হয়। অধিকাংশ নক্ষত্রই Binary পদ্ধতিতে মহাকাশে আবর্তিত হচ্ছে।

Black hole (নক্ষত্র ধ্বংস-স্থান)ঃ মহাকাশে বৃহৎ নক্ষত্রের ধ্বংসাবশেষ-এর মধ্যে সৃষ্টি হওয়া বাস্তব অথচ অদৃশ্য এমন স্থান যেখানে অভিকর্ষ বল (Gravitation) অকল্পনীয় টানে (Enormous pull) সকল কিছুকে কেন্দ্রের দিকে টানতে থাকে। এই টান থেকে সবচেয়ে দ্রুততম 'আলোকরশ্মি' ও আত্মরক্ষা করতে পারে না, ব্ল্যাক হোলের মুখে পড়ে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়। Black hole মহাকাশে 'মৃত্যুকুপ-র' ভূমিকায় রত।

Cluster (গুচ্ছ)ঃ বহু সংখ্যক নক্ষত্র কিংবা গ্যালাক্সীর কাছাকাছি-নিকটে 'গ্রুপ' হয়ে অবস্থান করাকে ক্লাস্টার বলা হয়।

Comet (ধুমকেতু)ঃ ধূলা-বালি, শিলাখন্ড ও পাথর কুঁচি এবং বরফের সমন্বয়ে গঠিত বস্তু খন্ডকে 'ধূমকেতু' বলে। ধূমকেতু উপবৃত্তাকারে (oval orbit) সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে থাকে।

Coma (কোমা)ঃ ধূমকেতুর বরফাচ্ছাদিত কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে সূর্যের কিরণে সৃষ্ট ব্যাপক গ্যাসীয় মেঘপুঞ্জকে 'Coma' বলে।

Constellation (নক্ষত্র পুঞ্জ)ঃ খুবই নিকটবর্তী হয়ে অবস্থানগ্রহণকারী একগুচ্ছ তারকা, যা পৃথিবীপৃষ্ঠ হতে দেখতে কোন জিনিসের একটা আকৃতির মত দেখায়, এটাই নক্ষত্র পুঞ্জ (Constellation) নামে পরিচিত। পৃথিবীর চতুর্দিকে মহাশূন্য জুড়ে সর্বমোট ৮৮টি Constellation নির্দিষ্ট আছে।

Core (মধ্যবর্তী স্থান)ঃ নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ কিংবা Asteroid বা Comet-এর কেন্দ্রীয় অংশকে বলা হয়, যা এর চতুর্দিকের একাধিক স্তরের বিভিন্ন পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত।

Corona (কোরোনা)ঃ সূর্যের আবহমন্ডলের বাইরের দিকে সবচেয়ে দূরের (Outermost part) অংশকে 'Corona' বলা হয়।

Cosmic ray (মহাজাগতিক রশ্মি)ঃ খুবই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অতিক্ষুদ্র বস্তুকণা (Highly energetic particles) যা মহাশূন্যে প্রায় আলোর গতিতে ভ্রমণ করে থাকে। Gamma-ray, X-ray, Ultra violet ray সবই Cosmic ray-র অন্তর্ভুক্ত।

Cosmology (সৃষ্টিতত্ত্ব): মহাবিশ্বের সকল প্রকার মহাজাগতিক বস্তুসম্পর্কে 'গবেষণাই' হচ্ছে 'Cosmology।

Day (দিন): কোন গ্রহ তার অক্ষের উপর একবার পূর্ণ ঘুর্ণনে (Spin around once) যে সময়ের প্রয়োজন হয়, এর সমষ্টিকে দিন (Day) বলা হয়।

Dwarf Star: আমাদের সূর্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট সূর্যকে Dwarf star বলা হয়।

Eclipse (গ্রহণ): মহাশূন্যে ভাসমান অবস্থায় আবর্তন করতে গিয়ে কখনও একটি বস্তুকর্তৃক অপর কোন বস্তু পূর্ণ বা আংশিক ঢেকে যায়, এটাই 'Eclipse'। যেমন চন্দ্র যখন সূর্যের সম্মুখ দিয়ে গমন করে, তখন পৃথিবী থেকে সূর্যকে পরিপূর্ণরূপে দেখা যায় না, ঐ অবস্থাকেই তখন সূর্য গ্রহণ (Eclipse) বলে।

Electron (ইলেকট্রন): সকল পরমাণুর ভিতর নেগেটিভ চার্জযুক্ত বস্তুকণিকা যা নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে অনবরত পরিভ্রমণ করতে থাকে। সংখ্যায় এরা সবসময় নিউক্লিয়াসের উপাদান প্রোটন কণিকার সমানসংখ্যক হয়ে থাকে। এদের ওজন প্রায় 9.1×10^{-31}kg.

Element (উপাদান): একই রকম পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত পদার্থ। যেমন অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ।

Escape Velocity (মুক্তি গতি): কোন বস্তুর পৃষ্ঠদেশের আওতাভুক্ত এলাকা থেকে সম্পূর্ণরূপে পালিয়ে যেতে সর্বনিম্ন যে গতির প্রয়োজন হয়, তাই Escape velocity। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে মহাশূন্যে পূর্ণরূপে পালিয়ে যাওয়ার সর্বনিম্ন 'মুক্তিগতি' হচ্ছে ১১.২ কিঃমিটার/সেকেন্ড।

Event horizon: ব্ল্যাক হোলের চতুর্দিকে সৃষ্ট 'বাউন্ডারী' (Boundary) যেখানে 'মুক্তি গতি' (Escape velocity) আলোর গতির সমান প্রায়। এই স্থানে কোন বস্তু আসার পর আর তার রক্ষা নেই, বস্তুটি মুহূর্তের মধ্যেই ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে 'ব্ল্যাক হোলে' চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়।

Gas Giant: তুলনামূলকভাবে ছোট কোর (Core) বিশিষ্ট এবং ঐ কোরকে ভিত্তি করে চতুর্দিকে গ্যাস ও তরল পদার্থ দিয়ে সৃষ্ট গ্রহকে 'গ্যাস জায়ান্ট' বলা হয়।

Light Second (আলোক

Galaxy (নক্ষত্র শহর): নক্ষত্রসমূহ, ধূলা-বালি ও গলিত পদার্থের মেঘপুঞ্জ (নেবুলা), স্টার ক্লাস্‌টার, গ্লোবুলার ক্লাস্‌টার ইত্যাদির একত্রে মিলিত এক বিরাট দল বা গ্রুপকেই বলা হয় গ্যালাক্সী। বিজ্ঞানীগণ এ পর্যন্ত প্রায় ১০০ কোটি গ্যালাক্সীর সন্ধান লাভ করেছেন।

Giant Star: আমাদের সূর্যের চাইতে অপেক্ষাকৃত বড় সূর্য হচ্ছে 'Giant Star'.

Gravitation (অভিকর্ষ): যে শক্তি (The force of attraction) বস্তুসমূহকে পরস্পরের দিকে টানে, তাই অভিকর্ষ বল বা Gravitation, উদাহরণ স্বরূপ পৃথিবী ও চাঁদ উভয়ই সবসময় অভিকর্ষ (Gravitation)বলের টানে আবদ্ধ হয়ে আছে।

Gamma-ray (গামা-রে): সবচেয়ে ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (Wave length) বিশিষ্ট হাই এনার্জি রেডিয়েশান (High energy radiation), যা জীব এবং প্রাণীর দেহকোষের সংস্পর্শে আসামাত্র কোষগুলিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে ধ্বংসসাধন করে থাকে। সকল প্রকার আলোকরশ্মির মধ্যে Gamma-ray সবচেয়ে বেশি ভয়ংকর ও বিপদজনক।

সেকেন্ড): এক সেকেন্ড সময়ে আলোকরশ্মি যতটুকু পথ অতিক্রম করতে পারে, ঐ দূরত্বকে এক লাইট সেকেন্ড বলা হয়। এক সেকেন্ডে আলোকরশ্মি প্রায় ১৮৬,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করতে পারে।

Light Minute (আলোক মিনিট): পূর্ণ এক মিনিটে আলোকরশ্মি যে দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে, ঐ দূরত্বকে এক লাইট মিনিট বলে।

Light Year (আলোকবর্ষ): আলোক রশ্মি (Ray of light) এক বৎসর সময়ে যতটুকু পথ যেতে পারে, ঐ দূরত্বকে 'এক আলোকবর্ষ' (One light year) বলা হয়। প্রমাণিত হয়েছে এক আলোকবর্ষ সমান দূরত্ব হচ্ছে ১০ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার (৬ ট্রিলিয়ন মাইল)।

Magnitude: মহাশূন্যে নক্ষত্রসমূহের 'উজ্জলতা'কে বলা হয়।

Moon (চাঁদ): ধূলা-বালি, শিলাপ্রস্তর দিয়ে তৈরী প্রায় দুই হাজার মাইল ব্যাস সম্পন্ন বিরাট বল, যা নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে থাকে।

Meteor (উল্কা)ঃ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পাথরকণা বা কুচি যা পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করামাত্র বাতাসের সাথে ঘর্ষণে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায় এবং আলোর ফুল্কি সৃষ্টি করে, যা Shooting Star হিসাবেও পরিচিত।

Meteorite (ভূপতিত উল্কা)ঃ যে সকল উল্কা বায়ুমন্ডলে পুড়ে-পুড়ে পুরোপুরি ধ্বংস না হয়ে পৃথিবীপৃষ্ঠ পর্যন্ত সে আঘাত করে। এদেরকে Meteorite বলা হয়।

Meteoroid ঃ

যে সমস্ত উল্কা আকারে একটু বড় এবং সূর্যকে কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে. এদেরকেই বলা হয় Meteoroid।

Meteor shower ঃ

পৃথিবী যখন কোন ধূমকেতুর কক্ষপথ ছেদ করে পরিভ্রমণ করে তখন ঐ ধূমকেতু থেকে নির্গত ব্যাপক Meteor (উল্কা) পৃথিবীর আবহমন্ডলে প্রবেশ করে (স্বল্প সময়ের জন্য) বাতাসের সাথে ঘর্ষণে পুড়ে পুড়ে বিরাট এলাকা নিয়ে একই সাথে যে ব্যাপক আলোর ফুলঝুরি প্রদর্শনীর সৃষ্টি করে ওটাই Meteor shower।

Matter: বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ, যা দিয়ে মহাবিশ্বের সকল বস্তু অস্তিত্ব ধারণ করেছে।

Molecule (অনু)ঃ রাসায়ণিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে একাধিক পরমাণু মিলিত হয়ে 'অণু' গঠিত হয়। অনুকেই সাধারণত পদার্থের মৌলিক এক হিসেবে ধরা হয়।

Milky Way Galaxy: আমাদের এই সৌরজগত যে গ্যালাক্সীর অন্তর্গত, তাকেই Milky way galaxy বলা হয়। গ্যালাক্সীটির মাঝখানে অত্যাধিক বিকিরনের কারণে দুধের মত সাদা ধবধবে পথের ন্যায় চিহ্ন থাকায় ঐ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

NASA (নাসা)ঃ The National Aeronautics and Space Administration যা আমেরিকান সরকারের নির্দেশে মহাকাশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান এবং আবিষ্কারের পিছনে সর্বাত্মকভাবে প্রচেষ্টায় নিয়োজিত।

Nebula (নেবুলা)ঃ ধূলা-বালি এবং গ্যাসের সমন্বয়ে বিশাল মেঘপুঞ্জ, যে মেঘপুঞ্জ থেকে বৃষ্টি নামে না, কিন্তু জন্ম নেয় শত-সহস্র নক্ষত্র। অর্থাৎ, নক্ষত্র সৃষ্টির কাঁচামাল হচ্ছে নেবুলা।

Neutron (নিউট্রন): বস্তুর ক্ষুদ্রতম Unit– 'এ্যাট্‌মিক নিউক্লি'-র ভিতর এক প্রকার ক্ষুদ্র কণিকা (Sub atomic particle) যা নিরপেক্ষ, চার্জবিহীন (Zero electric charge) এবং এদের ওজন হচ্ছে প্রায় 1.67×10^{-27}kg। পরমাণুর ভিতর প্রোটনের সাথে মিলিত হয়ে 'এ্যাটমিক নিউক্লি' তৈরী করে।

Neutron Star (নিউট্রন ষ্টার): বৃহৎ বৃহৎ নক্ষত্র (Supergiant Star) ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তাদের ধ্বংসাবশেষে ছোট আকারের যে প্রচন্ডগতিতে আবর্তনশীল অংশটি (Small spinning part) থেকে যায়, তাকেই 'নিউট্রন স্টার' বলা হয়। এটা 'নিউট্রন' নামক ক্ষুদ্র কণিকাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত।

Nova (নোভা): যে সকল নক্ষত্র হঠাৎ করে ব্যাপক থেকে ব্যাপকহারে উজ্জ্বলতা প্রদর্শন করে পরবর্তীতে বিস্ফোরণের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে গিয়ে চিরতরে ম্লান হয়ে যায়, ঐ নক্ষত্রগুলোকে নোভা বলা হয়।

Nucleus: জ্যোতিশাস্ত্রে গ্যালাক্সীর মধ্যস্থানে ঘনসন্নিবিষ্ট অংশকে 'nucleus' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ধূমকেতুর সম্মূখে ঘন সন্নিবিষ্ট অংশকেও Nucleus হিসেবে ধরা হয়ে থাকে।

Nuclear Fusion: যে পদ্ধতিতে নক্ষত্রের ভিতর ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গ্যাসীয় কণা (Atoms) পরস্পর মিলিত হয়ে বড় বড় ভারী বস্তুকণা সৃষ্টি করে, ঐ পদ্ধতিকেই 'Nuclear fusion' বলা হয়। উক্ত পদ্ধতি সংঘটিত হওয়ার সময় ব্যাপক-বিশাল পরিমাণে তেজস্ক্রীয়তা (Radiation) উৎপন্ন হয়ে থাকে।

Orbit (কক্ষপথ): মহাশূন্যের মাঝে কোন একটি বস্তু যে কাল্পনিক পথের উপর দিয়ে পরিভ্রমণরত অবস্থায় আরেকটি বস্তুর চারদিকে আবর্তন করে ঐ পথটিকেই 'Orbit' বা কক্ষপথ বলে। যেমন পৃথিবী তার কক্ষপথের উপর দিয়ে সূর্যের চারদিকে আবর্তন করে থাকে।

Planet (গ্রহ): নক্ষত্রের চতুর্দিকে পরিভ্রমণরত অপেক্ষাকৃতভাবে বড় বস্তুকে গ্রহ বলা হয়। নক্ষত্রের মত এদের ভিতরে তাপ এবং আলো সৃষ্টি হয় না। আমাদের সৌরপরিবারে এ পর্যন্ত ৯টি গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে।

Pulsar (পালছার): নিউট্রন স্টার থেকে নির্গত আলোকরশ্মি (Radiation), যা নক্ষত্রের অক্ষের চতুর্দিকে প্রচন্ড গতিতে আবর্তিত হয়ে থাকে।

Planetary nebulae: ধ্বংসপ্রাপ্ত নক্ষত্রের বাইরের দিকের স্তরের নিক্ষিপ্ত উত্তপ্ত গ্যাসপুঞ্জ যা মহাশূন্যে মেঘের ন্যায় ছড়িয়ে থাকে বিরাট এলাকা জুড়ে।

Prominence: সূর্যের পৃষ্ঠদেশ থেকে বাইরের দিকে উৎক্ষিপ্ত উত্তপ্ত অগ্নিশিখা, যা কখনও লম্বায় প্রায় চার লক্ষ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় আঠ হাজার মাইল পর্যন্ত হয়ে থাকে।

Protostar: একটি পূর্ণ নক্ষত্র সৃষ্টি হওয়ার পথে 'প্রাথমিক একটা পর্যায়', যে পর্যায়ে তখনও ঐ নক্ষত্রের কেন্দ্রে 'নিউক্লিয়ার ফিউশান' শুরু হয়ে পারমাণবিক চুল্লী চালু হয়নি।

Proton (প্রোটন): পরমাণুর অভ্যন্তরে পজেটিভ চার্জযুক্ত ক্ষুদ্র কণিকা, যা নিউক্লিয়াসে নিউট্রনের সাথে মিলিত হয়ে অবস্থান করে। এর ওজন হচ্ছে 1.67×10^{-27}kg।

Photon (ফোটন): আলোর ক্ষুদ্রতম কণিকাই হচ্ছে 'ফোটন'। মহাশূন্যে এর চলার গতি হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১৮৬,০০০ মাইল।

Parsec (পারসেক): ৩.২৬ আলোকবর্ষ সমান এক 'Parsec'। মহাশূন্যে ব্যাপক-বিশাল দূরত্বের হিসাবকে সংক্ষিপ্ত করে সহজ করার নিমিত্তে 'পারসেক' হিসাবের অবতারণা করা হয়েছে।

Quasar (কোয়াসার): টেলিস্কোপ দিয়ে পর্যবেক্ষণকৃত সীমানার প্রায় প্রান্তে আবিষ্কৃত খুবই উজ্জ্বল মহাজাগতিক জ্যোতিষ্ক, যা দেখতে একটি নক্ষত্রের মত কিন্তু এটা উজ্জ্বলতা ছড়ায় ১০,০০০ মিলিয়ন গড় গ্যালাক্সীর তেজস্ক্রিয়তার সমান এবং আলো ছড়ায় প্রায় ১০০টি গড় গ্যালাক্সীর আলোর সমান।

Radiation (তেজস্ক্রিয়তা): কোন বস্তু থেকে নির্গত তাপ যা শক্তি হিসেবে ঢেউয়ের (Wave) মত চলার পথে অগ্রসর হয়ে থাকে।

Red giant (লাল বামন): আমাদের সূর্যের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বড় নক্ষত্রের ধ্বংস হওয়ার পূর্বমুহূর্ত, যখন তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত কমে গিয়ে আয়তনে বহুগুণে বেড়ে যায়।

Satellite (উপগ্রহ) : মহাশূন্যে কোনো গ্রহকে অপর কোনো বস্তু কক্ষপথে আবর্তন করতে থাকলে ঐ আবর্তনকারী বস্তুটিকে উপগ্রহ বলা হয়। যেমন চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ। মানুষের তৈরী উপগ্রহ (Satellite) পৃথিবীকে, চাঁদকে আবর্তন করছে, তবে শর্ত হচ্ছে উপগ্রহের আবর্তনগতি আবর্তনকৃত বস্তুর কমপক্ষে 'মুক্তিগতির' সমান হতে হবে।

Solar System (সৌরজগৎ) : একটি নক্ষত্রকে ঘিরে যে কয়টি গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু ও গ্রহাণু চতুর্দিকে আবর্তন করে এবং নক্ষত্রের বলের আকর্ষণে আবদ্ধ থাকে, নক্ষত্রসহ ঐ সকল গ্রহ ও উপগ্রহ, ধূমকেতু ও গ্রহাণুগুলোকে একত্রে সৌরজগৎ বলা হয়ে থাকে। এক কথায় নক্ষত্রের চারদিকে কক্ষপথে আবর্তনশীল সকল বস্তুকে একত্রে সৌরজগৎ নামে অভিহিত করা হয়।

Solar woind : সূর্যের পৃষ্ঠদেশ (Surface) থেকে মহাশূন্যে অদৃশ্য ক্ষুদ্র বস্তুকণার (Invisible particles) অনবরত যে আলোক ধারা (Stream) প্রবাহিত হতে থাকে, এটাই Solar wind।

Space Craft : মহাশূন্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধান কার্যে পরিভ্রমণ করার জন্য যা আকাশযানরূপে তৈরী করা হয়। তাকেই Space Craft বলে।

Space probe : মনুষ্যবিহীন আকাশযান, এর কাজ হচ্ছে মহাশূন্যে মহাজাগতিক জ্যোতিষ্ক সমূহের বিভিন্ন প্রকার তথ্য সংগ্রহ করা এবং পরক্ষণে তা পৃথিবীতে বিজ্ঞানীদের নিকট প্রেরণ করা।

Space Shuttle : যে আকাশ যানের (Space craft) মাধ্যমে নভোচারী এবং প্রয়োজনীয় মালামাল মহাশূন্যে প্রেরণ করা হয়, তাকে Space shuttle বলে। একে রকেটের সাহায্যে মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ করা হয় কিন্তু অবতরণ করে বিমানের মত। Space shuttle বার বার ব্যবহার করা যায়।

Space Station : এটা মহাশূন্যের মধ্যে বড় ধরনের মনুষ্যবাহী উপগ্রহ বা Satellite, মহাশূন্যে দীর্ঘ সময় ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান কার্য চালাবার জন্য একে ভাসমান ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

Sun (সূর্য) : একটি মাঝারি ধরনের

নক্ষত্র, যা আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থান করছে এবং এর অভ্যন্তরে 'ফিউশান' পদ্ধতিতে প্রতিনিয়ত উৎপন্ন তাপ ও আলো চারদিকে ছড়িয়ে গোটা সৌরজগতকে ভাসিয়ে রাখছে।

Supergiant star : খুবই উজ্জ্বলতা সম্পন্ন বৃহৎ নক্ষত্র। এদের আয়ুষ্কাল মাত্র কয়েক মিলিয়ন বছর। নক্ষত্র যতো বড় হবে তার আয়ুষ্কাল তত কম হবে।

Supernova (সুপারনোভা) : বৃহৎ বৃহৎ নক্ষত্রের (Supergiant star) ধ্বংসজনক মহাবিস্ফোরণই হচ্ছে 'সুপারনোভা', যা কল্পনাতীত আলো এবং উত্তাপ সৃষ্টি করে থাকে। এই সুপারনোভার ধ্বংসাবশেষ থেকে জন্ম নেয় 'নিউট্রন স্টার' কিংবা 'ব্ল্যাক হোল'।

Star (নক্ষত্র) : অবিরত বিস্ফোরণশীল গ্যাসীয় বল, যার ভিতর থেকে উৎপন্ন হয় আলো এবং তাপ (Light and heat)। আমাদের সূর্য অনুরূপ একটি নক্ষত্র।

Universe (মহাবিশ্ব) : মহাশূন্যে বিরাজমান সকল প্রকার মহাজাগতিক বস্তুসমূহ যে আয়তনের জায়গায় বিস্তৃত হয়ে আছে, ঐ স্থান এবং বস্তুসমূহসহ পুরোটাকেই মহাবিশ্ব বলা হয়।

X-ray (এক্স-রে) : খুবই সংক্ষিপ্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (Short Wave length) বিশিষ্ট 'ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক রেডিয়েশান', যা জীব এবং প্রাণীদেহের জন্য খুবই বিপদজনক আলোকরশ্মি।

Year (বৎসর) : একটি গ্রহ সূর্যের চারিদিকে কক্ষপথে একবার আবর্তন করে আসতে যে সময় প্রয়োজন হয়, ঐ সময়ের দৈর্ঘ্যকেই 'বছর' বলা হয়। পৃথিবী ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেণ্ডে সূর্যের চারদিকে কক্ষপথে একবার ঘুরে আসে, যা গণনায় এক বছর ধরা হয়।

Zone of avoidance : আমাদের গ্যালাক্সি কর্তৃক চারপাশ থেকে Interstaller gas এবং dust শোষণ করে নেয়ায় এর একই Plane-এ আকাশের যে এলাকা গ্যালাক্সি সৃষ্টি হতে না পেরে শূন্যস্থানে পরিণত হয়েছে ঐ শূন্য এলাকাকে Zone of avoidance বলা হয়।

গ্রন্থপঞ্জি

1. আল-কুরআনুল কারীম- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৪ইং।
2. The Holy Quran- Darussalam Publishers & Distributors, Riyadh, Saudi Arabia.
3. The Translation of The Holy Qur'an in Simple English- SMH, QADRI.
4. তাফহীমুল কুরআন- সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)।
5. Guide to Space-Peter Bond-1999.
6. Night Sky-Discovery Channel-1999.
7. A Photographic Tour of the Universe-Gabriele Vanin- 1996.
8. The Search for Infinity-Gordon Farser, Egil Lillestor & Inge selle-vag- 1999.
9. The Universe Revealed-Pam Spence- 1996.
10. Astronomy From the Earth to the Universe-Pasa Choff-1995.
11. Stars & Planets-Ian Ridpath-1997.
12. Astronomy & Space-Lisa Miles and Alastair Smith- 1999.
13. Astronomy Dictionary-Philip's – 1999.
14. Inventions-G.I.Brown – 1996.
15. Man in Space – Eugene A. Cernan – 1999.
16. The Changing Universe, Big Bang and After-Trinh Xuan Thuan – 1993.
17. Astronomy & Astrophysics – Zeilik, Gregory – 1998.
18. Space Atlas – Robin Kerrod – 1996.
19. Embracing Earth – Payson R. Stevens and Kevin W. Kelley – 1992.
20. The Universe Explained – Colin Ronan – 1994.
21. The Visual Dictionary of the Universe – Eywitness Visual Dictionaries - 1994.

22. How the Universe Works-Eyewitness Science Guides-1994.
23. Inventors and Discoveres-Changing Our World-1988.
24. LIFE-Eyewitness Science-1996.
25. ECOLOGY-Eyewitness Science-1995.
26. Guinness Book of Knowledge-1997.
27. Force & Motion- The Science Museum, London-1993.
28. MATTER-The Science Museum-1992.
29. Time & Space-Eyewitness Science-1994.
30. Astronomy- Eyewitness Science – 1995.
31. Atlas of the Universe – Patrick Moore – 1999.
32. Qur`an for Astronomy and Earth Exploration from Space- S. Waqar Ahmed Husaini-1996.
33. আল-কুরআন দ্যা চ্যালেঞ্জ মহাকাশ পর্ব-১ কাজী জাহান মিয়া
34. আল-কুরআন দ্যা চ্যালেঞ্জ মহাকাশ পর্ব-২ কাজী জাহান মিয়া
35. বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান- ড. মরিস বুকাইলি-১৯৮৬
36. মহাকাশের হাজারো জিজ্ঞাসা – সুধাংশু পাত্র-১৯৮৫
37. চল্লিশ জন সেরা বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আল্লাহর অস্তিত্ব–অনুবাদক ঃ সৈয়দ রেদওয়ানুর রহমান–১৯৯৫
38. The Universe Seen Through The Quran – Mir Anees-ud-din-1999.
39. Great Scientific Discoveries – Chambers Compat Reference- Gerald Messadie – 1992
40. Astronomy Magazine (U.S.A), from July – 1998 to June 2000.
41. Astronomy Magazine (England), from July 1998 to June 2000

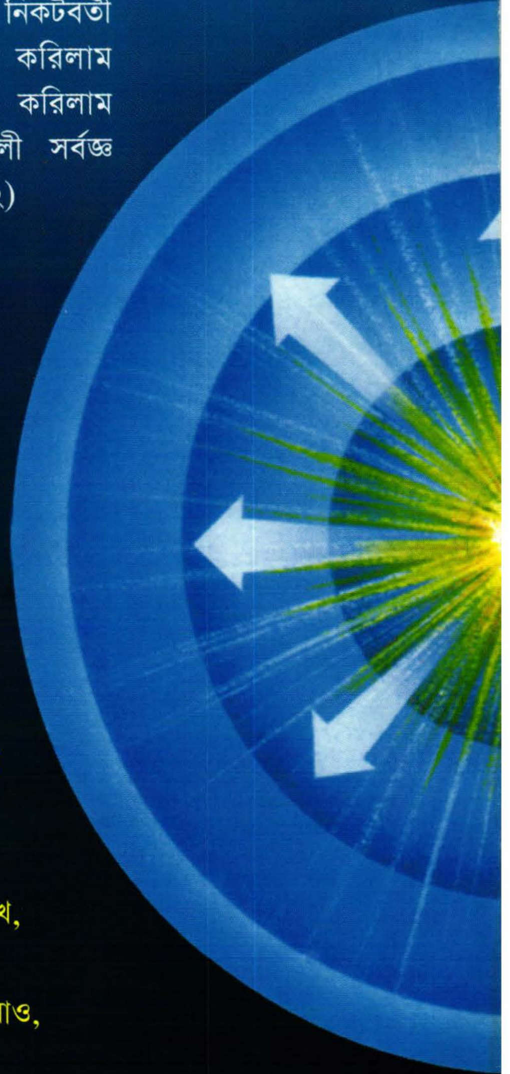
"সেইদিন আকাশমণ্ডলীকে গুটাইয়া ফেলিব, যেইভাবে গুটানো হয় লিখিত দফতর। যেইভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করিয়াছিলাম, সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করিব। প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি ইহা পালন করিবই।"

(২১:১০৪)

"তিনি আকাশমণ্ডলী নির্মাণ করিয়াছেন স্তম্ভ ব্যতীত- তোমরা ইহা দেখিতেছ।"

(৩১:১০)

"অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলকে দুই সময়কালে সপ্তাকাশে পরিনত করিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে উহার বিধান ব্যক্ত করিলেন; এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করিলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করিলাম সুরক্ষিত। ইহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা। (৪১ঃ১২)



"যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ, দয়াময়ের (আল্লাহর) সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখিতে পাইবে না; আবার তাকাইয়া দেখ, কোন ত্রুটি দেখিতে পাও কি? অতঃপর তুমি বার বার সৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হইয়া তোমার দিকে ফিরিয়া আসিবে।"

(৬৭:৩-৪)

বর্তমান উৎকর্ষিত বিজ্ঞানের হীরণময় কিরণে উদ্ভাসিত এই বিশ্বে পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে 'দি রিসার্চ ফাউন্ডেশন ফর কুরআন এন্ড সাইন্স' তার যাত্রা শুরু করেছে। আর সে লক্ষ্যে ইতিমধ্যে 'দি রিসার্চ ফাউন্ডেশন ফর কুরআন এন্ড সাইন্স' একযোগে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে– 'আল কুরআন দ্যা ট্রু সাইন্স' সিরিজ-১ থেকে সিরিজ-৫ পর্যন্ত মোট ৫টি খণ্ড, আল্‌হামদুলিল্লাহ।

- সিরিজ-১ ঃ কুরআন, সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিগ-ব্যাংগ।
- সিরিজ-২ ঃ কুরআন, কিয়ামাত ও পরকাল।
- সিরিজ-৩ ঃ কুরআন, মহাবিশ্ব ও মূলতত্ত্ব।
- সিরিজ-৪ ঃ কুরআন, মহাবিশ্ব ও মহাধ্বংস।
- সিরিজ-৫ ঃ কুরআন, কোয়াসার ও শিঙ্গায় ফুৎকার।

ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তী আরো ৫টি খণ্ড (সিরিজ-৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০) দ্রুত প্রকাশের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। গ্রন্থগুলোর প্রকাশনা ও বাজারজাত করার জন্য র‍্যাক্স পাবলিকেশন্সকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। উক্ত সিরিজের খণ্ডগুলো আপনার সমগ্র জীবনে জ্ঞানের সর্বোচ্চ পর্যায়ে একটি উত্তম সংগ্রহ হিসেবে অবদান রাখতে পারে। তাই পরবর্তী সিরিজের খণ্ডগুলো সংগ্রহ করার চেষ্টা করুন। নিজে বইগুলো পড়ুন এবং অপরকেও পড়তে উৎসাহিত করুন।





RAQS
Publications